মালঞ্চ
বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

মালঞ্চ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যম্ ❑ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৮৬
পুনর্মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪০০

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা
লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স্
১৫৭বি, মসজিদবাড়ি স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মুদ্রাকর
লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪বি, কলেজ রো
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

দাম কুড়ি টাকা

অপরাজেয় কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কয়েকটি ছোটগল্প নিয়ে এই 'মালঞ্চ' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হ'লো। ইতিপূর্বে 'সাহিত্যম্' প্রকাশিত তাঁর 'দরবারী' গল্পগ্রন্থটির মতোই যে এটি সমাদৃত হবে সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

—প্রকাশক

গল্পক্রম

অসাধারণ ৫
নদীর ধারের বাড়ি ১৩
বিপদ ২৩
জন্মদিন ৩১
দ্রবময়ীর কাশীবাস ৩৯
ক্যান্‌ভাসার কৃষ্ণলাল ৫৯
পারমিট ৭১
মুক্তি ৮১
গায়ে হলুদ ৯৫
ঠাকুরদার গল্প ১০৩
ভিড় ১১১
আরক ১১৮
থিয়েটারের টিকিট ১২৪
পার্থক্য ১২৮
ননীবালা ১৩১
বিরজা হোম ও তার বাধা ১৩৯
রূপো-বাঙাল ১৪৬
তেঁতুলতলার ঘাট ১৫২

অসাধারণ

সীতানাথ ডাক্তারের দোকানে বসিয়াছিলাম। সকাল বেলা। খবরের কাগজ এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই—কারণ মফঃস্বল জায়গা। খবরের কাগজ না পৌঁছিলে যুদ্ধের আলোচনা ঠিক জমে না। অদূরবর্তী বাজারে প্রাভাতিক সওদা সারিয়া নবীন মুখুয্যে, শশধর মুহুরী, কেনারাম মুখুয্যে, মন্মথ মুখুয্যে, বলাই দাঁ প্রভৃতি ভদ্রলোক সীতানাথের ডাক্তারখানায় স্নানাহারের সময় পর্যন্ত রাজনীতি আলোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা কোনো চাকুরি করেন না। দু-একজন পেনসনপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, এক-আধজনের বাপের পয়সা প্রচুর। ইঁহারা জার্মানী ও জাপানের সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে এমন কথাবার্তা বলেন, যাহা স্বয়ং হিটলার, চার্চিল বা তোজোরও অজ্ঞাত। হিটলার কি ভুল করেন, চার্চিলের কি করা উচিত ছিল, জাপান এমনটি না করিয়া যদি এমনটি করিত তাহা হইলে কি ঘটিত—এ সকল মূল্যবান উপদেশ সর্বদাই সেখানে উচ্চারিত হইতেছে।

বর্তমানে কেনারাম মুখুয্যে বলিতেছিলেন—আরে, এই তোমাকে বলি শোনো ভায়া। ভুলটা হিটলারের হল কোথায় শোনো। ডানকার্কের যুদ্ধের পরেই—

শশধর মুহুরী বলিয়া উঠিলেন—আঃ, আপনি ঐ এক শিখে রেখেচেন ডানকার্ক আর ডানকার্ক। আসল ভুল সেখানে নয়, আসল ভুল হল—

এমন সময় একটি পুরুষের হাত ধরিয়া একজন স্ত্রীলোক ডাক্তারখানার বারান্দাতে উঠিয়া আসিল সম্মুখের রাস্তা হইতে। পুরুষটির বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মধ্যে যে-কোনো বয়েস হইতে পারে, রোগা, পরনে খাটো ময়লা ধুতি ; মেয়েটির বয়েসও নিতান্ত কম নয়, তবে পুরুষটির অপেক্ষা অনেক কম, ত্রিশ-বত্রিশের বেশি হইবে না। মেয়েটির পরনে তালিলাগানো শাড়ি, কিন্তু ময়লা নয়—মুখশ্রী একসময় বেশ ভালোই ছিল বোঝা যায়, দেহ খুব সম্ভবতঃ অনাহারে ও ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ।

মেয়েটি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিল—ও ডাক্তারবাবু—

সীতানাথ ডাক্তার উহাদের দিকে একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চাহিয়া বলিলেন—কি চাও ?

—বাবু, এঁকে একটুখানি দেখতি হবে।

সীতানাথ ডাক্তার বুঝিয়াছিলেন ইহাদের দ্বারা বিশেষ কোনো অর্থাগমের আশা

নাই—যত বড় কঠিন অসুখই হউক না কেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত চেহারা। পরনে তো ওই কাপড়। মাথা তৈলাভাবে রুক্ষ। রোগীর মধ্যে গণ্য করিয়া উৎফুল্ল হইবার কোনো কারণ নাই।

তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—হয়েচে কি?

মেয়েটি বলিল—হবে আর কি। ওঁর জ্বর ছাড়ে না আজ দু-মাস। তার ওপর মেহ। শরীর একেবারে ভেঙে দিয়েচে। আমার উনি ছাড়া আর কেউ নেই। আপনি দয়া করে দেখুন। বলিয়া মেয়েটি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—সরে এসো এদিকে—

পরে রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—হুঁ, দেখবো কি, এর মধ্যে অনেক রোগ। কদ্দিন এমন হয়েচে?

পুরুষটি এবার ক্ষীণসুরে বলিল—তা বাবু, অনেক দিন। আমি আজ তিন-চার মাস ভুগচি। আর এই কাশি, এ কিছুতি যাচ্ছে না—

মেয়েটি হাত তুলিয়া অধৈর্যের সুরে বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি! খুব খ্যামোতা তোমার! আমার হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে তুমি—তিন মাস ওঁর অসুখ—

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—ওঁর কথা শোনবেন না। ওঁর কি কিছু ঠিক থাকে? নিজের দিকে ওঁর কোনো খেয়াল নেই—এই শুনুন তবে আমার কাছে—

কথাটা শোনাইল এভাবের যেন লোকটি দার্শনিক কিংবা কবি, অথবা ব্রহ্মদর্শী—সাংসারিক তুচ্ছ বিষয়ে স্বভাবতই ইনি অনাসক্ত। বোধ হয় ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়াই সীতানাথ ডাক্তার পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—তোমার গনোরিয়া হয়েচে কতদিন?

—তা বাবু, চার-পাঁচ মাস হবে। সে-বার যখন

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি তো সব জানো কিনা! চুপ করো! না বাবু, দু-বছর হয়ে গেল। আমার হাড় মাস ভাজা করে খেলে ওই মিন্‌সে। কী জ্বালায় যে পড়েচি আমি, মরণ হয় তো হাড় জুড়িয়ে যায় আমার!

কাহার মরণ হইলে তাহার হাড় জুড়ায়, কথার ভাবে ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—বাড়ি কোথায়?

মেয়েটি বলিল—বাড়ি এই ঝিটকিপোতায়। আমরা হাড়ি।

—ও! ঝিটকিপোতায় হাড়ির বাস আছে নাকি?

—না বাবু, দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্ছি এই ওনারে নিয়ে। বিয়েকরা সোয়ামী, ফেলতে তো পারিনে। আজ দুটি বছর উনি বিছেনেয় পড়ে। উঠতি হাঁটতি পারেন

না। কত অসুদ-বিষুদ করলাম আমাদের দেশে-ঘরে, যে যা বলে তাই করি, কিন্তু কিছুতেই সারাতি পারলাম না, দিন দিন যেন মানুষ উঠতি পারে না, খেতি পারে না। তাই আজ বলি ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাই—একটু দেখুন আপনি ভাল করে, আমার আর কেউ নেই—

আমি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম। এইবার বলিলাম—তোমার স্বামী কি কাজ করে?

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—কাজ! ওরে আমার কাজের শিরোমণি রে! ও করবে কাজ? সেদিন পুবের সুয্যি পশ্চিম পানে ওঠবে না?

পুরুষটি লজ্জিতভাবে বলিল—না বাবু, কাজ আমি করিনে। সে ক্ষ্যামতা নেই তো করবো কি। ও-ই ধান ভেনে দাইগিরি করে সংসার চালায়। তা এই বাজারে বড্ড কষ্ট হয়েচে বাবু।

মেয়েটি বলিল, তুমি থামবে বাপু, না বকে যাবে? বাবু, শুনুন তবে বলি। কষ্ট-দুঃখুর বার্তা ও কি জানে। সংসারের কোনো খোঁজ রাখে ও?

কৃতজ্ঞতার আবেগ বোধ হয় অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল পুরুষটির। সে পুনরায় নম্র সুরে বলিল—তা যা বললে ও, সেকথা সত্যি বটে। ও আমাকে জানতে দ্যায় না। নিজি সব করবে। আমি তো খাটতি পারিনে—আমার এই ডান পাডা একটু খোঁড়া, হাঁটতি পারিনে—এই দেখুন বাবু, এই পাডা—

মেয়েটি আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—নাও, আর বাবুদের সামনে তোমার পা বার করতি হবে না—

কিন্তু দেখিলাম মেয়েটির চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে। এই গনোরিয়া-গ্রস্ত খোঁড়া অকর্মণ্য বৃদ্ধের প্রতি এতটা দরদ ওর! দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—তুমি ধাইয়ের কাজ জানো বললে না?

পুরুষটি এ-কথার উত্তর দিল। বলিল—খুব ভালো ধাই। তা যে বাড়ি যাবে, এক কাঠা করে চাল, একখানা করে কাপড়, একটি করে টাকা—ও-ই খরচ করে আমার চিকিচ্ছে করাচ্চে বাবু।

মেয়েটি উহাকে থামাইয়া বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি! তুমি কী জানো ও সবের? বাবু, ধাইয়ের রোজগার আগে চলতো ভালোই। এখন আপনাদের এখানে হাসপাতাল হয়েছে পোয়াতিদের জন্যি। সব লোক এখানে আসে। আমাদের কাছে কেডা যাবে? ধান ভেনে যা হয়। দু-মণ ধান ভানলি পাঁচ কাঠা চাল পাওয়া যায়—কিন্তু বাবু, অসুখে ভুগে ভুগে আমার গতর গিয়েচে, আর তেমন খাটতি পারিনে। ধান ভানা বড্ড খাটুনির কাজ। যেদিন ধান ভানি, আজকাল রাত্তিরি বড্ড

পা কামড়ায়—

আমি বলিলাম—তোমার কে কে আছে আর?

মেয়েটি সাফ উত্তর দিল—যম।

—জাতে হাড়ি বললে না?

—হ্যাঁ, বাবু।

—ঝিটকিপোতা থেকে এলে কি করে? সে তো অনেক দূর।

—নৌকো করে এ্যালাম বাবু।

—ভাড়াটে নৌকো?

—অনেক কেঁদে হাতে-পায়ে ধরে তেরো গণ্ডা পয়সা ঠিক হয়েল। ওই আমাদের গাঁয়ের রতন মাজি। আমি তাকে ধরম বাপ বলে ডেকেচি।

—ধানের চাষ কর?

—না বাবু, ঘর-দোর নেই তার ধানের জমি। বিচুলির ছাউনি একখানা ঘর, তা এবার খসে পড়ছে। না খুঁচি দিলি এবার বর্ষায় সে ঘরে থাকা যাবে না।

বেলা হইয়াছিল। সেদিন চলিয়া আসিলাম। ইহার পর হইতে প্রায়ই দু-দিন অন্তর মেয়েটি উহার স্বামীর হাত ধরিয়া ডাক্তারখানায় হাজির হয়। কখনো ঔষধের দাম কমাইবার জন্য সীতানাথ ডাক্তারের হাতে পায়ে পড়ে, কোনোদিন স্বামীর সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করে, কবে রোগ সারবে, নৌকো ভাড়া দিয়া আর পারে না সে—ইত্যাদি।

দেখিয়া-শুনিয়া সীতানাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওকে কেমন দেখেন? ওর রোগ সারবে?

সীতানাথ ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বাস তো হয় না। নানান উপসর্গ। ওর শরীরে কিছু নেই—তবে চেষ্টা করচি, এই যা।

অবশ্য উহাদের সাক্ষাতে একথা হয় নাই।

মাসখানেক পরে একদিন ডাক্তারখানায় বসিয়া আছি, মেয়েটি আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর কিছুদিন এমনধারা চলিলে ইহারই চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে। হয়তো নিজে আধপেটা খাইয়া স্বামীর ঔষধ-পথ্য ও নৌকোভাড়া যোগাইতেছে। পরনের বস্ত্রও জীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে। সেদিনের কাজ শেষ করিয়া তাহারা যখন চলিয়া যায় তখন মেয়েটিকে ডাকিয়া বলিলাম—শোনো এদিকে।

—কি বাবু?

—ধাইয়ের কাজ করতে পারবে?

সে হসিয়া বলিল—ঐ কাজই তো করি বাবু। তা আর পারবো না?

আমি উহাদের সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উদ্দেশ্য আমার বাসাটা তাহাকে চিনাইয়া দেওয়া। সে মাসেই আমার বাসাতে ধাত্রীর প্রয়োজন উপস্থিত হইবে। পথে মেয়েটি বলিল—দিন না বাবু একটা কাজ জুটিয়ে। বড় কষ্টে পড়িচি এনাকে নিয়ে। এক এক শিশি ওষুধ পাঁচ সিকে-দেড় টাকা। আমার রোজগার বড্ড মন্দা হয়ে গিয়েচে। আর চালাতি পারচিনে। দিন একটা জুটিয়ে, যা দেবে তাই নেবো। এক কাঠা চাল, একখানা কাপড়, আর না হয় আট আনা পয়সা দেবে--তাই নেবো। আমার খাঁই নেই বাবু অন্য ধাইয়ের মতো। তা বাবু, আমি রাত্তিরি আঁকড়ে থাকবো, সেঁক-তাপ করবো, ছাড়া কাপড় কাচবো—

অনুনয়ের সুরে বলিল—দিন একটা কাজ জুটিয়ে—

আমি বলিলাম—ওই আমার বাসা। আর দিন আষ্টেক পরে আমার বাসাতে দরকার হবে ধাইয়ের। চলো আমার সঙ্গে, দেখিয়ে আনি। ওকে এখানে বসিয়ে রাখো পুরুষটিকে বলিলাম—তুমি এই গাছতলায় ছায়ায় বসে থাকো, বুঝলে?

বাড়িতে আনিয়া ধাইকে দেখানো হইল। কিন্তু বাড়িতে ও ধাই পছন্দ হইল না, অজুহাত অবশ্য পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ধাই, উহাদের কী জ্ঞান আছে—ইত্যাদি। কিন্তু আমার সন্দেহ হইল আসল কারণ, মেয়েটি দেখিতে ভাল এবং আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি বলিয়া।

পরদিন আবার রাস্তায় দেখা তাহাদের সঙ্গে। ডাক্তারখানায় দু-জনে চলিয়াছে।

আমাকে মেয়েটি ডাকিয়া বলিল—ও বাবু, শুনুন—

আমি তাহার কিছু না করিতে পারিয়া লজ্জিত ছিলাম। বলিলাম—বলো—

—আপনার বাড়িতে হল না?

—ইয়ে—না—ওদের সঙ্গে কমলা ধাইয়ের কথাবার্তা আগেই হয়ে গিয়েচে কিনা! তাই—

—যাক গে বাবু। আপনি অন্য এক জায়গায় জুটিয়ে দিন না?

—দেখবো। আরও এক জায়গায় সন্ধান আছে আমার।

—দেখুন। তিনিই দয়া করবেন। চরিতামৃতে প্রভু বলেচেন—

হাড়ির মেয়ের মুখে এ-কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম—তুমি চৈতন্যচরিতামৃত পড়? লেখাপড়া জান নাকি?

পুরুষটি বলিল—ও জানে।

—বইখানা আছে নাকি তোমাদের বাড়ি?

আছে বাবু, ও রোজ পড়ে আমাকে শোনায়। বই পড়ে আর কাঁদে।

মেয়েটি সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বলিল—তোমার অত ব্যাখ্যানা করতি হবে না,

চুপ কর। না বাবু, ওর কথা শোনবেন না। পড়ি একটু একটু সন্দে বেলাডা। তা ও-বই পড়ে বোজবার মতো অদেষ্ট কি আমাদের আছে বাবু?

—লেখাপড়া শিখলে কোথায়?

উহার স্বামী বলিল—ওর মামার বাড়ি ছেল ধরমপুকুর। শুয়োরের ব্যবসা ছেল মস্ত। অবস্থাও ছেল ভালো। এখন তাদের কেউ নেই, মরে-হেজে গিয়েচে—নইলে আজ এমন দুর্দশা হবে কেন ওর বাবু? ও ছেলেবেলায় মামাদের কাছে থেকে ইস্কুলি নেকাপড়া করেল।

—কি ইস্কুল?

বৌটি ইহার উত্তর দিল, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পুরুষটির সাধ্যাতীত। অতি জটিল প্রশ্ন।

—আপার প্রাইমারি ইস্কুল বাবু।

—পাস করেছিলে?

—হুঁ। এখানে এসে পরীক্ষা দিয়া গিইছিলাম।

উহার স্বামী সপ্রশংস মুগ্ধ-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বাবু, ও পাস করে দু-টাকা ইস্কলাসি পেয়েল।

বৌ ধমক দিয়া উঠিল—তুমি চুপ করো দিকিনি!

পুরুষটি তখনও ঝোঁক সামলাইতে পারে নাই। বলিল—বাবু, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আর নেকাপড়া হল না ওর। মামারাও মরে-হেজে গেল। ও যেমন মেয়ে, আমার হয়েচে সেই যারে বলে—বাদরের গলায় মুক্তোর মালা। সব অদেষ্টের ফল আর কি! আমি ওরে খেতি দেবো কি, আমি অসুখে পড়ে পর্যন্ত ও-ই আমারে খেতি দ্যায়। আমার এই চিকিচ্ছেপত্তর ও-ই সব চালাচ্চে। আজকাল রোজগার নেই ওর—পেটভরে দুটো খেতিও পায় না—আমাকে বলে, তুমি সেরে উঠলি আমার—

বৌ আবার কড়া ধমক দিয়া উঠিল—আবার! বাবুর সামনে ওই সব কথা? চলো বাড়ি তুমি—ঝাঁটা মারবো তোমার মুখি—তোমার খুব মুরোদ! মুরোদের আবার ব্যাখ্যানা হচ্চে—লজ্জা করে না তোমার?

আমি মধ্যস্থতা করিয়া বলিলাম—কেন, ও তো ভালোই বলচে। ওর যা ভালো লেগেচে, ভালো বলবে না?

বৌ সলজ্জ সুরে বলিল—না বাবু, যেখানে সেখানে ওসব কথা কে বলতে বলেছে ওকে?

—তা বলুক। কোনো দোষ হয়নি।

—বাবু, আমারে দেন একটা কাজ জুটিয়ে—

—চেষ্টা করবো। একটু অপেক্ষা করো, দেখি দু-একদিন।

—কাজ না পেলি বড্ড কষ্ট হচ্চে। ধান ভানতি শরীর আর বয় না। দু-মণ করে ধান না ভানলি এই যুদ্ধুর বাজারে দুটো লোকের খাওয়া হয়? তাও বাবু, শুধু খাওয়া। পরা এ থেকে হয় না। একখানি কাপড় ঠেকেচে। একটা আঁতুড়ের কাজ জুটলি তবু একখান কাপড় পাবো।

কয়েকদিন ধরিয়া তাহাদের আর দেখিলাম না। কাজও কিছু জুটাইতে পারা গেল না। কাহার বাড়িতে কে অন্তঃসত্ত্বা আছে এ সংবাদ যোগাড় করা আমার কর্ম নয় দেখিলাম।

এই সময় মন্বন্তর শুরু হইয়া গেল। চাউলের দাম আগুন হইয়া উঠিতেছে দিন-দিন। আমাদের এই ক্ষুদ্র টাউনের আশপাশের পল্লিগ্রাম হইতে দলে দলে ক্ষুধার্ত নরনারী হাঁড়ি ও মালসা হাতে ফ্যান ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল, ফ্যানও অমিল। দশ বিশ সের ফ্যান কোনো গৃহস্থবাড়িতে থাকে না, যাহা থাকে তাহা প্রথম মহড়াতেই ক্ষুধা-ক্লিষ্ট নরনারীদের মধ্যে বিলি হইয়া যায় —একটু বেলায় যাহারা আসে, তাহাদের শুধু-হাতে ফিরিতে হয়। লোক দু-একটি করিয়া মরিতে শুরু করিল তাহাদের মধ্যে। টাউনের কুণ্ডু বাবুরা ও দাঁ বাবুরা প্রতিদিন একশত দেড়শত লোককে খিচুড়ি খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু অর্ধোলঙ্গ অনশনক্লিষ্ট দিশাহারা নরনারীদের সংখ্যার তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প। ইহার মধ্যে আবার ত্রিপুরা জেলা হইতে বহু নরনারী আসিয়া কোথা হইতে জুটিল, তাহাদের কথা ভাল বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া যে গৃহস্থের দোরে যায়, তথা হইতে তাহারা বিতাড়িত হয়, কোথাও তাহারা তেমন সহানুভূতি পায় না।

এই মহাদুর্যোগের হিড়িকে কত লোককে তলাইয়া যাইতে দেখিলাম। কতবার মনে ভাবিয়াছি ওই মেয়েটির কথা। ধান ভানিয়া রুগ্ন স্বামীর চিকিৎসা চালাইত। নৌকো ভাড়া করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া আসিত ডাক্তারখানায়। চৈতন্যচরিতামৃতের কথা বলিত। তাহাদের আর পথেঘাটে দেখি নাই অনেকদিন। সীতানাথ ডাক্তারকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম। সীতানাথ বলিলেন—না, তারা অনেকদিন আসেনি। আর আসবে কে, এই তো কাণ্ড! ওষুধের দাম দিতে পারে না—ক-শিশি ওষুধের দাম এখনো বাকি।...

অনেকদিন উহাদের দেখি নাই। প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি।

ভাদ্রমাসের দিকে আমাদের মহকুমার রিলিফ কমিটির যত্নে লঙ্গরখানা খোলা হইল। সেখানে প্রত্যহ বহু দুঃস্থ নরনারী লঙ্গরখানার খিচুড়ি খাইতে আসিত।

উহাদের মধ্যে একদিন আবার মেয়েটিকে দেখিলাম। একটা মালসায় করিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছে।

আমি ডাকিয়া বলিলাম—তুমি কোথায় এসেছিলে?

আমায় দেখিয়া সে লজ্জিত হইল।

বলিল—এই—

—তোমার স্বামী কোথায়?

—ওই পুরনো ডাকঘরের পেছনে বটতলায়। আজকাল হাঁটতি পারে না মোটে।

—চলো, দেখে আসি।

কৌতূহল হইল দেখিবার জন্য, তাই গিয়াছিলাম। গিয়া মনে হইল না-আসিলে আমাকে বড় ঠকিতে হইত ; কারণ যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা সচরাচর চোখে পড়ে না।

পুরানো পোস্টাফিসের পিছনে যেখানে গভর্নমেন্টের কলেরা ওয়ার্ডের ঘর, তার সামনে বটতলায় এক ছেঁড়া-চাটাই পাতিয়া বৌটির খোঁড়া স্বামী শুইয়া আছে। মনে হইল, লোকটা চাটাইয়ের সঙ্গে মিশিয়া আছে, এত রুগ্ন। মেয়েটি তার পাশে বসিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি তাহাকে খাওয়াইতেছে। দুপুর বেলা। রাস্তা দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিতেছে, কেহ চাহিয়া দেখিতেছে, কেহ দেখিতেছে না। খাওয়ানো শেষ হইলে সে কলেরা ওয়ার্ডের কম্পাউন্ডের টিউবওয়েল হইতে শতচ্ছিন্ন শাড়ির আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া স্বামীর মুখে নিংড়াইয়া দিল। লোকটা হাঁ করিয়া দু-ঢোঁক জল গিলিয়া বলিল—আর একটু খাবো—

মেয়েটি আবার গেল টিউবওয়েলের কাছে, আবার শাড়ির আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া ওর মুখে দিল। আমি কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই।

বলিলাম—অমন করে জল আনচো কেন?

মেয়েটি বাঁ-হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল—ঘটি বাটি কিছু নেই। কিসে জল আনি?

—কেন মালসাটা?

সে মালসাটা তুলিয়া আমার কাছে আনিয়া দেখাইল। বলিল—সবটা খেতে পারেনি। আধ মালসা রয়েচে। রাত্তিরে দেবো। খাওয়া কমে গিয়েচে একেবারে।

তারপর মালসাটা যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া বলিল—বড্ড কষ্ট হয়েচে বাবু—দিন না একটা কাজ-টাজ জুটিয়ে। এক কাঠা চাল শুধু--খুব কমের মধ্যে করে দেবো—

এই তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ।

নদীর ধারের বাড়ি

শ্যামলীদের বাসা ছিল পীতাম্বর লেনে। দু-নম্বর পীতাম্বর চৌধুরী লেন। সেকেলে পুরনো বাড়ি, দোতলার ছ-টি ঘরে ছ-টি পরিবারের বাস। কলকাতায় দু-টি বেলা সমানে ঝগড়া চলে জল তোলা নিয়ে। শ্যামলী ওর মধ্যে একটু দেখতে ভালো, বয়েস ত্রিশের সামান্য ওপরে, দু-এক বছর। চার সন্তানের মা, দু-টি মেয়ে, দু-টি ছেলে।

বেলা দশটা বাজে।

শ্যামলীর স্বামী খেতে বসেচে। শ্যামলী ডালের বাটিতে হাতা ডুবিয়ে সামনে বসে আছে।

শ্যামলী বললে—ফিরবে কখন?

শ্যামলীর স্বামীর নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য। যদুনাথ একটা সওদাগরী আপিসে সত্তর টাকা মাইনের চাকুরি করে। যুদ্ধের বাজারে তাতে চলে না। খাওয়া-দাওয়ার অসীম কষ্ট। ছেলেমেয়েগুলো দুধ খেতে পায় না ; দুটো শুকনো মুড়ি চিবোয় স্কুল থেকে এসে।

যদুনাথ বললে—ফিরতে সাতটার পরে।

—আর একটা বাড়ি দ্যাখো, বুঝলে।

—সে তো বুঝলাম, বাড়ি মিলচে কই? খুঁজতে কি কম করচি?

—এ বাড়িতে আর টেঁকা যায় না।

—কালও ঝগড়া হয়েছিল?

—কবে না হয়? বিশ্বেস গিন্নির সঙ্গে মতির মা-র ঝগড়া কালও খুব। অভয়ার সঙ্গে রামবাবুর বৌয়ের ঝগড়া।

—জল তোলা নিয়ে?

—তা আবার কি নিয়ে? ও তো রোজকার ঘটনা লেগেই আছে। রোজ রোজ এ ইতরুমি আর ভালো লাগে না। অসহ্য হয়ে উঠেচে।

যদুনাথ চলে গেল। শ্যামলীর ছেলেমেয়েরা খেয়েদেয়ে স্কুলে চলে গিয়েছিল; ছেলে দু-টি বড়, তারা হাই-স্কুলে পড়ে। মেয়ে দু-টি পড়ে মোড়ের কর্পোরেশন স্কুলে। ছোট রান্নাঘর, একটি লোক ক্লায়ক্লেশে বসে দুটি আহার করতে পারে। আজ ন-টি বছর এ বাসায়, বড় মেয়ে লীলার বয়েস। এই বাসাতেই লীলার আঁতুড়

হয়েছিল। রান্নাঘরের সামনে খোলা ড্রেনে তরকারির খোসা, ফেন, শাকের ডাঁটা, চিংড়ি মাছের খোসা জমে দুর্গন্ধ বার হচ্চে। এই দুর্গন্ধ আর এই কুশ্রী দৃশ্য আজ ন-বছর ধরে সহ্য করতে করতে নাক অসাড় হয়ে গিয়েচে, এখন আর দুর্গন্ধকে দুর্গন্ধ বলে মনে হয় না।

বীণা ওপরের তলার মনোরঞ্জনবাবুর মেয়ে। সে শ্যামলীকে ভালোবাসে। কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে—কাকীমা, কি রাঁধলে?

—মুসুরির ডাল আর চচ্চড়ি।

—মাছ আনেননি কাকাবাবু?

—নাঃ। দু-টাকা চিংড়ি মাছের সের। মাছ আর কি কেনবার জো আছে? উনি গিয়ে ফিরে এলেন।

—এবার রেশনের চালে কাঁকর খুব কম, কাকীমা। আপনারা রেশন আনেননি?

—বুধবার আসবে রেশন। এখনো আনা হয়নি। তোমার কাকা যেতে সময় পাননি।

বিকেলে কলে জল আসতেই ওপরের ভাড়াটে-গিন্নিরা বড় এক-একটি বালতি, ঘড়া বসিয়ে দিলেন কলের মুখে। একজন একটা তুলে নিয়ে যায় তো আর একজনে একটা বসায়। এইজন্যে চৌবাচ্চায় মোটে কয়েক ইঞ্চির বেশি জল জমতে পায় না। গা ধোবার কি কষ্ট বিকেলে। এই গুমট গরমে স্নিগ্ধ জলে স্নান করতে পারলে কী আনন্দই পাওয়া যেতো! কিন্তু তা হওয়ার জো নেই। এক-একজন ছোবড়া আর সাবান নিয়ে নামবে ওপর থেকে, আধ ঘন্টা ধরে থাকবে। প্রথমে নামবে অভয়া, তারপর নামবে মতির দিদি, এরা দু-জনেই ভীষণ ঝগড়াটে। যতক্ষণ তারা কলতলায় গা ধোবে, ততক্ষণ কলে এক ঘটি জল কারো নেবার জো নেই—তাহলেই বাধবে ধুন্দুমার ঝগড়া।

অভয়া বাঙাল দেশের মেয়ে। বেশ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। শ্যামলীকে ডেকে বললে—ও দিদি, কি হচ্চে?

—কুটনো কুটচি ভাই।

—কি কুটনো?

—ঝিঙে আর ঢেঁড়স। আলু তো বারো আনা সের উঠেচে। আমাদের সাধ্যিতে কুলোলে তো কিনবো!

—রেশন এসেচে?

—না ভাই, বুধবারে আসবে।

—আমায় আধপোয়া চিনি দিতে পারবে দিদি তোমাদের রেশন থেকে?

—আসুক আগে, দেখবো এখন।

এদের মধ্যে সবাই সমান অবস্থার মানুষ। কেরানীর বৌ। পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করে এদের দিন কাটে। পান থেকে চুন খসলেই আর নিস্তার নেই। বিশ্বাস-গিন্নি দলের মোড়ল, ওপরের ভাড়াটেদের সর্দার। তিনি সকলের হয়ে ঝগড়া করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর সর্দারীতে ওপরের মেয়েরা কোমর বাঁধে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে এই অভয়া। দেখতে সুন্দরী হলে কি হবে, যেমনি স্বার্থপর তেমনি কুটিল মন। এই যে বললে চিনি দিতে হবে, 'না' বললে আর রক্ষে আছে? কোন্ কালে এক বাটি নুন ধার দিয়েছিল, সেই ঘটনার উল্লেখ করে খোঁটা দিয়ে বলবে, বরিশালের টানে —আমরা কি কোনোদিন কিছু কাউকে দিইনি নাকি! সময়ে অসময়ে নুন রে—তেল রে —তা নিয়ে মনে থাকবে ক্যানে? ঘোর কলি যে! কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরলে পাজী—আচ্ছা, আমরাও কি আর কখনো কাজে লাগবো না। তখন যেন—ইত্যাদি।

এই বাসাটাতে কী গুমট গরম! দক্ষিণ দিক চাপা, এতটুকু হাওয়া আসে না, প্রাণ আইঢাই করে গরমে। আজ ন-বছর কষ্টভোগ চলচে। এই ঝগড়ার আবহাওয়া আর এই দারুণ স্থানাভাব। সকলের ওপরে এই অপরিষ্কার, নোংরা পরিবেশ। সবাই সমান অশিক্ষিতা, ভালো বললেও এ বাড়িতে মন্দ হয়। সেদিন অপরাধের মধ্যে ও শশীবাবুর স্ত্রীকে বলেছিল—দিদি, চিংড়ি মাছের খোসাগুলো একেবারে সামনেই ফেললেন, কলতলায় সকলেরই যেতে-আসতে হয়—সকলেরই তো অসুবিধে।

আর যাবি কোথায়! শশীবাবুর বৌ চিৎকার জুড়ে দিলে—আমি কি একলা ফেলি নাকি, সবাই তো ফেলে, কেনই বা না ফেলবে ; ভাড়া দিয়ে সবাই বাস করে, কারো একার সম্পত্তি তো নয় ; সবারই সুবিধে এখানে দেখতে হবে—যদি তাতে অসুবিধে হয় তবে গরিব ভাড়াটেদের সঙ্গে বাস করা কেন, তাহলে দোতলা বাড়ি আলাদা ভাড়া নিয়ে বালিগঞ্জে গিয়ে বাস করলেই তো হয়—ইত্যাদি।

শ্যামলীও চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়, সে বললে—দিদি, কি পাগলের মতো বকচেন ? আপনি চিংড়ি মাছের খোসা ফেলবেন তাতে কেউ বারণ করচে না, তবে আমারই রান্নাঘরের সামনে কেন ফেলবেন? কেন আমি তা ফেলতে দেবো?

—ফেলতে দেবে না—তোমার কথায়? কি তুমি এমন লাট সায়েব এয়েচ রে বাপু। তুমি পাগল না আমি পাগল? রান্নাঘরের বাইরের জায়গা তোমারও যা, আমারও তা—তুমি বলতে আসবার কে?

—তা-বলে পরের সুবিধে-অসুবিধে যারা না দেখে তারা আবার মানুষ? তাদের আমি ঘোর অমানুষ বলি।

এই পর্যন্ত গেল সাধারণ ভাবের কথা, একে ঝগড়া বলে অভিহিত করা যায় না। এর পর বাধলো আসল ঝগড়া, যার নাম—। শ্যামলীও ছাড়লে না, শশীবাবুর বৌও না—উভয়পক্ষে বাধলো কুরুক্ষেত্র। তারপরে কথা একদম বন্ধ হয়ে গেল দু'পক্ষেই। নানারকম শত্রুতা আরম্ভ করলেন শশীবাবুর প্রৌঢ়া স্ত্রী। ছেলেমেয়ের হাত ধরে খোলা ড্রেনে বসিয়ে দিতে লাগলেন সকালবেলা, পায়খানা থাকা সত্ত্বেও। প্রায় শ্যামলীর রান্নাঘরের সামনেই। কিছু বলবার জো নেই। ওই আর এক গোলমাল। একটি মাত্র পায়খানা নিচে। মেয়ে পুরুষ তাতে যাবে। কী নোংরা করেই রাখে মাঝে মাঝে! ভোরে অন্ধকার থাকতে যদি ঘুম ভাঙে, তবে কল-পায়খানা ব্যবহার করা যাবে সেদিন, নয়তো বেলা এগারোটা, পুরুষরা সবাই আপিসে বেরিয়ে গেলে। চৌবাচ্চায় তখন দু-ইঞ্চি মাত্র জল থাকে কোনোদিন, কোনোদিন তারও কম।

শ্যামলীর দম বন্ধ হয়ে আসে।...

এমনকি কোনো বাসা পাওয়া যায় না যাতে অন্তত মেয়েদের একটা আলাদা নাইবার জায়গা আছে?...

আষাঢ় মাসের প্রথম।

ফিরিওয়ালা গলির মধ্যে হাঁকচে—চাই ল্যাংড়া আম—ল্যাংড়া আ-আ-ম—

বৃষ্টি এখনও নামেনি এবার। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম প্রায় সমানভাবেই চলচে। মতির ছোট বোন এসে বললে—দশ পলা তেল ধার দেবেন কাকীমা?

শ্যামলী বললে—হবে না। তেল নেই।

—আট পলাও হবে না?

—কিছুই নেই।

মেয়েটা চলে গেল। শ্যামলী তেল দেবে কি, ওদের কোনো আক্কেল নেই। শ্যামলী কি সাধে বিরক্ত হয়েছে? উনি খারাপ কলের তেল খেতে পারেন না বলে এক নম্বর কানপুর কিনে আনেন ওঁর আপিসের রেশান বেচে। সে কী ঝাঁঝওয়ালা তেল! মতিরা এক কৌশল ধরেচে কি, বিশ পলা সেই ভালো তেল হপ্তায় ধার নেবে, আর ধার শোধ দেবে পাঁচ সিকে সেরের কলের তেল দিয়ে। উনি বলেন, ও তেল খেলে বেরিবেরি হয়। শ্যামলীদের ফি হপ্তায় বিশ পলা তেল অপব্যয়ে যায়।

ওরা চালাক আছে। একবার নেবে দশ পলা, তারপর আর একদিন এসে দশ পলা। একসঙ্গে নেবে না। একেবারে যেন মৌরসী পাট্টা করে বসেচে।... দেবো না তেল, রোজ ও চালাকি খাটবে না আমার কাছে। দেখি কি হয়।

কিন্তু মতির মায়ের কৌশল অন্যরকম। সে একটুও চটলো না, আবার একবার বাটি হাতে এসে হাজির স্বয়ং মতির মা।

—ও শ্যামলী, দে দিকি ভাই একটু তেল।

—তেল নেই দিদি।

—দিতেই হবে। মাছ ভাজা হচ্চে না, পাঁচ পলা তেল দে—

—যা আছে আমারই কুলোবে না দিদি—

—দেখি তোর তেলের বোতল। দে ভাই আমায় পাঁচ পলা—

অগত্যা শ্যামলী উঠে গিয়ে তেল দেয়। ও আবার পরের কাঁদুনি-মিনতি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঠকচে তো দেখাই যাচ্চে, ঠকুক। লোক তাতে খুশি হয়, হোক।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে নিয়ে দোতলার ভাড়াটেদের মধ্যে মহা ঘোঁটমঙ্গলের সৃষ্টি হল। মতির মা গিয়ে সাতখানা করে লাগিয়েচে তাদের কাছে।...তেল থাকতেও দিতে চাচ্ছিল না, বোতল দেখতে চাইলুম, তাই তো দিলে। এমন ছোট নজর তো কখনো করতে পারি নে আমরা। এই যে সেদিন বোশেখ মাসে ওঁর পেটের ব্যথা ধরলো রাত্তিরে, যদুবাবু সোডা চেয়ে নিয়ে যাননি আমাদের এখান থেকে? দিইনি আমরা? লোকের কাছে হাত পেতে যেমন নিতে হয়, তেমনি দিতেও হয়। তবে লোকে মানুষ বলে।

তার পরের দিন আর কলতলায় যাওয়া যায় না। বড় বড় বালতি, ঘড়া আর টব পড়লো একের পর এক সকাল থেকে। সে সব সরিয়ে এক বালতি রান্নার জল নিতে গেলেও ঝগড়ায় মুখর হয়ে উঠবে সারা বাড়িটা—সেকথা শ্যামলী ভাল রকমই জানে। অনেকবারের অভিজ্ঞতায় জানে। সুতরাং আষাঢ় মাসের গুমট গরমে বেলা এগারোটা পর্যন্ত তাকে অস্নাত অবস্থায় থাকতে হল। এগারোটার পর কলের জল কখন চলে গেল। যখন সে নাইতে গেল, তখন চৌবাচ্চায় ইঞ্চি চারেক মাত্র জল। কাকের মুখ থেকে তার মধ্যে পড়েচে ভাত।

এই সময়ে একদিন যদুবাবু এসে বললেন, ওগো, শোনো, একটা সন্ধান পেয়েচি। রানাঘাট থেকে নেমে যেতে হয় প্রায় এগারো মাইল উত্তরে, বল্লভপুর বলে পাড়াগাঁ। সেখানে কলকাতার এক বড়লোকের জমিদারি কাছারি ছিল, বিক্রি করে ফেলেছে। মাঝে মাঝে যেতো বলে কাছারি-বাড়ির সংলগ্ন দোতলা বাড়ি তৈরি করেছিল, ওপরে নিচে পাঁচখানা ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর, নাইবার ঘর সব আছে। দশ বিঘে জমির ওপর কাছারিবাড়ি, তাতে আম-কাঁঠালের গাছ, কলাগাছ আছে। বাড়ির সেই জমির নিচে দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্চে, তাতে জমিদার বাঁধানো ঘাটলা করে দিয়েচেন,

বাড়ির মেয়েরা যখন গিয়ে থাকতো তাদের নাইবার সুবিধার জন্যে। সবসুদ্ধ তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা হলে বাড়িটা পাওয়া যায়—জমিসুদ্ধ—কিনবো? প্রভিডেন্ট ফন্ডের টাকা সব যদি তুলে নিই—

—অত কমে হবে?

—পাড়াগাঁ। কে সেখানে খদ্দের হচ্চে? যদ্দুর শুনলাম, চাষাগাঁ। গাঁয়েও অত টাকা দিয়ে কেনবার লোক নেই।

—টাকা দেবে কোথা থেকে?

—প্রভিডেন্ট ফন্ডের টাকা সব তুলে নিই। তোমার গহনা কিছু দাও আর ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে কিছু ধার করি। আমার কাছেও সামান্য কিছু আছে।

শ্যামলীর মন নেচে উঠলো। কতদিন সে পাড়াগাঁয়ের মুখ দেখেনি। বাপের বাড়ি ছিল হুগলী জেলার তারকেশ্বর লাইনে দাসপুর গ্রামে। সে বংশের বাতি দিতে কেউ নেই। জ্ঞাতি কাকারা পর্যন্ত উঠে এসে কলকাতায় বাস করচেন, ঘোর ম্যালেরিয়া, চলে না সেখানে থাকা।

যদি এ সম্ভব হয়।

ভগবান কি এত দয়া করবেন? তা কি তার কপালে সম্ভব হবে?

শ্যামলী বললে—কিন্তু তুমি কোথায় থাকবে?

—কেন, সেখানে।

—আপিস?

—চাকুরি ছেড়ে দেবো। একঘেয়ে হয়ে গিয়েচে এ জীবন। আর ভাল লাগে না। স্বাস্থ্য যেতে বসেচে। একটু সাহস করে দেখি, যা আছে কপালে। ওখানে জায়গা-জমি নিয়ে চাষবাস করবো।

—ছেলে দুটোর লেখাপড়া?

—রানাঘাটে বোর্ডিংয়ে থাকবে। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন। আর এ যা লেখাপড়া শিখচে, এ শিখে তো কেরানী হবে? তার চেয়ে ভাল কাজ ওখানে শিখতে পারবে। বিলেত থেকে লোক গিয়ে আমেরিকায় বাস করে আমেরিকা যুক্তরাজ্য স্থাপন করেছিল। অজানায় পাড়ি না দিলে মানুষ, মানুষ হয়ে ওঠে না। জীবন উপভোগই যদি না করলুম, বেঁচে থেকে কি হবে? গ্রামের লোকদের কাছে দুটো ভাল কথা বলবো। নাইট স্কুল করবো। বই পড়তে শেখাবো। এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সারা বিকেল আর রাত ধরে পরামর্শ হল। শ্যামলীর চোখে

রঙিন স্বপ্ন ভেসে উঠেছে—দূরের-পাখি-ডাকা ফুল-ফোটা সুমুখ-জ্যোৎস্না-রাত্রির প্রহরগুলি। কত অলস মধ্যাহ্নে বনানীকোলে ঘুঘুর ডাক শোনা—বিছানায় আধ-জাগরিত আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে। কত আম্রমুকুলের গন্ধে সুবাসিত সকাল-সন্ধ্যা।

দিন পনেরো পরে।

যদুবাবুর সঙ্গে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক শ্যামলীদের বাসায় ঢুকলেন। যদুবাবু বললেন, উনি এখানে খাবেন।

শ্যামলীকে আড়ালে বললেন—উনি ওদের স্টেটের নায়েব, ওঁরও নাম যদুবাবু। তবে উনি কায়স্থ। আমাকে বলে-কয়ে উনিই বাড়ি দেওয়াচ্ছেন। অতি ভদ্রলোক। একটু ভাল করে খাওয়াও-দাওয়াও। সাড়ে তিনের মধ্যে হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে জমিদারের খাস কিছু রোয়া ধানের জমি আছে, সেটাও ওই সঙ্গে হয়ে যাবে।

আহারাদির পরে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করলেন যদুবাবুর সঙ্গে। তারপর চা খেয়ে বিদায় নিলেন। এর তিনদিন পরে শ্যামলীকে যদুবাবু বললেন, বাড়ি রেজেস্ট্রি করা হয়ে গিয়েচে।

আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জিনিসপত্র গুছিয়ে শ্যামলীরা তাদের নতুন কেনা বাড়িতে বাস করতে চললো। কলকাতার বাসা একেবারে উঠিয়ে দিলে না, কিছু কিছু জিনিসপত্র ঘরে রেখে ঘর চাবিবন্ধ করে গেল।

রানাঘাট থেকে ট্রেন বদলে ওরা বেলা দশটার সময় বনগাঁ লাইনের গাংনাপুর স্টেশনে নামলো। আগে থেকে বন্দোবস্ত করার ফলে বল্লভপুর গ্রামের একখানা গরুর গাড়ি স্টেশনে উপস্থিত ছিল।

মাঠ ও বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এ-গ্রাম ও-গ্রাম পেরিয়ে চললো গাড়ি। বেলা প্রায় তিনটের সময় সামনের একটা ঝাঁকড়া বটগাছ দেখিয়ে গাড়োয়ান বললে—ওই বুঁদীপুরের বনবিবিতলা দেখা যাচ্চে—এর পরেই বল্লভপুর।

শ্যামলীর বুক দুলে উঠলো। কি জানি কেমন হবে এত আশা-সুখে কেনা বাড়িটা, কেমন হবে সেখানকার জীবনযাত্রা! জানাকে ফেলে অজানাকে তো আঁকড়ানো হল চোখ বুজে, এখন সেই অজানার প্রকৃতি কি, সেটা এখুনি তো বোঝা যাবে আর একটু পরেই। কি গিয়ে দেখবে যে সেখানে, কি জানি! সর্বস্ব খুইয়ে তার বিনিময়ে কেনা।

ক্রমে আরও আধঘন্টা কেটে গেল। বেলা বেশ পড়ে এসেচে। এমন সময় গাড়োয়ান বললে—এই যে বাবু, বাড়ির সামনে এসে গিয়েচে গাড়ি। নামুন মা-ঠাকরুন এবার।

দুরু দুরু বক্ষে শ্যামলী নামলো সকলের আগে। যদুবাবু বললেন—না দেখে বাড়ি কেনা। এতগুলো টাকা—বলতে গেলে, সর্বস্ব খুইয়ে—এই দূর গাঁয়ে বাড়ি কেনা।

তুমি আগে নেমে বাড়িতে ঢোকো। মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী কিনা, তুমি আগে ঢোকো। আমার তো সাহস হচ্চে না, কি জানি কি রকম হবে! নামো আগে।

—হ্যাঁগো, বাড়ি কি পরিষ্কার করা আছে, না একগলা ধুলো আর মাকড়সার জাল আর চামচিকের বাসা? গিয়ে এখন ঝাঁট দিতে হবে? চাবি কোথা?

গাড়োয়ান শুনতে পেয়ে বললে—মা-ঠাকরুন, বাড়িতেই আছে মুক্তোর মা গয়লানী আর তার ছেলে। তারাই বাড়ি দেখাশুনা করে, নিচের একটা ঘরে আছে। চাবি তো নেই, বাড়ি খোলাই পড়ে আছে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে একেবারে শ্যামলীর সামনেই যে বাড়িটা পড়লো, সেটা দেখে সে আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই বাড়ি তাদের! এমন বাড়ি এই অজ পাড়াগাঁয়ে!

কলকাতায় এমনি হলদে রঙ-করা সবুজ রঙের জানালা খড়খড়িওয়ালা দোতলা বাড়ি দেখেচে—দোতলাও নয়, বাড়িটা তেতলা—কিন্তু এমন বাড়িটা সত্যিই তাদের নিজস্ব!

শ্যামলী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে —ওগো, দ্যাখো, এসে দ্যাখো—

পরক্ষণেই ওর লজ্জা হল। গাড়োয়ানটা না জানি কি আদেখ্‌লেই মনে করলে ওকে। ততক্ষণে যদুবাবু ও ছেলেমেয়েরা বাঁশঝাড়ের মোড় ছাড়িয়ে বাড়ির কাছে এসে গিয়েচে। যদুবাবু বললেন—বাঃ, বেশ—বেশ—

রাস্তায় আসতে গাড়োয়ানকে যদুবাবু বাড়ির কথা বহুবার জিজ্ঞেস করেছিলেন। সে বলেছিল—চমৎকার বাড়ি বাবু। কলকাতার বাবুরা থাকবার জন্যি করেছেন। তেতলা বাড়ি, দরাজ জায়গা, নদীর ধারে বাঁধা ঘাট আছে, ফল-পাকড়ের গাছ। দ্যাখবেন বাড়ির মতো বাড়ি!

কিন্তু ছোটলোকের সে-কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি শ্যামলী বা তার স্বামী। এখন বাড়িটা দেখে মনে হল গাড়োয়ান অনেক কমিয়ে বলেছিল। বাড়িটা সম্বন্ধে আসল কথা হচ্চে অনেকখানি ফাঁকা জায়গার মধ্যে বাড়িটা দাঁড়িয়ে, অথচ ঠিক পাশেই গ্রামের বসতি।

বনানীর ও মাঠের সবুজের মধ্যে হল্‌দে রঙের বাহার।

ওরা হুড়মুড় করে সবাই গিয়ে বাড়ি ঢুকলো। নিচের ঘরে গিয়ে দেখলে সেখানে এক বুড়ি মাদুরের ওপর ঘুমিয়ে আছে। শ্যামলী ডাকলে—ও ঝি—কি যেন নাম ওর—মুক্তোর মা? ও মুক্তোর মা—

বুড়ি ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল। তারপর ঘুমজড়ানো চোখে ওদের দিকে খুব সামান্য একটুখানি চেয়ে থেকে তাড়াতাড়ি মাদুর ছেড়ে উঠে এসে শ্যামলীর

পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে বললে—পোড়াকপাল আমার মা, ঘুমিয়ে পড়িচি এই অবেলায়। বেনবেলা থেকে ওপরে নিচে সব ঘর ধোলাম, পোঁছলাম, ছাদ ঝাঁট দেলাম, বলি মা-ঠাকরুনরা আসচেন, বাবু আসচেন—তা ছাদ তো নয়, গড়ের মাঠ, এই হাতির মতো বাড়ি ধোয়ানো সামলানো কি এক দিনের কম্মো? আসুন মা-ঠাকরুন, আসুন বাবা—

শ্যামলী বললে—তোমার নাম মুক্তোর মা?

—বলে সবাই। বলো না, অদেষ্টের মাথায় মারি সাত খ্যাংরা? নামটাই আছে বজায়, যার জন্যি সে আর নেই। তা হলি কি আজ আমার ভাবনা—

শ্যামলীর ওসব কথা ভাল লাগছিল না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এক দৌড়ে বাড়িটার ওপর নিচ সব দেখে আসে। কিন্তু কী মনে করবে এরা! কী মনে করবে মুক্তোর মা!

ওরা সবাই মিলে নিচের ঘরগুলো দেখলে। বড় বড় দুটো ঘর, প্রশস্ত থামওয়ালা ঝিলিমিলি বসানো বারান্দা, ওদিকে অন্য একটা ছোট রোয়াকের সামনে রান্নাঘর। শ্যামলীর বড় ছেলে কানাই বললে—মা, এ তো রান্নাঘর নয়, এ আমাদের কলকাতার বাসা-ঘরের চেয়েও অনেক বড়। দ্যাখো কেমন আলমারি দেওয়ালের গায়ে।

বড় মেয়ে ডলি বললে—কতগুলো জানলা দ্যাখো মা রান্নাঘরে!

ওপরে সিঁড়ি বেয়ে দুড়দুড় করে সবাই উঠলো। শ্যামলী বললে—ওগো, দ্যাখো কী সুন্দর মেঝে! কাঁচের সার্সি বসানো জানালা!

কানাই ও ছোটছেলে বলাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে—কী সুন্দর সিনারি, দেখে যাও মা বারান্দা থেকে—ওই তো মাঠটার পরেই কেমন সুন্দর ছোট্ট নদীটা, ওপারে সবুজ মাঠ, কেমন ঝোপ আর বাবলা গাছ, গরু চরচে—ও কি ফুল ফুটেচে ওপারের ক্ষেতে বাবা?

যদুবাবু বললেন—ও ঝিঙের ফুল। বর্ষাকালে সন্দের সময় ঝিঙের ফুল ফোটে কিনা! সত্যি, ভারি সুন্দর সিনারিই বটে। ওগো. দ্যাখো ইদিকে এসে! কী ফাঁকা!

শ্যামলী বললে—তেতলার ঘরটা দেখে আসি চলো।

তেতলার ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু বড় বড় তিনটি জানালা তিনটি দেওয়ালে। রাঙা মাটির পালিশকরা মেঝে। দরাজ ছাদ, ছাদের ওপর থেকে বহুদূরব্যাপী মুক্ত মাঠের সবুজ বাণী এই আষাঢ় সন্ধ্যায় ওদের অন্তর স্পর্শ করলে। শ্যামলীর চোখে জল এলো। এ যে রূপকথার রাজবাড়ি তার কাছে, সে গরিব-ঘরের মেয়ে, গরিব-ঘরের বৌ, কলকাতার বাসায় অন্ধ-কূপে আজীবন কাটিয়ে আজ কি ভাগ্যে এমন বাড়িঘর নিজের মনে করবার অধিকার পেল। কানাই ইতিমধ্যে ছুটে

এসে বললে—বাঁধা ঘাট দেখে এলাম মা। একটু ভেঙে ভেঙে চটা উঠে গিয়েচে চাতালের। তবুও দিব্যি আরামে নাইতে পারবে। ওই তো—দেখা যাচ্চে—এই উঠোনটা পার হয়েই—

যদুবাবু বললেন—নাঃ, সাড়ে তিন হাজার টাকা নিক। জিনিসের মতো জিনিস! বাড়ির মতো বাড়ি! ছেলেপুলে নিয়ে দরাজ জায়গায় বাস করো। এই তো পাশেই গাঁয়ের কি পাড়া। ডাক দিলেই লোক পাবে। কোনো ভয় নেই। আমি এখানেই একটা কিছু করবো। এত লোকের চলচে আর আমার চলবে না? খুব চলবে। তোমরা দাঁড়াও, জিনিসপত্তর সব ওপরে নিয়ে আসি। কি কি গাছ আছে মুক্তোর মা?

মুক্তোর মা বললে—তিনটে আমগাছ আছে, সাতটা কাঁটাল গাছ, একটা পেয়ারা গাছ, একটা চালতে গাছ, একটা বিলাতি কুলগাছ, দু-ঝাড় কলাগাছ, চারটে নারকেল গাছ। বাবুরা নিজের হাতে সব লাগিয়েছিল, থাকবে বলে। শখ করে কলকেতা থেকে চারা এনে এই ও-বছর ওই দ্যাখো একটা চাঁপা-ফুলগাছ বসিয়ে গিয়েচে।

একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নামলো। শ্যামলীর দুঃখ হল, এখন আর কিছু দেখা যাবে না। নতুনতর জীবনযাত্রার পথে নতুনতর দেশের প্রতি-পথঘাট চিনে নেওয়া যেতো, ভাল করে দেখা যেতো আলোভরা দিনমানে।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বাললে। ডাকলে—মুক্তোর মা, ও মুক্তোর মা—

মুক্তোর মা মালপত্র গাড়ি থেকে নামিয়ে এনে দোতলায় তুলছিল। বললে—কি মা?

—জল আছে বাড়িতে?

—জল তুলে রেখেচি একটা বালতিতে, আর তো পাত্তর নেই মা, তাই তুলতে পারিনি—

—সেকথা বলচি নে, বাড়িতে জল আছে? কুয়োটুয়ো—

—বাঁধানো পাতকুয়ো আছে। নাওয়ার ঘর আছে, রান্নাঘরের পেছনে। চলুন, আমি দেখিয়ে দি। বাবুদের বাড়ি কোনো ত্রুটি ছিল না মা, আগাগোড়া সান-বাঁধানো। চৌবাচ্চা আছে বাঁধানো।

—তাতে জল তুলে রাখোনি?

—নাইবেন যদি তবে পাতকুয়োর জলে কেন মা? দিব্যি বাঁধানো নদীর ঘাট, অসাগর জল নদীতে। এখন জোয়ার এসেচে, সব পৈঠেগুলো ডুবে গিয়েচে। চলুন গা ধুয়ে আসবেন।

শ্যামলী নদীর ঘাটেই নাইতে গেল। ঘাটের ঠিক পাশে কি একটা বড় প্রাচীন

গাছ। তার ছায়া পড়েছে বাঁধা ঘাটের পৈঠাগুলোতে। কী একটা পুষ্পের সুবাস বাতাসে ভুরভুর করচে। এই গাছ থেকেই আসচে।

—কি ফুলের গন্ধ মুক্তোর মা?

—কী একটা লতা এই গাছে উঠেচে মা, কাল সকালে দেখবেন, সাদা সাদা ফুল ফুটেচে। ভারি বাস বেরোয় রাত্তিরি।

শ্যামলী জলে নামলো। আজ সে রূপকথার রাজকন্যে। স্নিগ্ধ জল, ওপারের দিক থেকে হাওয়া বইচে। সেই ফুলের সুগন্ধ। তারা ভরা আকাশ। এই বাঁধা ঘাট, এই প্রাচীন কি বনস্পতি, এই বনপুষ্প-সুবাস—সব তাদের নিজস্ব। তারা পয়সা দিয়ে কিনেচে। কলকাতায় সেই পচা ড্রেন, কলতলা, অভয়া, বিশ্বাস-গিন্নি সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে একদিনে। তাদের জন্যে সত্যিই কষ্ট হল। বেচারী মতির মা! বেচারী শশীবাবুর বৌ? ওদের একবার এখানে আনতে হবে। না, এও স্বপ্ন, এখনো যেন বিশ্বাস হয় না এতো সৌভাগ্য।

ডলি চেঁচিয়ে ডাকচে দোতলার বারান্দা থেকে—ওমা, শীগগির গা ধুয়ে এসো—বাবা চা চাইচে—এসো চট করে—

শ্যামলী স্বপ্নলোক থেকে নেমে এল। সাবানের বাক্সটা নেই। আনতে ভুলে গিয়েচে তাড়াতাড়িতে।

—মুক্তোর মা, ছুটে যাও, বড়দিদিকে বলগে যাও, ছোট তোরঙ্গের মধ্যে সাবানের বাক্সটা আছে, দিতে।

বিপদ

বাড়ি বসিয়া লিখিতেছিলাম। সকাল বেলাটায় কে আসিয়া ডাকিল—জ্যাঠামশাই?... একমনে লিখিতেছিলাম, একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম—কে?

বালিকা-কণ্ঠে কে বলিল—এই আমি, হাজু।

—হাজু? কে হাজু?

বাহিরে আসিলাম। একটি ষোলো-সতেরো বছরের, মলিন বস্ত্র পরনে মেয়ে একটি ছোট ছেলে কোলে দাঁড়াইয়া আছে। চিনিলাম না। গ্রামে অনেকদিন পরে নতুন আসিয়াছি, কত লোককে চিনি না। বলিলাম—কে তুমি?

মেয়েটি লাজুক সুরে বলিল—আমার বাবার নাম রামচরণ বোষ্টম।

এই বার চিনিলাম—রামচরণের সঙ্গে ছেলেবেলায় কড়ি খেলিতাম। সে আজ

বছর পাঁচ-ছয় হইল ইহলোকের মায়া কাটাইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছে সে-সংবাদও রাখি। কিন্তু তাহার সাংসারিক কোনো খবর রাখিতাম না। তাহার যে এতবড় মেয়ে আছে, তাহা এখনই জানিলাম।

বলিলাম—ও! তুমি রামচরণের মেয়ে? বিয়ে হয়েচে দেখচি। শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

—কালোপুর।

—বেশ বেশ। এটি খোকা বুঝি? বয়েস কত হল?

—এই দু-বছর।

—বেশ। বেঁচে থাক। যাও বাড়ির মধ্যে যাও।

—আপনার কাছে এইচি জ্যাঠামশাই। আপনি লোক রাখবেন?

—লোক? না, লোক তো আছে গয়লা-বৌ। আর লোকের দরকার নেই তো। কেন? থাকবে কে?

—আমিই থাকতাম। আপনার মাইনে লাগবে না, আমাদের দুটো খেতে দেবেন।

—কেন, তোমার শ্বশুর বাড়ি?

মেয়েটি কোনো জবাব দিল না। অত শত হাঙ্গামাতে আমার দরকার কি? লেখার দেরি হইয়া যাইতেছে। সোজাসুজি বলিলাম,—না, লোকের এখন দরকার নেই আমার।

তারপর মেয়েটি বাড়ির মধ্যে ঢুকিল এবং পরে শুনিলাম সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। চাল লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

মেয়েটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ একদিন দেখি, রায়েদের বাহিরের ঘরের পৈঠায় বসিয়া সেই মেয়েটি, হাউ-হাউ করিয়া এক টুকরা তরমুজ খাইতেছে। যেভাবে সে তরমুজের টুকরাটি ধরিয়া কামড় মারিতেছে, 'হাউ-হাউ' কথাটি সুষ্ঠুভাবে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ঐ কথাটাই আমার মনে আসিল। অতি মলিন বস্ত্র পরিধানে। ছেলেটি ওর সঙ্গে নাই। পাশে পৈঠার ওপরে দু-এক টুকরা পেঁপে ও একখণ্ড তালের গুড়ের পাটালি। অনুমানে বুঝিলাম, আজ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে রায়-বাড়ি কলসী-উৎসর্গ ছিল, এসব ফলমূল ভিক্ষা করিতে গিয়া প্রাপ্ত। কারণ মেয়েটির পায়ের কাছে একটা পোঁটলা এবং সম্ভবত তাহাতে ভিক্ষায় পাওয়া চাল।

সেদিন আমি কাহাকে যেন মেয়েটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি যায় না, কারণ সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ, দু-বেলা ভাত জোটে না। চালাইতে না পারিয়া মেয়েটির স্বামী উহাকে বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিয়াছে, লইয়া যাইবার নামও করে না। এদিকে বাপের বাড়ির অবস্থাও অতি খারাপ। রামচরণ

বোষ্টমের বিধবা স্ত্রী লোকের বাড়ি ঝি-বৃত্তি করিয়া দুটি অপোগণ্ড ছেলেমেয়েকে অতি কষ্টে লালন-পালন করে। মেয়েটি মায়ের ঘাড়ে পড়িয়া আছে আজ এক বছর। মা কোথা হইতে চালাইবে, কাজেই মেয়েটিকে নিজের পথ নিজেই দেখিতে হয়।

একদিন আমাদের বাড়ির ঝি গয়লা-বৌকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করাতে সে বলিল—হাজু নাকি আপনার বাড়ি থাকবে বলেছিল?

—হ্যাঁ। বলেছিল একদিন বটে।

—খবরদার বাবু, ওকে বাড়িতে জায়গা দেবেন না, ও চোর।

—চোর? কি রকম চোর!

—যা সামনে পাবে, তাই চুরি করবে। মুখুয্যে-বাড়ি রাখেনি ওকে, যা তা চুরি করে খায়, দুধ চুরি করে খায়, চাল চুরি করে নিয়ে যায়—আর বড্ড খাই-খাই—কেবল খাবো আর খাবো। ওর হাতির খোরাক যোগাতে না পেরে মুখুয্যেরা ছাড়িয়ে দিয়েচে। এখন পথে পথে বেড়ায়।

—ওর মা ওকে দেখে না?

—সে নিজে পায় না পেট চালাতি। ওকে বলেচে, আমি কনে পাবো? তুই নিজেরটা নিজে করে খা। তাই ও দোরে দোরে ঘোরে।

সেই হইতে মেয়েটির ওপর আমার দয়া হইল। যখনই বাড়ি আসিত, চাল, ডাল বা দু-চারিটা পয়সা দিতাম। বার-দুই দুপুরে ভাত খাইয়াও গিয়াছে আমার বাড়ি হইতে।

মাসখানেক পরে একদিন আমার বাড়ির সামনে হাউ-মাউ কান্না শুনিয়া বাহিরে গেলাম। দেখি, হাজু কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়ির দিকে আসিতেছে। ব্যাপার কি? শুনিলাম, মধু চক্রবর্তী নাকি তাহার আর কিছু রাখে নাই, তাহার হাতে একটা ঘটি ছিল, সেটিও কাড়িয়া রাখিয়া দিয়াছে—তাহাদের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, এই অপরাধে।

রাগ হইল। আমি গ্রামের একজন মাতব্বর, এবং পল্লিমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারি। তখনই মধু চক্রবর্তীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। মধু একখানা রাঙা গামছা কাঁধে হন্তদন্ত হইয়া আমার বাড়ি হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—মধু, তুমি একে মেরেচ?

—হ্যাঁ দাদা, এক ঘা মেরেচি ঠিকই। রাগ সামলাতে পারিনি, ও আস্ত চোর একটি। শুনুন আগে, আমাদের বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়েচে, গিয়ে উঠোনের লঙ্কাগাছ থেকে কোঁচড় ভরে কাঁচা পাকা ঝাল চুরি করেচে প্রায় পোয়াটাক। আর একদিন অমনি ভিক্ষে করতে এসে, দেখি বাইরের উঠোনের গাছ থেকে একটা পাকা পেঁপে ভাঙচে, সেদিন কিছু বলিনি—আজ আর রাগ সামলাতে পারিনি দাদা। মেরেচি এক

চড়, আপনার কাছে মিথ্যে বলব না।

—না, খুবই অন্যায় করেচ। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা, ওসব কি? ইতরের মতো কাণ্ড! ছিঃ—যাও, ওর কি নিয়ে রেখেচ ফেরত দাও গে যাও।

হাজুকেও বলিয়া দিলাম, সে যেন আর কোনোদিন মধু চক্রবর্তীর বাড়ি ভিক্ষা করিতে না যায়।

এই সময় আকাল শুরু হইয়া গেল। ধান-চাল বাজারে মেলে না, ভিখিরিকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া বন্ধ। এই সময় একদিন হাজুকে দেখিলাম ছেলে কোলে গোয়ালাপাড়ার রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিয়া নির্বোধের মতো চাহিয়া বলিল—এই যে জ্যাঠামশায়।... যেন মস্ত একটা সু-সংবাদ দিতে অনেকক্ষণ হইতেই আমাকে খুঁজিতেছে।

আমি একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম—কি?

—এই! আপনাদের বাড়িও যাবো।

—বেশ। আমাদের বাড়িতে প্রসাদ পাবি আজ—বুঝলি?

হাজু খুব খুশি। খাইতে পাইলে মেয়েটা খুব খুশি হয় জানি। কাঁঠালতলার ছায়ায় রোয়াকে সে যখন খাইতে বসিল, তখন দু-জনের ভাত তাহার একার পাতে। নিছক খাওয়ার মধ্যে যে কি আনন্দ থাকিতে পারে তাহা জানিতে হইলে হাজুর সেদিনকার খাওয়া দেখিতে হয়। স্ত্রীকে বলিয়া দিলাম—একটু মাছ-টাছ বেশি করে দিয়ে ওকে খাওয়াও...।

একদিন বোষ্টমপাড়ার হরিদাস বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের পাড়ার হাজু শ্বশুরবাড়ি যায় না কেন?

—ওকে নেয় না ওর স্বামী।

—কারণ?

—সে নানান কথা। ও নাকি মস্ত পেটুক, চুরি করে হাঁড়ি থেকে খায়। দুধের সর বসবার জো নেই কড়ায়, সব চুরি করে খাবে। তাই তাড়িয়ে দিয়েচে।

—এই শুধু দোষ? আর কিছু না?

—এই তো শুনিচি, আর তো কিছু শুনিনি। তারাও ভাল গেরস্ত না। তাহলে কি আর ঘরের বৌকে তাড়িয়ে দেয় খাওয়ার জন্যে? তারাও তেমনি।

কিছুদিন আর হাজুকে রাস্তাঘাটে দেখা যায় না। একদিন তাদের পাড়ার বোষ্টম-বৌ বলিল—শুনেচেন কাণ্ড?

—কি?

—সেই হাজু আমাদের পাড়ার, সে যে বনগাঁয়ে গিয়ে নাম লিখিয়েচে।

আমি দুঃখিত হইলাম। এদেশে নাম লেখানো বলে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাকে। হাজু অবশেষে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিল। খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় এমন কিছু, তবু দুঃখ হয় গ্রামের মেয়ে বলিয়া। এখানেই এ ব্যাপারের শেষ হইয়া যাইত হয়তো, কারণ গ্রামে সব সময়ে থাকিও না, থাকিলেও সকলের খবর সব সময় কানেও আসে না।

পঞ্চাশের মন্বন্তর চলিয়া গেল। পথের পাশে এখানে ওখানে আজও দু-একটা কঙ্কাল দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত বুভুক্ষু নিঃস্ব হতভাগ্যেরা পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এ জেলার মন্বন্তরের মূর্তি অত তীব্র ছিল না। যে দেশে ছিল, সে দেশ হইতে নিঃস্ব নরনারী এখানে আসিয়াছিল, আর ফিরিয়া যায় নাই।

পৌষ মাসের দিন। খুব শীত পড়িয়াছে। মহকুমার শহরে একটা পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গিয়েছি, ফিরিবার পথে একটা গলির মধ্যে দিয়া বাজারে আসিয়া উঠিব ভাবিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় কে ডাকিল—ও জ্যাঠামশায়!

বলিলাম—কে?

—এই যে, আমি।

আধ-অন্ধকার গলিপথে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। একটা চালাঘরের সামনে পথের ধারে একটি মেয়ে রঙিন কাপড় পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাপড়ের রং অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, আমি শুধু তাহার মুখের আবছায়া আদল ও হাত দুটি দেখিতে পাইলাম।

কাছে গিয়া বলিলাম—কে?

—বা-রে চিনতে পারলেন না? আমি হাজু।

হাজু বলিলেও আমার মনে পড়িল না কিছু। বলিলাম—কে হাজু?

সে হাসিয়া বলিল—আপনাদের গাঁয়ের। বা-রে, ভুলে গেলেন? আমার বাবার নাম রামচরণ বৈরাগী। আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি।

এমন সুরে সে শেষের কথাটি বলিল, যেন জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য সে গর্ব অনুভব করে। অর্থাৎ এত বড় শহরে নটী হইবার সৌভাগ্য কি কম কথা , না, যার তার ভাগ্যে তা ঘটে? গ্রামের লোক, দেখিয়া বুঝুক তার কৃতিত্বের বহর-খানা।

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই সে বলিল—আসুন না দয়া করে আমার ঘরে।

—না, এখন যেতে পারবে না। সময় নেই।

—কেন, কি করবেন?

—বাড়ি যাবো।

সে আবদারের সুরে বলিল—না। আসতেই হবে। পায়ের ধুলো দিতেই হবে আমার ঘরে। আসুন—

কি ভাবিয়া তাহার সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলাম তাহার ঘরে। নিচু রোয়াক খড়-ছাওয়া, রোয়াক পার হইয়া মাঝারি ধরনের একটি ঘর, ঘরে একখানা নিচু তক্তপোশের উপর সাজানো-গোছানো ফর্সা চাদর পাতা বিছানা। দেওয়ালে বিলিতি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ছবি দু-তিনখানা। মেমসাহেব অমুক সিগারেট টানিতেছে। একখানা ছোট জলচৌকির উপর খানকতক পিতল-কাঁসার বাসন রেড়ির তেলের প্রদীপের অল্প আলোয় ঝক্‌ঝক করিতেছে। মেঝেতে একটা পুরনো মাদুর পাতা। বোষ্টমের মেয়ে, একখানা কেষ্টঠাকুরের ছবিও দেওয়ালে টাঙানো দেখিলাম। ঘরের এক কোণে ডুগি-তবলা এক জোড়া, একটা হুঁকো, টিকে-তামাকের মালসা, আরও কি কি।

হাজু গর্বের স্বরে বলিল—এই দেখুন আমার ঘর—

—বাঃ, বেশ ঘর তো। কত ভাড়া দিতে হয়?

—সাড়ে সাত টাকা।

—বেশ।

হাজু একঘটি জল লইয়া আসিয়া বলিল—পা ধুয়ে নিন—

—কেন? পা ধোয়ার এখন কোনো দরকার দেখচি নে। আমি এখুনি চলে যাবো।

—একটু জল খেয়ে যেতে হবে কিন্তু এখানে জ্যাঠামশায়।

এখানে জলযোগ করিবার প্রবৃত্তি হয় কখনো? পতিতার ঘরদোর। গা ঘিন্ ঘিন করিয়া উঠিল। বলিলাম—না, এখন কিছু খাবো না। সময় নেই—

হাজু সে কথা গায়ে না মাখিয়া বলিল—তা হবে না। সে আমি শুনচি নে—কিছুতেই শুনবো না—বসুন—

তাহার পর সে উঠিয়া জলচৌকি হইতে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া আনিয়া সযত্নে সেটা আঁচল দিয়া মুছিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল—দেখুন, কিনিচি—আপনাকে চা করে খাওয়াবো এতে—চা করতে শিখিচি।

ড্রেসডেন চায়না নয়, অন্য কিছু নয়, সামান্য একটা পেয়ালা। হাজুর মনস্তুষ্টির জন্য বলিলাম—বেশ জিনিস, বাঃ—

ও উৎসাহ পাইয়া আমাকে ঘরের এ জিনিস ও জিনিস দেখাইতে আরম্ভ করিল। একখানা আয়না, একটা টুকনি ঘটি, একটা সুদৃশ্য কৌটা ইত্যাদি। এটা কেমন? ওটা কেমন? সে এসব কিনিয়াছে। তাহার খুশি ও আনন্দ দেখিয়া অতি তুচ্ছ জিনিসেরও প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম, ইহাকে এ পথে আসিবার

জন্য তিরস্কার করি এবং কিছু সদুপদেশ দিয়া জ্যাঠামশায়ের কর্তব্য সমাপ্ত করি। কিন্তু হাজুর খুশি দেখিয়া ওসব মুখে আসিল না।

যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহিতৈষী সাধু হইতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাইতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা-পিরিচে—যার বাবাও কোনোদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া, ছোট করিয়া, নিন্দা করিবার ভাষা আমার যোগাইল না।

সংকল্প ঠিক রাখা গেল না। হাজু চা করিয়া আনিল। আর একখানা কাঁসার মাজা রেকাবিতে স্থানীয় ভাল সন্দেশ ও পেঁপে কাটা। কত আগ্রহের সহিত সে আমার সামনে জলখাবারের রেকাবি রাখিল।

সত্যিই আমার গা ঘিন্ ঘিন করিতেছিল।

এমন জায়গায় বসিয়া কখনো খাই নাই। এমন বাড়িতে।

কিন্তু হাজুর আগ্রহভরা সরল মুখের দিকে চাহিয়া পাত্রে কিছু অবশিষ্ট রাখিলাম না। হাজু খুব খুশি হইয়াছে—তাহার মুখের ভাবে বুঝিলাম।

বলিল—কেমন চা করিচি জ্যাঠামশায়?

চা মোটেই ভালো হয় নাই—পাড়াগেঁয়ে চা, না গন্ধ, না আস্বাদ। বলিলাম—কোথাকার চা?

—এই বাজারের।

—তুই নিজে চা খাস?

—হুঁ, দুটি বেলা। চা না খেলে সকালে কোনো কাজ করতে পারি নে, জ্যাঠামশায়।

আমার হাসি পাইল। সেই হাজু!—

ছবিটি যেন সামনে আবার ফুটিয়া উঠিল। রায়বাড়ির বাহিরের ঘরের পৈঠার কাছে বসিয়া খোসাসুদ্ধ তরমুজের টুকরা হাউ-হাউ করিয়া চিবাইতেছে। সেই হাজু চা না হইলে নাকি কোনো কাজে হাত দিতে পারে না।

বলিলাম—তাহলে এখন উঠি হাজু। সন্দে উত্‌রে গেল। আবার অনেকখানি রাস্তা যাবো।

হাজুর দেখিলাম, এত শীঘ্র আমাকে যাইতে দিতে অনিচ্ছা। গ্রামের এ কেমন আছে, সে কেমন আছে, জিজ্ঞাসাবাদ করিল। বলিল—একটা কথা জ্যাঠামশায়,

মাকে পাঁচটা টাকা দেবো, আপনি নিয়ে যাবেন? লুকিয়ে দিতে হবে কিন্তু টাকাটা। পাড়ার লোকে না জানতে পারে। মার বড় কষ্ট। আমি মাসে মাসে যা পারি মাকে দিই। গত মাসে একখানা কাপড় পাঠিয়েছিলাম।

—কার হাত দিয়ে দিলি?

—বিনোদ গোয়ালা এসেছিল, তার হাত দিয়ে লুকিয়ে পাঠালাম।

—তোর ছেলেটা কোথায়?

—মার কাছেই আছে। ভাবচি, এখানে নিয়ে আসবো। সেখানে খেতে-পরতে পাচ্ছে না। এখানে খাওয়ার ভাবনা নেই জ্যাঠামশায়, দোকানের খাবার খেয়ে খেয়ে তো অচ্ছেদ্দা হল। সিঙ্গেড়া বলুন, কচুরি বলুন, নিমকি বলুন—তা খুব। এমন আলুর দম করে ওই বটতলার খোট্টা দোকানদার, অমন আলুর দম কখনো খাইনি। এই এত বড় বড় এক-একটা আলু—আর কত রকমের মসলা—আপনি আর একটু বসবেন? আমি গিয়ে আলুর দম আনবো? খেয়ে দেখবেন।

নাঃ, ইহার সরলতা দেখিয়াও হাসি পায়। রাগ হয় না ইহার উপর। বলিলাম—না, আমি এখন যাচ্ছি। আর ওই টাকাটা আমি নিয়ে যাবো না, তুমি মনিঅর্ডার করে পাঠালেও তো পারো। অন্য লোকে দেবে কি না দেবে—বিনোদ যে তোমার মাকে টাকা দিয়েচে কি না, তার ঠিক কি?

হাজুর এ-সন্দেহ মনে উঠে নাই এতদিন। বলিল—যা বলেচেন জ্যাঠামশাই, টাকাটা জিনিসটা তো এর ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই। মা পায় কি না-পায় তা কি জানি।

—এ পর্যন্ত কত টাকা দিয়েচ?

—তা কুড়ি-পঁচিশ টাকার বেশি। আমি কি হিসেব জানি জ্যাঠামশাই? মা কষ্ট পায়, আমার তা কি ভালো লাগে?

—কার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিস?

হাজু সলজ্জ মুখে চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম, আমাদের গ্রামের লোকজন ইহার নিকট যাতায়াত করে।

বলিলাম—আচ্ছা, দে সেই পাঁচটা টাকা।—চলি—

—আবার আসবেন জ্যাঠামশায়। বিদেশে থাকি, মাঝে মাঝে দেখেশুনে যাবেন এসে।

গ্রামে ফিরিয়া হাজুর মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া টাকা পাঁচটি তাহার হাতে দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কেউ তোমাকে কোনো টাকা দিয়েছিল?

হাজুর মা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কই, না! কে দেবে টাকা?

বিনোদ ঘোষের নাম করিতে পারিতাম। কিন্তু করিলে কথাটা জানাজানি হইয়া পড়িবে। বিনোদ ভাবিবে, আমারও ওখানে যাতায়াত আছে এবং হাজুর প্রণয়ীদের দলে আমিও ভিড়িয়া গিয়াছি এই বয়সে। কি গরজ আমার?

জন্মদিন

আজ সকালের দিনটাই যেন কি রকম।

যা-কিছু করবার ছিল, শেষ হয়ে গিয়েচে রায় বাহাদুরের, প্রথম যৌবনে যখন রাতুলপুর লালমোহন একাডেমির তিনি হেডমাস্টার—মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা মাত্র, তখন সেই রাতুলপুরের স্কুলে পায়া-ভাঙা চেয়ারে বসে সম্মুখস্থ নিবিড় বাঁশবনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কত কি দেখতে পেতেন সিনেমার ছবির মতো। দেখতেন, এ-দুঃখ থাকবে না, জীবন আসচে সামনে। সে-জীবনে কলকাতায়, তাঁর ভিলা হবে বালিগঞ্জে, মোটর থাকবে, কলিং-বেল টিপলে উর্দিপরা খানসামা ঘরে ঢুকবে। তখন ছিল স্বপ্ন, ছিল অপূর্ব রঙে রঙিন।

আজ তাঁর বয়েস একষট্টি। আজ একষট্টিতে পা দিলেন। লেক প্লেসের বাড়ির, নতুন বাড়ির তেতলায় যে ছোট ঘরটি তাঁর শোবার ঘর, সে ঘরে আজ ভোরে জেগে উঠে দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ পড়তেই রায় বাহাদুর দেখলেন আজ সাতাশে আষাঢ়, তেরোশো বাহান্ন সাল। একষট্টি বছরে পড়লেন তিনি আজ।

সকালটা কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন নয়। দিব্যি রোদ উঠেচে বাড়ির ছাদের মাথায়, সোঁদালি গাছগুলোর মগ-ডালে। মন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো, চা-পানের পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ছোট মেয়ে সুমিতা বলেছিল—বাবা, টোস্ট ভাজা হচ্চে, দু-খানা খেয়ে যাও চায়ের সঙ্গে—

—নাঃ। ও কি মাখন? আজকাল মাখন বলে যা বিক্রি হয় ও দিয়ে টোস্ট আমাদের ধাতে সয় না। তোরা খা—

বলে রায় বাহাদুর বেরিয়ে পড়েচেন।

খানিকটা এ-দিক ও-দিক ঘুরে রায় বাহাদুর লেকের ধারের বেঞ্চিতে এসে বসলেন। একখানা মিলিটারি বোট কিছু দূরে ভাসাতে চেষ্টা করচে। একখানা লরি নিকটের রাস্তায় স্টার্ট দেওয়ার প্রচেষ্টায় প্রচুর গ্যাস ও শব্দ ছাড়ছে। নাঃ, কোথাও যদি একটু শান্তি আছে!

একষট্টি হল তা'হলে। যখন তিনি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে, তখন মনে

আছে কারো বয়েস বত্রিশ কি চৌত্রিশ বছর শুনলে তাকে প্রৌঢ় বলে মনে হতো। চল্লিশ বছরের লোক তো ছিল বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য। আর এরই মধ্যে তাঁর একষট্টি বছর বয়েস হয়ে গেল? নিজেকে খুব বেশি বুড়ো বলে মনে করতে পারছেন না রায় বাহাদুর। সেদিনও তো ধর্মতলার চুল-কাটার সেলুনে বসে চুল ছাঁটিয়েছেন—কত দিন আর হবে? রায় বাহাদুর মনে মনে একটা মোটামুটি হিসেব করবার চেষ্টা করলেন। কাশী থেকে এসেচেন সে-বার। বেশ মনে আছে। লেস্‌লির বাড়িতে তাঁর শালাকে সে-বার চাকরি জুটিয়ে দিলেন গণেশ সরকারের সাহায্যে। গণেশ সরকার তাঁর সহপাঠী, দুজনে একসঙ্গে সে-কালের সিটি কলেজে পড়েছিলেন, গণেশ সরকার লেস্‌লির বাড়ি বড় চাকরি করতো—এখন অবসর নিয়েছে। গণেশেরও বয়েস, তা হল ষাট-একষট্টি। দু-এক বছর কম বা দু-এক বছর বেশি। ওতে কিছু যায় আসে না।

সেটা হবে ১৯২০ সাল, দেখতে দেখতে পঁচিশ বছর হয়ে গেল—নিতান্ত কমই বা কি? ভাবলে মনে হয়—সেদিনকার কথা। হিসেব করলে দেখা যায়, হাওড়ার পুলের তলা দিয়ে অনেক জল চলে গিয়েচে তার পর।

তবে ওই যা ভাবছিলেন রায় বাহাদুর। বয়েস হলে কি হবে, আর পাঁচজন বুড়োর মতো তিনি নন। এমন কি, পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছরের লোককে তিনি অনেক সময় বুড়ো বলে উল্লেখ করে থাকেন। নাতি ও ছেলেমেয়ের কাছে বলেন—সেই বুড়ো নাপিতটা আজ এসেছিল রে? নিজের চেয়ে দু-এক বছর কম বয়সের লোককে বলেন—আরো, একেবারে বুড়ে মেরে গেলে যে! ছ্যা ছ্যা—দাঁতগুলো সব খুইয়েচ দেখচি।

তাঁর দাঁত এখনো অটুট আছে। দাঁতেই নাকি যৌবন, তিনি মনে মনে ভাবেন এবং পাঁচজনকে বলেও বেড়ান। নিজের কাছে এই সত্যটা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে পার্কে নির্জনে বসে চানাচুর ডাল-বাদাম-ভাজা কিনেও খেয়ে থাকেন।

—এই, কি দিচ্ছিস্ ও? দুটো ডাল-ভাজা বেশি করে দিস। টাকার ভাঙানি নেই? ব্যাটারা সব ডাকাত। চার পয়সার ডাল-বাদাম নিলাম, বলে কি না টাকার ভাঙানি নেই! এই নে—যা—

বেশ জায়গা করেচে এই লেক। এই বেঞ্চিখানা বড় ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এখানে এসে বসেন। নির্জনে বসে থাকতে ও ভাবতে বেশ লাগে। বাড়িতে বড় গোলমাল, বসে ভাববার সময় নেই। ভাববার কথা অনেক কিন্তু বাইরের ঘরে ছেলে ও নাতিদের পড়ার মাস্টার এসে গিয়েচে এতক্ষণ—সুমিতার ঘরে সুমিতার বন্ধু অলকা ও ডাক্তারবাবুর নাতনি বেলা এসে গিয়েচে। অত গুজ্‌গুজ্ ফুস্‌ফুস্ কেন? সুমিতার মাথা বিগড়ে দেবে ওই ডাক্তারবাবুর ধিঙ্গী নাতনিটা। কমিউনিস্ট! সেদিন

কোথা থেকে এক গাদা ওই সব কমিউনিস্ট বই-পত্তর সুমিতার বিছানায়। আজকাল কি যে হচ্চে দেশে! ছেলেমেয়েদের মধ্যেও কি না ওই সব!

এই তো গেল বাইরের ঘরের কথা। যদি বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসবেন, তবে অমনি প্রতিবেশী বৃদ্ধ ভুবনবাবু এসে জুটবে।

এই যে রায় বাহাদুর। বসে আছেন নাকি? তামাক খাবেন না সকালবেলা। আজ কাগজ দেখেননি এখনো—ওকিনাওয়ার ব্যাপারটা দেখেচেন? ঘোল খাইয়ে ছাড়লে আমাদের বাবাজিদের। চা?... তা হয় হোক, আপত্তি নেই।

নয়তো অবিনাশ দালাল এসে বলবে—রায় বাহাদুর, কেমন আছেন? বেশ, ভালো ভালো। শুনে খুশি হলাম। আর আমাদের এখন—ইয়ে, একটা কথা। হরিশ মুখুয্যে রোডের বাড়িখানা একবার দেখবেন? আজই যেতে হয়। ওদের এটর্নিরা বড্ড প্রেস করচে। কাল আপনাকে ভাবলাম একবার ফোন করি। ক'টার সময় সুবিধে হবে? ওর চেয়ে ভালো আর পাবেন না—তবে বায়নার আগে রেজিস্ট্রি আপিসগুলো একবার সার্চ করতে হবে। সে আমি করিয়ে দেবো, আপনাকে কিছু করতে হবে না। চা? এত বেলায়—আচ্ছা, তা—চিনি কম দিয়ে, হ্যাঁ—

কিংবা আসবে গলির জীবন মুখুয্যে, ওর ভাইপোর একটা চাকরির জন্যে অনুরোধ করতে। তিনি যত বলেন, আজকাল তাঁর হাতে কিছু করবার নেই, চাকরি কোথা থেকে করে দেবেন—ততই তাঁকে আরও চেপে ধরে। বাড়ির ভেতরে যে থাকবেন, সেখানেও বিপদ কম নয়। গৃহিণীর নানা রকম তাগাদা ভাগনী-জামাইয়ের বাড়ি তত্ত্ব না পাঠালে নয়, ওপরের ঘরের পাখাখানা মেরামত করে দাও—নানা ফইজৎ।

তার চেয়ে এই বেশ আছেন।

পাশের বেঞ্চিতে একজন বৃদ্ধ লোক নাক টিপে বসে জপ কিংবা প্রাণায়াম করছে। ওদিকের বেঞ্চিতে একটি যুবক বসে লেকের জলের দিকে চেয়ে রয়েচে। এত সকালে আর কোথাও কোনো লোক নেই।

হ্যাঁ, যা ভাবছিলেন। জীবনটা যেন কি রকম হয়ে গেল। রাতুলপুরের সেই দিনগুলি এই সকালবেলার রোদের মতো স্বপ্নমাখা ছিল। এখন সে স্বপ্নের আবেশও স্মৃতি থেকে টেনে আনতে পারেন না। সেই রাতুলপুরের স্কুলের চটাওঠা দেওয়ালটা। নবীন নাপিত চাকর, ঘন্টা বাজাতো। তাঁর জন্যে টিফিনের সময় বাজার থেকে নিমকি রসগোল্লা এনে দিত। নবীনের ছেলেটি মারা গেল টাইফয়েডে, ফ্রি পড়তো স্কুলের নিচের ক্লাসে। তার জন্যে একদিন স্কুল বন্ধ হল। হেডমাস্টার ছিলেন গুরুচরণ সান্যাল। অনেক দিনের প্রবীণ শিক্ষক। তাঁকে বলতেন, আপনি হচ্চেন

ইয়ংম্যান, কেশববাবু, এ সব স্কুলে আপনার পোষাবে না। এ সব কাজ কাদের জানেন, যাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। যেমন ধরুন, আমাদের। এ বয়েসে কোথায় যাচ্চি বলুন!

বেরিয়েছিলেন রাতুলপুর স্কুল থেকে তার পরের বছরেই। ভবিষ্যতের সন্ধানে। ভবিষ্যৎ তাঁকে একেবারে প্রতারণা করেনি। অনেকের চেয়ে তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেচে। কিন্তু আজ মনে হচ্চে, সব দিয়েও ভবিষ্যৎ তাঁকে যেন কিছুই দেয়নি। তাঁর স্বপ্নকে কেড়ে নিয়েচে, আশাকে কেড়ে নিয়েচে, ফুরিয়ে গিয়েচেন তিনি, নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েচেন। যে ভবিষ্যৎ আজ অতীত, তাতে তিনি জেতেননি —ঠকেচেন।

আজ তাঁর বয়েস —থাক বয়েসের কথা। ওটা সব সময় মনে না করাই ভালো। বয়েসের কথা মনে না আনবার জন্যেই তিনি পার্কে বসা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর বাড়ির কাছে একটা পার্ক আছে, ছোট পার্কটাতে লেক-পাড়ায় পেন্‌সনপ্রাপ্ত জজ, সবজজ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বড় কেরানী প্রভৃতি বৃদ্ধের দল নিয়মিতভাবে বেড়াতে আসে। এ-বেঞ্চিতে ও-বেঞ্চিতে বসবে আর সামাজিক ও শারীরিক কথাবার্তা বলবে। অমুকের নাতনির বিয়ের কি হল, অমুকের নাতনি এবার ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেয়েচে। মেয়ে ছেড়ে ওরা নাতনিতে নেমেচে। নাতনি সম্বন্ধে এমন উচ্ছ্বসিত হবে, যেন কারো নাতনি কোনো দিন ম্যাট্রিক পাস করেনি। সব নাতনিই অসাধারণ, সাধারণ নাতনি একটাও চোখে পড়েনি। নাতনির প্রসঙ্গের পরে উঠবে বাতের প্রসঙ্গ, দাঁতের ব্যথার প্রসঙ্গ, রক্তের চাপের প্রসঙ্গ। যমদূত যেন দণ্ড উঁচিয়ে বসে আছে পার্কটার প্রত্যেক বেঞ্চিখানার ওপরে। সে আবহাওয়ায় বসলেই মনে হয় —

"এবার দিন ফুরুলো
সম্‌ঝে চলো
ইহকাল পরকাল হারিও না —"

কিংবা —"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"
কিংবা —"বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে
যাচ্চ তুমি শ্মশানঘাটে —"

ইত্যাদি।...

দিন-কতক গিয়ে তাই রায় বাহাদুর আর ওই সব ক্ষুদ্র সামাজিক পার্কে যান না, যেখানে বাত-ব্যাধিগ্রস্ত পেন্‌সনভোগী বৃদ্ধদের যাতায়াত। তার চেয়ে আসেন তিনি এই লেকের ধারে, শ্যামবনকুঞ্জ পাও রে! হরিদ্বর্ণ দ্বীপটি জলের একদিকে, কত সুগঠিত দেহ তরুণ, কত প্রণয়চপলা তরুণী কলেজের ছাত্রী আসে যায়। ওয়াকাইয়ের দল কলহাস্যে চটুলপদে বেড়ায় মাঝে মাঝে, ঠোঁটে রং, খানিকটা আঁটসাট পোশাক পরনে। না, এখানে লাগে ভালো। যৌবনের হাওয়া বয় সর্বদা।

তিনি এখনো বাঁচবেন অনেক দিন। হাত দেখিয়ে বেড়ান এখানে সেখানে রায় বাহাদুর, সেদিন কার্জন পার্কে এক উড়িয়া জ্যোতিষী তাঁকে বলেচে। তা ছাড়া এ তিনি জানতেন। তাঁর আয়ু যে প্রায় নব্বুইয়ের কান ঘেঁষে যাবে, জ্যোতিষী না বললেও তা তিনি জানেন।

আজ এত পয়সা রোজগার করেও, কলকাতায় এত বড় বাড়ি করেও, ভি-এইট ফোর্ড চালিয়েও মনে হচ্চে রাতুলপুরের সেই দিনগুলো চব্বিশ বছরের সতেজ যৌবন নিয়ে যদি আবার ফিরে আসতো...সেই বাঁশবনের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখা...ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজাতো নবীন নাপিত...কত নির্জনে বসে জীবনের ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা...

তখন ছিলেন গরিব স্কুল-মাস্টার, আজ তিনি বড়লোক। স্কুল-মাস্টারি ছেড়ে এক বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসা ধরলেন, ইনসিওরেন্সের কোম্পানি খুললেন নিজে, বড় আপিস হল, ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হতে লাগলো। দেশহিতকর কাজও দু-চারটা যে না করেচেন এমন নয়, পয়সা যথেষ্ট হয়েচে। ছেলেরা বলে —ভালো গাড়ি কিনুন বাবা। একখানা মার্সেডিজ বেন্‌জ দেখে এলাম কাল —খরগোশের মতো নিঃশব্দে চলে —কি ফোর্ড গাড়িতে চড়বেন চিরদিন!

যুদ্ধের আগেকার কথা অবিশ্যি। তেলের অভাব ছিল কি?

কিছু ক্যালকাটা প্রপার্টিজও করলেন, যার জন্যে কলকাতার বড়লোকেরা হাঁ করে থাকে। বাড়ি বিক্রি থাকলেই রায় বাহাদুর কিনবেন। এটর্নির আপিসে গিয়ে হয়তো জানা গেল বাড়ি থার্ড মর্টগেজ। প্রথম দুই বন্ধকীখতের টাকা শোধ দিয়েও বাড়ি কিনেচেন, জেদের বশবর্তী হয়ে। দিনকতক জমি কেনাবেচা আরম্ভ করলেন। এই লেক অঞ্চলে, বালিগঞ্জ স্টোর রোড, গড়িয়াহাট অঞ্চলে অনেক বাড়ি তাঁর জমির ওপরে। এসব কাজে ঠকেচেনও অনেক, দায়শূন্য ভেবে যে সম্পত্তিতে হাত দিয়েচেন, রেজেস্ট্রি আপিস অনুসন্ধান করে দেখা গেল তার অবস্থা কাহিল। মানুষকে বিশ্বাস করা যে কত বিপজ্জনক?

আজ সব করেও তিনি ফুরিয়ে গিয়েচেন। বড় ছেলে আপিসে বেরোয়। ভালো কাজ বোঝে, তাঁর অভাব কেউ অনুভব করে না আপিসে, ঘরেও না। মেয়ে-ছেলেরা এখন মালিক হয়েচে, নিজেরাই ব্যবস্থা করে, তাঁকে জিজ্ঞেসও করে না অনেক সময়। কেবল গিন্নি এখনো পুরানো দিনের সুর বজায় রেখেচেন, তাঁকে না হুকুম করলে গিন্নির চলে না। মুখনাড়া মুখঝাড়া সব তাঁরই ওপরে। আসলে পুত্রবধূদের প্রতাপে তিনিও প্রায় অর্ধ বাতিল। সুন্দরী বড় পুত্রবধূটির দাপট সবচেয়ে বেশি, কলেজে-পড়া মেয়ে, মুখের কাছে কেউ এগোতে পারে না, মুখের সৌন্দর্যে ত্রিভুবন জয়

করতে পারে। বাড়ির ঝি-চাকর তার কথায় মরে বাঁচে। বুড়ো-বুড়িকে বড় কেউ একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

তাই তো বলচেন, তিনি ফুরিয়ে গিয়েচেন। একষট্টি বছরেই ফুরিয়ে গেলেন।

আজ গাড়ির পঞ্চম চক্রের মতোই তিনি অনাবশ্যক। ওই রাতুলপুরে তিনি প্রথম প্রেমে পড়েন। পুরুতগিরি করতেন বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, তাঁর মেয়ে, নাম নিরুপমা। শহরের তুলনায়—তাঁর বড় পুত্রবধূ প্রতিমার তুলনায় হয়তো নিরুপমা তত কিছু ছিল না, তবুও যে সুন্দরী ছিল, মুখশ্রী কিন্তু চমৎকার। বাড়িতে আর কেউ থাকতো না পুরুত ঠাকুরের, নিরুপমার সঙ্গে বুড়ো জলপাইগাছের তলায় দুপুরের ছায়ায় লুকিয়ে দেখা হত মাঝে মাঝে। ষোলো বছরের সুশ্রী কিশোরী।

একদিন নিরুপমা দুটি পাকা আতা দুহাতে নিয়ে এসেছিল।

হেসে বললে —তুমি আতা খাও?

—কেন খাবো না?

—এই নাও। আমাদের গাছের আতা।

—শুধু আতা দিলে আতা নেবো না —

নিরুপমা চোখ বড় বড় করে বললে —তবে কি?

—আর কিছু দিতে হবে ঐ সঙ্গে —

—কি?

—এই দেখিয়ে দিচ্ছি কি —সরে এসো —

—ধ্যেৎ —ভারি দুষ্টু তো!...

হাত ছাড়িয়ে নিরুপমা ছুটে পালিয়ে গেল হরিণীর মতো চটুল গতিতে।...আর এক দিন।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী সেদিন তাঁর মায়ের তিথি উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজনে গ্রাম্য মাস্টারটিকেও নিমন্ত্রণ করেচেন। খেতে বসেচেন ভাবী রায় বাহাদুর। পরিবেশন করচে নিরুপমা, আরও পাঁচ-ছ জন ব্রাহ্মণ একত্র খেতে বসেচে। হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে দেখলেন নিরুপমা ঘরের মধ্যে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। উনি ঈষৎ হেসে ফেলতেই নিরুপমাও মৃদু হেসে জানলা থেকে সরে গেল।

কালকের কথা বলেই মনে হচ্ছে।

অথচ কত কাল হয়ে গেল —চল্লিশ বছর!

আজও চোখ বুজলে নিরুপমার সে সলজ্জ দুষ্টুমির হাসি তিনি দেখতে পান। এক-আধ দিন নয়, এ রকম কত ঘটনা ঘটেছিল এক বছর ধরে। নিরুপমার সঙ্গে

তাঁর বিবাহের প্রস্তাবও হয়েছিল। বিবাহ হয়েও যেতো কিন্তু গ্রামের বিধুভূষণ মজুমদার এক সামাজিক জোট পাকালেন। রায় বাহাদুর কিশোরকুণি থাকের ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের রাজারা যে বংশের। তখনকার আমলে কিশোরকুণি থাকের পাত্রকে কুলীনেরা কন্যাদান করতেন না। সেকালে এমনিই ছিল। বিবাহ ভেঙে গেল। রায় বাহাদুর বিদেশি লোক, কেউ তাঁকে খবর দেওয়ার ছিল না। বিবাহের দিন নিরুপমা কেঁদেছিল, না, কাঁদেনি?

শুধু এই সংবাদটা পাবার জন্যে রায় বাহাদুর কত চেষ্টা করেচেন, কেউ এ সংবাদ তাঁকে দিতে পারেনি। আর কখনো নিরুপমার সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়নি।

কেই বা তাঁকে সংবাদ এনে দেবে?

এই ঘটনার কিছু দিন পরে রায় বাহাদুর সে গ্রাম ত্যাগ করে আসেন। আর যাননি কোনোদিন। জীবনের প্রথম প্রেম, সে সব দিনের কথা ভাবলেও হারানো যৌবন আবার ফিরে আসে যেন।

ওখান থেকে চলে আসবার পর তিনি কতবার ভেবেচেন, নিরু আজ কেথায় আছে? কেমন আছে? তাঁর জন্য নিরু কি ভেবেছিল?

এ সংবাদ তাঁকে আর কেউ দেয়নি। বিবাহ করেছিলেন বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে। কিন্তু নিরুকে ভোলেননি কোনোদিন। প্রথম প্রথম খুবই ভাবতেন, মধ্যে দশ-বিশ বছর আর তেমন ভাবতেন না, অর্থ উপার্জনের নেশায় ভুলে ছিলেন। এখন আবার মাঝে মাঝে মনে হয়।

একটি তরুণ যুবক এসে কিছু দূরে একটা নারকোল গাছের তলায় দাঁড়ালো। এ-দিকে ও-দিকে চেয়ে যেন সে কাউকে খুঁজচে। রায় বাহাদুর সচকিত হয়ে উঠলেন। ছোকরা নিশ্চয়ই ওর প্রেমিকার সন্ধানে এসেচে। তাঁর ছোট ছেলে অমিয়জীবনের বয়সী। আজকাল অমনি হয়েচে যে। তাঁদের সময়ে কিছুই ছিল না। তরুণী অভিসারিকাদের পক্ষে স্বর্ণযুগ চলেচে এটা। কই, ছোকরা একা বসে আছে উদ্‌ভ্রান্তভাবে, তিনি কই? মানে, মা-লক্ষ্মীটি? এখনো আসেন না কেন?

আজ রায় বাহাদুরের ইচ্ছে হল রাতুলপুরে যাবেন। একবার গিয়ে দেখে আসবেন। তাঁর মনে হচ্ছে, চল্লিশ বছর যেন কেটে যায়নি, যেন তিনি নব্য যুবকই আছেন, ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ আছে তাঁর, যেন তিনি ব্লাডপ্রেসারে ভুগচেন না আজ দুবছর, যেন তাঁর বাত হয়নি। সে-বার আশ্বিন মাসে এই বাতে কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন না —যেন রাতুলপুরের আম শিমূল জাম কাঁঠালের ঘন ছায়ানিকুঞ্জে চিরযৌবনা নিরুপমা আজও কিশোরী, তাঁরই আশায় পথ চেয়ে বসে আছে।

গাছতলার সেই যুবকটি কিছু দূরে একটা বেঞ্চির ওপর হতাশভাবে বসে পড়েচে।

বেচারী!

সেই রাত্রেই রায় বাহাদুর মনে মনে ঠিক করে ফেললেন। তিনি রাতুলপুরে যাবেনই। কাল সকালে উঠেই যাবেন। ছোট মেয়ে সুমিতা এসে বললে —বাবা, রাত্রে কি খাবে? বৌদিদি বলে পাঠালেন —

রায় বাহাদুর মুখ খিঁচিয়ে বললেন —কেন, তিনি কি জানেন না আমি রাতে কী খাই? যাও পর্দাটা তুলে দাও —

সুমিতা মুখের অপূর্ব ভঙ্গি করে চলে গেল। রায় বাহাদুরের দোতলায় দক্ষিণমুখী বসবার ঘর। সামনের দেওয়ালে সবই জানালা। সুমিতা জানালার পর্দা তুলে দিয়ে চলে গেল। পুরু গদি-আঁটা গিল্টি-কৌচে বসে শেড দেওয়া লম্বা বাল্বের আলোতে রায় বাহাদুর অন্যমনস্কভাবে একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। এসব পত্রিকা-টত্রিকা এনেচে মেয়ে বা বৌমারা, তিনি এসব পড়েন না।

বড় পুত্রবধূ প্রতিমা রূপের হিল্লোল তুলে ঘরে ঢুকে বললে —আমায় ডেকেচেন?

—হ্যাঁ। আমি কি খাবো জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েচ কেন? আমি কি খাই?

প্রতিমা জানে শ্বশুর বৃদ্ধ হয়ে ইদানিং খিট্‌খিটে হয়ে পড়েচেন। সে সান্ত্বনার সুরে বললে —না, সে জন্যে না। আপনি দুদিন কিছু খাচ্ছেন না রাত্রে, বলেন সাবু করে দাও। তা আজও কি সাবু খাবেন, না লুচি খানকতক গরম গরম করে আনবো। ভাল মাগুর মাছ আছে কি না, তাই বলে পাঠালুম —

—মাগুর মাছের কথা কেউ আমাকে তো বলেনি। সবাই হয়েচে —

—তা হলে দুখানা লুচিই আনিগে ভেজে।

—হ্যাঁ, রাত তিনটে করো —

—দশ মিনিটের মধ্যে আনচি বাবা।

না, এ সংসারে সুখ নেই। তাঁর মুখের দিকে কেউ তাকায় না।

গিন্নি কি এতই ব্যস্ত যে, একবার এসে তাঁর খাওয়ার খোঁজ নিতে পারেন না? আজ যদি —

প্রতিমা একটু পরেই রুপোর থালায় লুচি সাজিয়ে ও একটা খুরো বসানো ছোট রুপোর বাটিতে মাছের ঝোল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। রায় বাহাদুর বললেন —তোমার শাশুড়ী কি করচেন?

প্রতিমা সুললিত ভঙ্গিতে আঁচল সামলে নিয়ে বললে —মা ঠাকুরঘর থেকে বেরোননি তো!

—বেশ, বেরুতে হবে না।

—বসুন, জল নিয়ে আসি বাবা, টেবিলেই খাবেন তো?

রায় বাহাদুর বিরক্তির সঙ্গে বললেন —রেডিওটা সর্বদা ঝং ঝং করলে আমার মাথা ধরে যায়। কে খুলেচে রেডিও? ছোট বৌমা বুঝি? বন্ধ করে দাও —ও নাকী-সুরে গান সর্বদা বরদাস্ত করতে পারিনে —

রাতুলপুরেই যাবেন তিনি। অসহ্য হয়ে উঠেচে এ সংসার। শান্তি বলে জিনিস নেই এখানে। একবার গিয়ে ঘুরে আসবেন প্রথম যৌবনের শত মধুস্মৃতিমাখা গ্রামটিতে। হয়তো নিরুপমার সঙ্গে দেখা হয়েও যেতে পারে —অন্তত সেই সব জায়গাতেও আবার গেলে জীবনের একঘেয়েমিটা কেটে যাবে।

মাথা ধরেচে বেজায়। শুধু ওই রেডিওটার জন্যে। কতবার তিনি বারণ করেচেন —কিন্তু এ বাড়িতে তাঁর কথা কেউ আমলে আনে? সাধে কি তিনি —শরীর কেমন ঝিম্ ঝিম করচে।

মধ্য-রাত্রে বড় পুত্রবধূ প্রতিমার ছোট খোকাটি জেগে মায়ের ঘুম ভাঙালো। প্রতিমা উৎকর্ণ হয়ে শুনলো দোতলায় শ্বশুরের ঘর থেকে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গোঙানির শব্দ আসচে। সে তখুনি নিচে এসে সকলের ঘুম ভাঙালো। রায় বাহাদুর বিছানায় গুটি-শুটি হয়ে অস্বাভাবিকভাবে শুয়ে আছেন, তাঁর মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বার হচ্চে। বড় ছেলে বাড়ি নেই। খুব হৈ-চৈ উঠলো। সবাই ঝুঁকে পড়লো বিছানার ওপরে, বড় মেয়েকে আনতে মোটর ছুটলো বাগবাজারে। ঝি, চাকর, মেয়ের দল, পুত্রবধূর দল, নাতি-নাতনিরা মিলে লোকে লোকারণ্য ঘরের ভেতর। রায় বাহাদুর কি একটা বলচেন অস্পষ্ট গোঙানির মধ্যে —কেউ বুঝতে পারচে না। প্রতিমা কান পেতে ভালো করে শুনে বললে —নিরু কে? নিরু কার নাম? নিরু নিরু করে যেন কি বলচেন।

ডাক্তার এসে বললে, স্ট্রোক হয়েচে। সেবাশুশ্রূষা চললো, বড় ছেলেকে টেলিগ্রাম করা হল রংপুরে। সেখানে সে যুদ্ধের বড় কনট্রাক্টারির কাজে গিয়েচে। ট্রাঙ্ক-কল্ করা গেল মেজ ছেলেকে ঝরিয়ার কয়লাখনিতে।

সেদিন বেলা বারোটার আগে রায় বাহাদুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

দ্রবময়ীর কাশীবাস

দুদিন থেকে জিনিসপত্র গুছনো চললো। পাড়ার মধ্যে আছে মাত্র তিনঘর প্রাতিবেশী

—কারো সঙ্গে কারো কথাবার্তা নেই। পাড়ার চারিধারে বন-জঙ্গল, পিটুলিগাছ, তেঁতুলগাছ, বাঁশঝাড়, বহু পুরনো আম-কাঁঠালের বাগান। দ্রব ঠাকরুনের বাড়ির চারিধার বনে বনে নিবিড়, সূর্যের আলো কস্মিন্‌কালে ঢোকে না, তার ওপর বাড়ির সামনে একটা ডোবা, বর্ষার জলে টইটম্বুর, দিনরাত, 'যাঁওকো' 'যাঁওকো' ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক, দিনে রাতে মশার বিনবিনুনি।

দ্রব ঠাকরুনের নাতি বললে —ঠাক্‌মা সাবু আছে ঘরে, না বাজার থেকে আনবো?

দ্রব ঠাকরুনের কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ শোনাল, কারণ আজ দু-মাস কাল তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন। পালাজ্বর, ঘড়ির কাঁটার নিয়মে তা আসবে একদিন অন্তর-অন্তর ঠিক বিকেল বেলাটিতে। দ্রব ঠাকরুন পুরনো কাঁথা-লেপ চাপা দিয়ে পড়বেন, উঃ আঃ করবেন—জ্বরের ধমকে ভুল বলবেন।

ও বাড়ির ন-ঠাকরুন এসে জিজ্ঞেস করবেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে —বলি ও দিদি, অমন করচ কেন? জ্বর এল নাকি?

—আর ন-বৌ। মলেই বাঁচি। নিত্যি জ্বর নিত্যি জ্বর —ওরে মা রে, হাত-পা কি কামড়ানটা কামড়াচ্চে!...একটু উঠে-হেঁটে বেড়াতে দেবে না —এ কি কাণ্ড, হ্যাঁ গা?

পরে মিনতির সুরে বলবেন —ও ন-বৌ, লক্ষ্মী দিদি, শীত তো আজ ভাঙলো না, কাঁথা গায়ে দিইচি, নেপ গায়ে দিইচি —তুমি ওই বাঁশের আল্‌নায় পুরনো তোশকটা পেড়ে আমার গায়ে যদি দিয়ে দ্যাও —

—চেপে ধরবে, হ্যাঁ দিদি?

—ধ-রো —ন-বৌ —চেপে ধ-রো —আমার হ-য়ে গেল!

—ভয় কি, অমন করো না, ছিঃ! টেবু আসবে চিঠি পেলেই, কানু আসবে, বিন্দে আসবে —তোমার নাতিরা বেঁচে থাক্, অমন সোনার চাঁদ নাতি সব, ভাবনা কি তোমার দিদি?

—কে-উ —আ-মা-কে —দে-খে-না —ন-বৌ —

—কেন দেখবে না দিদি — সবাই দেখবে। তুমি বেশি বোকো না, চুপটি করে শুয়ে থাকো —

—আমার গো-রু! গো-রু উ-ত্ত-র মা-ঠে —

—কোথায় গোরু দিয়ে এসেছিলে?

—জ-টে-গ-য়-লা-র অ-ড়-ল ক্ষে-তে-র পাশে —

—আচ্ছা আমি এনে দেবো এখন গোরু। আমারও গোরু রয়েচে জটে গোয়ালার জমির কাছেই। তুমি শুয়ে থাকো।

আরও ঘন্টা খানেক পরে বৃদ্ধা ন-ঠাকরুন আবার এসে জানালায় দাঁড়িয়ে বললেন

—কম্প থেমেচে দিদি?

ক্ষীণস্বরে লেপ-কাঁথার ছেঁড়া স্তূপের মধ্যে থেকে জবাব এল —গোরু! আমার গোরু তো —

—কোনো ভয় নেই। সে আমি এনেচি। কম্প থেমেচে?

—হুঁ।

সারা বর্ষা দ্রবময়ী এমনি ম্যালেরিয়ায় ভোগেন। তাঁর বড় নাতি শ্রীশচন্দ্র ওরফে টেবু কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়, মেজ নাতি পাক্‌শীতে ই, বি, আর-এ ছোট নাতিও ওদিকে যেন কোথায় থাকে। বড় নাতি ছাড়া অন্য দুটি অবিবাহিত, বড় নাতির আবার একটি ছেলেও হয়েচে। আজ বছর পাঁচ-ছয় আগে বড় নাতি ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ি এসে দিন-সাতেক ছিল। নাতবৌ মনোরমা হুগলী জেলার মেয়ে, সে এখানে এসে নাক সিঁটকে থাকে, 'বাড়ি তো ভারি, মোটে একখানা চালাঘর, ছেঁচার বেড়া, এমনিধারা জঙ্গল যে, দিনমানেই বুনো শূকর লুকিয়ে থাকে —মশার তো ঝাঁক। মাগো, কী কাদা ঘাটের পথে! এখেনে কি মানুষ থাকে নাকি?' মনোরমার খাঁরার মতো নাক আরও উঁচু ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সাতদিন পরে দ্রবময়ীকে নাতির ছেলে খোকনমণির মায়া কাটাতে হয়। তাঁর চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

ন-ঠাকরুনকে বলেন —সুদের সুদ, ও যে কি মিষ্টি তা তোমাকে কি বোঝাবো ন-বৌ—

দ্রবময়ীর আকুল ক্রন্দনের মধ্যে যে কত কালের পিপাসিত প্রতীক্ষা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিষ্পলকে চেয়ে আছে, স্বামীহীনা বন্ধ্যা বিধবা ন-ঠাকরুন তা বুঝতে না পেরে কেমন অবাক হয়ে যান, হয়তো বা ভাবেন —দিদির সবই বাড়াবাড়ি!

ন-ঠাকরুন আপনার জন কেউ নয় —পাড়ার পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনী মাত্র। বছরের মধ্যে গড়ে তিন-চার মাস দুই বৃদ্ধার মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়, মুখ দেখাদেখি থাকে না —তবুও ঝগড়া কেটে গেল। পাড়ার মধ্যে একমাত্র ন-ঠাকরুনই দ্রবময়ীকে দেখাশুনা করেন সবচেয়ে বেশি, জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে তাঁর গোরুটাও নিজের গোরু দুটোর সঙ্গে মাঠে বেঁধে দিয়ে আসেন, একটু সাবু হয়তো করে নিয়ে আসেন, অন্তত জানালায় উঁকি মেরে দুএকটা কথাও বলেন।

কিন্তু এবার দ্রবময়ী যেন ভুগচেন একটু বেশি।

আষাঢ় মাসের প্রথম থেকে জ্বর শুরু হয়েচে, মাঝে মাঝে প্রায়ই ভোগেন। শরীর দুর্বল হয়ে পড়েচে —ঘোর অরুচি তার ওপর। পালাজ্বরে ধরেচে আজ মাসখানেক।

সন্ধ্যার দিকে দ্রবময়ী লেপ তোশক ফেলে ঝেড়ে উঠলেন। পালাজ্বরের কম্প

থেমে গিয়েচে। জ্বর যদিও এখনো যায়নি —মুখ তেতো, মাথা ভার, শরীর ঝিম্ ঝিম করচে।

ডাক দিলেন —ও ন-বৌ, গোরু এনেচ দিদি?

দু-তিনবার ডাকের পর ন-ঠাকরুন উত্তর দিলেন —কে ডাকে? দিদি? ঠেলে উঠেচ?

—বলি, আমার গোরুডা কি এনেচ মাঠ থেকে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোরু গোরু করেই ম'লে শেষকালডা! জ্বর ছেড়েচে?

—ছেড়েচে —ছেড়েচে। বলি গোরু কোথায় বেঁধে রাখলে?

—গোয়ালে গো গোয়ালে —ক্ষেপলে যে গোরু গোরু করে —

কেরোসিন তেল একটা টেমিতে একটুখানি ছিল, দ্রব ঠাকরুন টেমিটা জ্বালালেন। আমড়াগাছে একটা তেড়ো পাখি আর একটা তেড়ো পাখির সঙ্গে কথাবার্তা কইচে। দ্রব ঠাকরুনের জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে মনে হ'ল পাখি দুটো বলচে :—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি —

দ্বিতীয়। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ —

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি —

দ্বিতীয়। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ —

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি —

দ্রব ঠাকরুন বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কী একঘেয়ে আওয়াজ রে বাপু! চালাচ্চে তো চালাচ্চেই, আধঘন্টা হয়ে গেল —একে মাথা ধরে আছে, ভালো লাগে? থাম্ না বাপু। মানুষে জানোয়ারে সবাই মিলে পেছনে লাগলে কি করে বাঁচি —

গোহালে গিয়ে দ্রব ঠাকরুন মুংলি গোরুকে দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করলেন। মুংলি না খেলে তাঁর খাওয়া হয় না, এই বনজঙ্গলে ঘেরা নির্জন স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছেন, সবাই ছেড়ে গিয়েচে তাঁকে, কতক স্বর্গে কতক বা বিদেশে। তাঁর দুই ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি নাতনী —একঘর, বড় গেরস্ত, যদি সবাই থাকতো আজ বজায়।

কেউ নেই আজ। মুংলিকে নিয়ে তিনি একা পড়ে আছেন গোপীনাথপুরের ভিটেতে। তাই গোরুটাকে অত ভালবাসেন, মাঠে বেঁধে দিয়ে বার বার করে দেখে আসেন, নদীতে জল খাওয়াতে নিয়ে যান।

সকালে উঠে দ্রব ঠাকরুনের মনে হল খিদের চোটে তিনি দাঁড়াতে পারচেন না। বাড়ির পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ডুমুরগাছ থেকে ডুমুর পেড়ে আনলেন, দুটো সজনেশাক পাড়লেন উঠোনের গাছ থেকে। ঘাটের পথে মুখুজ্যে গিন্নির সঙ্গে দেখা। মুখুজ্যে গিন্নির ছেলেকটি লেখাপড়া শেখেনি, গাঁজা খেয়ে বেড়ায় —দ্রব ঠাকরুনের

নাতি ক'টি চাকুরে, এজন্য দ্রব ঠাকরুনের প্রতি তাঁর অন্তরে অন্তরে হিংসে বেশ।

জিজ্ঞেস করলেন —জ্বর হয়েছিল না কি শুনলাম খুড়ীমার?

—হ্যাঁ মা, আজ দুটো ভাত রাঁধবো। তাই সকাল সকাল ঘাটে যাচ্চি —

—আর মা, তোমার থাকতেও নেই —অমন সব নাতি নাতনী থাকতেও তোমার এই দুর্দশা —সবই কপাল!

অর্থাৎ, দুই চাকুরে নাতি আছে বলে তোমার গুমর করবার কিছু নেই। তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

নদীর ঘাটে যাবার পথে দুধারে শুধু বন আর বাগান। কোনো বাগানে বেড়া দেওয়া নেই, ঘন আশসেওড়া ও বনচালতে গাছের ডালপালা স্নানার্থীদের গায়ে লাগে বলে দু-একজন শুচিবাইগ্রস্তা বিধবা পথের নিতান্ত পাশের ডালগুলো হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে রেখেচেন। দ্রব ঠাকরুন বনের মধ্যে ঢুকে উঁকি মেরে কি দেখচেন, এমন সময় মুখুজ্যেদের সেজ বৌ পেছন থেকে বললে —কি দেখছেন, ও খুড়ীমা?

—এই খয়েরখাগী কাঁঠালগাছটাতে কাঁঠাল আছে কি না এক-আধটা মা —একটা গাছ কাঁঠাল, সর্বনেশেদের জন্যে যদি মা তার কিছু ঘরে উঠলো —নিজে থাকি অসুখে পড়ে —

—কে কাঁঠাল নিলে খুড়ীমা?

—কে নিয়েচে আমি কি চৌকি দিতে গিয়েচি বসে বসে? এই পাড়ার মধ্যেই চোরের ঝাড় —দ্যাখ তোর, না-দ্যাখ মোর। সব্বনেশে কলিকালে কি ধম্মোজ্ঞান আছে মা?

—চলুন খুড়ীমা, ঘাটে যাই —

দ্রব ঠাকরুন বকতে বকতে ঘাটের দিকে চলেন। স্নান সেরে এসে দুটো আলো-চাল ফুটিয়ে ডুমুরের চচ্চড়ি করে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসেচেন, এমন সময় দেখলেন বাড়ির পেছনে কাগজী লেবু গাছটার তলায় কি খস্ খস শব্দ হচ্চে।

দ্রব ঠাকরুন হাঁক দিলেন —কে রে নেবুতলায়?

ক্ষীণ বালিকাকণ্ঠে উত্তর এল —এই আমি কনক, ঠাকুমা —

—কেন, ওখানে কি শুনি? কি হচ্চে ওখানে? বের হয়ে আয় ইদিকে, সামনে আয়।

একটি ম্যালেরিয়াশীর্ণ দশ-এগারো বছরের বালিকামূর্তি অকুণ্ঠপদবিক্ষেপে লেবু-ঝোপের আড়াল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উঠোনে এসে দ্রব ঠাকরুনের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়ালো।

—এই আমার মার মুখে অরুচি—কিছু খেতে পারে না, তাই গিয়ে বললে —যা তোর ঠাকুরমার নেবুগাছ থেকে একটা নেবু—

দ্রব ঠাকরুন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন —হ্যাঁ, যা —তোর বাবা নেবুগাছ পুঁতে রেখে গিয়েচে, যা তুলে নিয়ে আয় গিয়ে! যত সব চোর-ছ্যাচড় নিয়ে হয়েচে —তোর মার অরুচি, তা হাটে নেবু কিনতে পারিসনে? এখানে কি? তোর বাবার গাছ আছে —এখানে?

বালিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দ্রব ঠাকরুন আপন মনে বকে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বালিকা ভয়ে ভয়ে বললে —ও ঠাকুরমা —

—কি রে? কি?

—আমি চলে যাব?

—কেন, তোকে কি বেঁধে রেখেচি নাকি? যা —

—নেবু দেবেন না?

দ্রব ঠাকরুন চুপ করে আপনমনে বড় বড় কয়েকটি ভাতের গ্রাস মুখে পুরে দিলেন, বাঁ হাতে ঘটি নিয়ে ঢক্ ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে অপেক্ষাকৃত নরমসুরে জিজ্ঞেস করলেন —তোর পরনের কাপড় কাচা? ঐ কলসীটা থেকে আমায় একটু খাবার জল গড়িয়ে দে দেখি —

মেয়েটি তাই করলে। দ্রব ঠাকরুন বললেন —অরুচি কেন? তোর মার কি ছেলেপিলে হবে নাকি?

—তা তো জানিনে ঠাক্মা।

—যা, নিয়ে যা—তবে একটার বেশি নিবিনে—বুঝলি?

দ্রব ঠাকরুন খেয়ে উঠে মাদুর পেতে একটু শুয়েচেন, এমন সময় মুখুজ্জে বাড়ির বড় ছেলে অতুল এসে বললে—ও ঠাক্মা, শুয়েছেন নাকি?

—হ্যাঁ, কে? অতুল? কি ভাই?

—আপনার পিটুলিগাছ আছে? কলকাতা থেকে দেশলাইয়ের কারখানার লোক এসেচে গাঁয়ের পিটুলি আর শিমূল গাছ কিনতে। আপনার যদি থাকে—বেশ দর দিচ্চে—

—না, বাপু, আমার নেই।

—কেন, আপনার বাড়ির পেছনে হরি রায়ের দরুন জঙ্গলে তো বেশ বড় বড় পিটুলিগাছ আছে—

—না, আমি বেচবো না।

আসলে দ্রব ঠাকরুনের গাছপালার ওপর বড় মায়া, স্বামীর আমলের যা কিছু যৎসামান্য জমিজমা, তা প্রায়ই জঙ্গলাবৃত এবং বড় বড় বাজে গাছে ভর্তি। জ্বালানী

কাঠ হিসেবে বিক্রি করলেও এই কয়লার দুর্মূল্যতার দিনে দু-পয়সা পাওয়া যায়, কিন্তু গাছের একটা ডাল কাটতেও তাঁর মায়া। না খেয়ে কষ্ট পাবেন, তবুও গাছ বিক্রির কথা তুলতেও দেবেন না। একজনের শুঁয়োপোকা লাগাতে সে ডুমুরপাতা পাড়তে এসেছিল, কারণ ডুমুরপাতা দিয়ে শুঁয়ো-লাগা জায়গাটা ঘষলে শুঁয়ো ঝরে যায়, কিন্তু দ্রব ঠাকরুন তাকে ডুমুরপাতা পাড়তে দেননি। হয়তো এটা অতিরঞ্জিত গল্প মাত্র, তবে এর দ্বারা তাঁর মনের অবস্থা অনেকটা বোঝা যাবে।

বৈকালের দিকে দ্রব ঠাকরুন বেশ ভালোই বোধ করলেন। পাড়ার এক প্রান্তে জঙ্গলে ঘেরা বাড়ি, বড় কেউ এদিকে বেড়াতে আসে না, এক ন-ঠাকরুন ছাড়া কেউ উঁকি মেরে বড় একটা দেখে না, দ্রব ঠাকরুন কিন্তু লোকজন, আড্ডা, মজলিস প্রভৃতি ভালই বাসেন। কেউ এসে গল্প করে, এটা তাঁর খুবই ইচ্ছে—কিন্তু ও বেলার সেই বালিকাটি ছাড়া বিকেলে আর কেউ এল না। সেও এসেচে নিজের স্বার্থে।

—ঠাকুর-মা, একটা নেবু দেবেন?

—কেন রে, কেন? ওবেলা তো—

—ওবেলার নেবু ওবেলা ফুরিয়েচে, এবেলা একটা দরকার—মা বললে—

—আচ্ছা, আয় উঠে বোস একটু—

বালিকাটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে বসে। নয়তো নেবু পাওয়া যায় না। বুড়ির কাছে বসতে তার ইচ্ছে হয় না, তার সমবয়সী বালিকারা রায়পাড়ার পুকুরধারে এতক্ষণ ফুল তোলাতুলি খেলা আরম্ভ করে দিয়েচে...তার প্রাণ রয়েচে সেখানে পড়ে। কিন্তু দ্রব ঠাকরুনের নিঃসঙ্গ মন যাকে হয় আঁকড়ে ধরতে চায় এই নির্জন বৈকাল বেলাটিতে...তবুও দুটো কথা বলবার লোক তো বটে।

দ্রব ঠাকরুন আপন মনেই বকে চলেছেন, নাতবৌয়ের মন্দ ব্যবহারের কথা, নাতির ছেলে খোকনের অলৌকিক গুণাবলী, ছোট নাতি পরেশ তাঁকে কি রকম ভালবাসে... এই ধরনের নানা কথা শুনতে শুনতে ক্ষুদ্র শ্রোতাটির হাই ওঠে, সে করুণ স্বরে বলে—ঠাক্‌মা, মা সাবু চড়িয়ে আমায় বললে, নেবু নিয়ে আয়, বেলা গেল—

—হ্যাঁ, হচ্চে হচ্চে...তারপর শোন না....

—মা বকবে—নেবু নইলে সাবু খেতে পারবে না—

—আচ্ছা, শোন—তারপর খোকনমণি সেই পেয়ারা তো খাবেই, কিছুতেই ছাড়ে না—ওর মাও দেবে না—বড্ড হেজলদাগড়া মেয়ে ওর মা, আমি বলি, বৌ—চাচ্চে খেতে, এক টুকরো ওকে দ্যাও—তা আমায় বললে—আপনি চুপ করে থাকুন, আপনি কি বোঝেন ছেলেমেয়ে মানুষ করার—একালের মাও অন্য রকম, আপনাদের সেকাল গিয়েচে।...আমি জানিনে ছলেমেয়ে মানুষ করতে—তবে তুই তোর বর পেলি কোথা

থেকে রে আবাগের বেটি?

—আমি এবার যাই ঠাক্‌মা—নেবু একটা—

আচ্ছা তা যা নিয়ে একটা নেবু—শুনলি তো সব কাণ্ডখানা? দিদি-শাশুড়ী বড় মন্দ—

এমন সময়ে বাড়ির বাইরে একখানা গোরুর গাড়ির শব্দ শোনা গেল। খুকী কৌতূহলে চোখ বড় বড় করে বললে—ও ঠাক্‌মা, কে যেন এল গাড়ি করে—তোমার ওই তুঁততলায় গাড়ি দাঁড়ালো—

বলতে বলতে দ্রব ঠাকরুনের মেজ নাতি নীরদচন্দ্র দুটি ভারী মোট দু-হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ঢুকে ডাক দিলে—ও ঠাক্‌মা—

দ্রব ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বললেন—কানু? আয়, আয় ভাই—ভালো আছিস?

কানু এসে মোট নামিয়ে পিতামহীকে প্রণাম করলে, বালিকাটির দিকে চেয়ে বললে—এ হরিকাকার মেয়ে কনক না? ওঃ কত বড় হয়ে গিয়েছে—ভালো আছিস কনকী? নে, দাঁড়া—একখানা গজা নিয়ে যা—

পুঁটলি খুলে মেয়েটির হাতে একখানা বড় গজা দিতে সে নিঃশব্দে হাসিমুখে হাত পেতে দাঁড়িয়ে রইল, বড় মোটটার মধ্যে আরও কি কি জিনিস আছে দেখবার আগ্রহে। তাদের বাড়িতে এমন কেউ নেই যে বিদেশে চাকুরি করে—নিতান্তই অল্পবিত্ত গৃহস্থের সংসার—চাকুরে বাবুরা বাড়ি আসবার সময় কি কি অপূর্ব জিনিস না জানি নিয়ে আসে!

দ্রব ঠাকরুন জিজ্ঞেস করলেন—তারপর, কি মনে করে? হঠাৎ যে? বুড়িকে মনে পড়েচে তাহলে? বাবাঃ, সারা আষাঢ় মাস অসুখে ভুগে ভুগে—তাই এখনও কি সেরেচি? এমন একটা লোক নেই যে, এক ঘটি জল এগিয়ে দ্যায়—ওই ন-বৌ ছিল তাই—এত চিঠি দিলাম, না এল টেবু, না এল বিন্দে, না এলে তুমি—

সন্ধ্যার পর ন-ঠাকরুন খবর পেয়ে ছুটে এলেন। গ্রামের ছেলে, জন্মাতে দেখেচেন, অনেক দিন পরে দেখে খুব খুশি। কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করার পর বললেন—হ্যাঁ কানু, তা তোমরা সোনার চাঁদ সব নাতি থাকতে বুড়ি এখানে বেঘোরে মারা যাবে? পালাজ্বরে ধরেচে—এই আজ ভালো আছে, কাল এমন সময় লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়বে। কে দ্যাখে কে শোনে—তার ওপর আবার গোরু—একটা বিহিত করে যাও যা হয়—নইলে—

কানু বললে—সে সব জন্যেই তো আসা। চিঠি পেয়েচি অনেক দিন, সায়েব ছুটি দিতে চায় না—পরের চাকরি—তাই দেরি হল।

দ্রব ঠাকরুন বললেন—ভালো কথা, ও ন-বৌ দু-খানা গজা নিয়ে যাও, জল

খেয়ো—কানু এনেচে আমার জন্যে—তা ও যেমন পাগল, আমার কি দাঁত আছে যে গজা খাবো? নিয়ে যাও ন-বৌ।

—তা দ্যাও দু-খানা নিয়ে যাই। ভালোটা মন্দটা এ পাড়াগাঁয়ে তো চক্ষেই দেখতে পাইনে দিদি—বেঁচে থাক তোমার সোনার চাঁদ নাতিরা, তোমার ভাবনাটা কিসের? বিশেষ করে কানুর মতো ছেলে নেই এ গাঁয়ে—আমি যা বলবো তা মুখের ওপরেই বলবো বাপু—

ফলে ন-বৌ দু-খানার জায়গায় চারখানা গজা হাতে খুশি মনে বাড়ির দিকে চললেন আর কিছুক্ষণ পরে।

নাতি-ঠাকুরমায় পরামর্শ হল রাত্রে। কানু এক মতলব ফেঁদে এসেচে। ঠাকুরমাকে সে কাশী নিয়ে গিয়ে রেখে আসবে। তার একজন কে বন্ধুর মা কাশীতে থাকেন, সেই একই বাড়িতে ঠাকুরমাকে রাখবে। পরদিন সকালে ন-বৌ শুনে খুব খুশি, অমন সব নাতি থাকতে ভাবনা কি? তীর্থধর্ম করার সময়ই তো এই। তাঁর যদি আজ ছেলেটাও বেঁচে থাকতো!

আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে সাত মাস মাত্র বয়সে ন-ঠাকরুনের ছেলে মারা গিয়েচে—সে-ই প্রথম, সে-ই শেষ। তাঁর আর ছেলেপুলে হয়নি।

যাবার দিন দ্রব ঠাকরুন প্রিয় মুংলি গোরুটার ভার দিয়ে গেলেন ন-বৌকে। বার বার মাথার দিব্য দিলেন, মুংলিকে যেন যত্ন করা হয়। বললেন—ও গোরু তোমারই হয়ে গেল ন-বৌ, আমায় আশীর্বাদ করো যেন কাশীতে হাড় ক-খানা রাখতে পারি—নাতিদের ঘাড়ের বোঝা যেন নেমে যাই—আমার বড় নাতির ভাবনা কি, তার স্বচ্ছল অবস্থা, লুচি পরোটা জলখাবার, তেল ঘিয়ে কলকলে করে পাঁচ ব্যান্নুন রান্না—আমি বুড়ি হয়েচি, ওদের সংসারে সেকেলে মতের লোকের জায়গা আর হয় না এখন—

ঘরের আড়ায় শুকনো নারকোলপাতার আঁটি, পাকাটির বোঝা যোগাড় করা ছিল, বর্ষায় উনুন ধরানোর কষ্ট বলে সুগৃহিণী দ্রব ঠাকরুন যে-সময়ের-যা সঞ্চয় করে রাখতেন। কাশীবাস করতে যাচ্ছেন, পেছুনটান থাকলে তীর্থবাস হয় না—সে সব দান করে গেলেন কতক ন-ঠাকরুনকে, কতক একে ওকে।

কনক একটা পাকা শসা হাতে এসে বললে—শসা খাবে ঠাক্‌মা?

—তুই এক বোঝা পাকাটি নিয়ে যা কনকী—ঠাক্‌মাকে মনে রাখবি তো? হ্যাঁ রে?

কনক অনেকখানি ঘাড় নেড়ে বলল—হুঁ উঁ-উঁ—

ন-ঠাকরুন চোখের জল ফেললেন যাবার সময়ে।

দ্রব ঠাকরুন ট্রেনে কোনো রকমে শুচিতা বজায় রেখে কাশী এসে পৌঁছলেন। একটা গলির মধ্যে দোতলা বাড়ির নীচের তলার ঘরে কানুর সেই বন্ধুর মা কাশীবাস করচেন। পাশেই আর একখানা ছোট ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে দ্রব ঠাকরুনের জন্যে। অপর বৃদ্ধাটির কাছে চাবি ছিল ঘরের, তিনি চাবি খুলে দিলেন। দ্রব ঠাকরুন নিজের জিনিসপত্র নিয়ে সেই ঘরে অধিষ্ঠান হলেন।

দ্রব ঠাকরুন ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সভয়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁর প্রতিবেশিনী নদে' জেলার লোক। কথাবার্তার ধরন ও সুর শহুরে ও সম্পূর্ণ মার্জিত। যশোর জেলার মানুষ দ্রব ঠাকরুনের ভয় পাবারই কথা বটে। তিনি এসে দ্রব ঠাকরুনের ঘরে ঢুকে বললেন—আপনার রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কাল থেকে করলেই হবে—আজ আমার ঘরে দুধ আর মিষ্টি আছে, আপনার জন্যে রাখলুম কিনা।

দ্রব ঠাকরুন ভয়ে ভয়ে বললেন—ও!

প্রতিবেশিনী নিজের ঘর থেকে খাবার এনে বললেন—আপনার লোমবস্ত্র বার করুন—

দ্রব ঠাকরুন ভালো বুঝতে না পেরে বললেন—কি বললেন?

দ্রব ঠাকরুনের 'বললেন' এই কথায় 'ব'-এর উচ্চারণ যশোর জেলার উচ্চারণ-রীতি অনুযায়ী প্রসারিত উচ্চারণ, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার উচ্চারণে এই সব স্থানের উচ্চারণ যতদূর সম্ভব আকুঞ্চিত। 'বললেন'-এর উচ্চারণ 'বোললেন'—'ও' কার-এর উচ্চারণও যতদূর সম্ভব ঘোরালো।

—বোলচি, লোমবস্ত্র বের করে পরুন, একটু কিছু মুখে দিতে হবে তো?

লোমবস্ত্র কি জিনিস, পাড়াগাঁয়ের মানুষ দ্রব ঠাকরুন কখনো শোনেননি—তবে জিনিসটা যে বস্ত্র জাতীয় দ্রব্য তা বুঝতে পারলেন, বললেন—সে তো আমার নেই?

—লোমবস্ত্র নেই? আপনি জপ করেন কি পোরে?

—এই সাদা থান পরেই জপ করি, আর কোথায় কি পাবো?

বাড়িখানা গলির মুখে হলেও প্রায় সদর রাস্তার ওপরে। অনেক রাত পর্যন্ত গাড়ি-ঘোড়া রাস্তার গোলমাল থামে না। নিরিবিলি বনজঙ্গলের মধ্যে বাড়িতে একা থাকা দ্রব ঠাকরুনের চিরদিনের অভ্যাস, এত গোলমালে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। উঃ, কী মুশকিলেই পড়া গেল! নাঃ, কাশীর লোক ঘুমোয় কখন?

কানু তার পরদিন বন্ধুর মায়ের হাতে পল্লিবাসিনী পিতামহীকে সমর্পণ করে কর্মস্থানে চলে গেল, তার ছুটি ফুরিয়েছে। বন্ধুর মার নাম নীরজবাসিনী, দ্রব ঠাকরুনের

চেয়ে তাঁর বয়স দু-পাঁচ বছর কম হবে, মাথার সব চুল এখনও পাকেনি—তবে সেটা স্বাস্থ্যের গুণেও হতে পারে।

দ্রব ঠাকরুন এঁর সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলে বেড়াতে গেলেন—খুব লোকজনের ভিড়, গান, বক্তৃতা, কথকতা। এক গেরুয়া কাপড় পরা সন্ন্যিসির চারিপাশে খুব ভিড়, নীরজা সেখানে জুটলেন গিয়ে। কর্মবাদ, সেবাধর্ম ইত্যাদি নিয়ে সন্ন্যিসি কি সব কথা বলে যাচ্ছেন, দ্রব ঠাকরুন অতশত বুঝতে পারলেন না। ফিরবার পথে দ্রব ঠাকরুন জিজ্ঞেস করলেন—উনি কেডা?

—উনি রামকৃষ্ণ মঠের একজন বড় ইয়ে —স্বামী সেবানন্দ।

—কি মঠ?

—কেন, রামকৃষ্ণ মঠের কথা শোননি? ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের—মস্ত বড় কাণ্ড ওঁদের—

—রাম আর কৃষ্ণ দুই ঠাকুরের নাম বুঝি?

নীরজা বিস্ময়ে দ্রব ঠাকরুনের দিকে চেয়ে বললেন—আপনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শোনেননি?

—না। কে তিনি—কই না—এখানে আছেন?

নীরজা আর কোনো কথা বললেন না। এমন বর্বরের সঙ্গেও তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন যে রামকৃষ্ণদেবের নাম পর্যন্ত জানে না! দ্রব ঠাকরুনের কোনো দোষ নেই, তিনি অজ্ঞ সেকেলে লোক, অজ পল্লীগ্রাম ছেড়ে জীবনে কখনো কোথাও যাননি। গোপীনাথপুরের জঙ্গলে ও-নাম কখনো কারো মুখে শোনেনওনি। তিনি জানেন, রাম, কৃষ্ণ, রাধা, দুর্গা, লোচনপুরের জাগ্রত কালী, কালীঘাটের কালী ইত্যাদি। অত বড় নামের কোনো ঠাকুরের কথা কই—কেউ তো তাঁকে বলেনি?

দ্রব ঠাকরুন ভয়ে ভয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গিনী তাঁকে নিতান্ত নাস্তিক, অজ্ঞ, মূর্খ বলে না ঠাওরান।

দিন-কয়েক যেতে-না-যেতেই দ্রব ঠাকরুন বুঝে নিলেন সঙ্গিনীটি ধর্ম বাতিকগ্রস্তা। সাধু-সন্ন্যিসির ভক্ত। যদি কোথাও কোনো নতুন ধরনের সাধু মন্দিরে কি ঘাটে বসে আছে, তবে আর নিস্তার নেই। সেখানে বসে অমনি গরুড়ের মতো হাত জোড় করে বক্ বক বকুনি জুড়ে দেবে। আর কি-সব কথা জিজ্ঞেস করবে, কর্মফল কি, পুনর্জন্ম কি, হেনো তেনো। রাস্তা-ঘাটে বেরুলে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়, বাসায় ফেরবার নামটি নেই। এত বিরক্ত ধরে দ্রব ঠাকরুনের—কিন্তু তিনি কি করবেন? কাশীর রাস্তা চেনেন না—একাও বাসায় ফিরতে পারেন না সঙ্গিনী না ফিরলে।

একদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি দেখতে গেলেন দুজনেই।

সেখানে এক সন্ন্যাসিনী নাটমন্দিরে বসে আছেন, গেরুয়া কাপড় পরনে, মাথায় জটা, অনেক মেয়েছেলের ভিড় হয়েচে সেখানে। নীরজা তো সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে সর্বদা একপায়ে খাড়া, চারিপাশের ভক্তের দলে গেল মিশে তাঁকে নিয়ে। দ্রব ঠাকরুন শুনতে লাগলেন কেউ জিজ্ঞেস করচে, মাইজি, ঠাকুরের দেখা পাওয়া যায়?

কেউ বলচে—মাইজি, আমার মেয়ের মাদুলি দেবেন তো আজ?

—আজ আমার হাতখানা দয়া করে দেখবেন কি?

নীরজা জিজ্ঞেস করলেন—মাইজি, আমার ভক্তি হচ্চে না কেন?

দ্রব ঠাকরুন শুনে মনে মনে হেসে আর বাঁচেন না। সর্বদা সাধু-সন্ন্যিসি নিয়েই আছো, এখানে প্রণাম, ওখানে ধন্না, দুঘন্টা ধরে নাক টেপা—এতেও যদি তোমার ভক্তি না হয়ে থাকে, গঙ্গার জলে ডুবে মরো গিয়ে—ঢং দেখে আর বাঁচিনে! মরণ আর কি!

তারপর সবাই চলে গেল—নীরজা সেই যে সেখানে চোখ বুজে ধ্যান না কি যোগে বসলো আর ওঠে না। দ্রব ঠাকরুনও কিছু বলতে সাহস পান না। এদিকে তাঁর মনে পড়লো সুজি একদম নেই, সেকথা এতক্ষণ মনে ছিল না, এত রাত হয়ে গেল, কোথায় বা সুজি কেনা হবে? রাত্রে একটু মোহনভোগ খাওয়া, তাও আজ ধর্মের ভিড়ে বুঝি বা হয় না।

বসে বসে দ্রব ঠাকরুন বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মন্দির থেকে বাঙালি মেয়েরা প্রায় সব চলে গিয়েচে, এদেশী লোক যারা হিন্দি-মিন্দি বলে, তাদের দলই যাচ্চে-আসচে! কি জানি ওদের কথা তিনি কিছুই বুঝতেও পারেন না, বলতেও পারেন না।

আজ মাস-তিনেক গ্রাম থেকে এসেচেন। বেশ শীত পড়ে গিয়েচে কাশীতে। মুংলি গোরুটার কথা এত করেও আজকাল মনে পড়চে! শীতের রাত্রে পাছে মুংলির কষ্ট হয় বলে তিনি গোয়ালে আগুন করে রাখতেন। তাঁর গাছটাতে খুব ডুমুর হয়েচে নিশ্চয়, কে জানে একটা গাছ ডুমুর কারা খাচ্চে! কত ডুমুর হয় গাছটাতে! আহা, ন-বৌ কি মুংলিকে অত যত্ন করচে?—তাঁর মতো ? তিনি যে পেটের মেয়ের মতো ওকে...না, তাঁর চোখে জল এসে পড়ে।

আজই এতকাল পরে ন-বৌয়ের পত্র এসেচে দেশ থেকে....তাই বেশি করে মনে পড়চে দেশের কথা। ন-বৌ লিখেচে, মুংলি ভালো আছে, শীগগির বাছুর হবে। তাঁর বাড়ির দাওয়ার খুঁটি না বদলালে নয়। কানু বা বিন্দেকে যেন চিঠি লেখা হয় সেজন্যে।

নীরজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—দিদি, চলো যাই...সত্যি কি পবিত্র স্থান, না? ইচ্ছে হয় না যে আবার সংসারে ফিরে যাই, রাঁধি খাই।

দ্রব ঠাকরুন মনে মনে বললেন—মরো-না এখানে শুকিয়ে হত্যে দিয়ে—কে মাথার দিব্যি দিয়েচে রাঁধতে খেতে!

নীরজা বললেন—করন্যাসটা অভ্যেস করচি কিনা, প্রায় হয়ে এল—

দ্রবময়ী নীরব। মাগীটা পাগল নাকি? কি সব বলে বোঝাও যায় না। রাত দুপুর বাজলো, বাবা, এখন বাসায় চল দিকি!

বাসায় এসেও কি তাই নিস্তার আছে?

নীরজা ডাকবেন তাঁর ঘর থেকে—ও দিদি, একটু গীতাপাঠ করি, শোনো—

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁকে যেতে হয়! গীতা-টীতা ওসব তিনি বোঝেন না। সুবচনীর ব্রতকথা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শিবরাত্রির ব্রতকথা এসব শোনা তাঁর অভ্যেস আছে, বেশ দিব্যি বুঝতেও পারেন—এসব শক্ত শক্ত কথার কি কাণ্ডমাণ্ড, এক বর্ণও যদি তিনি বোঝেন। আর মাগীর চোখ উল্টে, কান্না-কান্না মুখের ভাব করে পড়বার ভঙ্গিই বা কী! দ্রব ঠাকরুন না পারেন হাসতে, না পারেন হাসি চাপতে। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে গা!

নীরজা পড়তে পড়তে বললেন—আহা-হা! কী চমৎকার!

দ্রব ঠাকরুন বসে ঢুলতে ঢুলতে ভাবলেন—থামলে যে বাঁচি—

সকালে উঠে নীরজা বললেন—আজ আমার গুরুদেব আসবেন, দিদি দু-খানা লুচি ভেজে দিও তো আমার ঘরে বসে।

বেলা দুটোর সময় এক সন্ন্যিসি এসে হাজির। বেশ মোটা ভুঁড়িওয়ালা, এই লম্বা দাড়ি। নীরজা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে দুবার মাথা ঠুকলেন গুরুদেবের পাদপদ্মে। আহারাদির যোগাড় করতেই কাটলো সারাদিন—তিন সের দুধ মেরে একসের হল, ঘরে রাবড়ি মালাই তেরি হল। লুচি ভাজা হল। সন্ধ্যার সময় নীরজা বসলেন গুরুর কাছে কি সব ক্রিয়া শিখতে। আসন না মাথামুণ্ডু তাই শিখতে। যত বা এ বকে, তত বা ও বকে। মনে হল বুঝি কানের পোকা সব বেরিয়ে যায়।

গুরুদেব বাঙালি। রাত ন'টার পরে দ্রব ঠাকরুনকে ডাক দিলেন। বললেন—তোমার বাড়ি কোথায়?

—গোপীনাথপুর, যশোর জেলা—

—কে আছে বাড়িতে?

—নাতিরা আছে, তাদের ছেলে বৌ আছে।

—তুমি কাশীবাস করতে এসেচ?

—হ্যাঁ।

—নাম কি?

—দ্রবময়ী দেব্যা—

—দীক্ষা হয়েচে?

—না।

নীরজা চোখ কপালে তুলে বললেন—কী সর্বনাশ! দীক্ষা হয়নি এতদিন? তা তো জানতাম না?

গুরুদেব বললেন—দীক্ষা নিতে হবে মা তোমাকে।

—আমার পয়সা নেই, দীক্ষা নিতে গেলে খরচ আছে। নাতিরা এগারো টাকা করে মাসে পাঠায়—তার মধ্যে ঘর ভাড়া, তার মধ্যে খাওয়া। পয়সা পাই কোথায়?

—দীক্ষা না নিলে কাশীবাসে ফল কি মা?

—ফলের জন্যে তো আসিনি, শরীরডা সারাতি এসেছিলাম।

নীরজা রাগের সুরে বললেন—শরীর আগে না পরকাল আগে?

দ্রব ঠাকরুন চুপ করে রইলেন।

গুরুদেব বললেন—নীরজা মার কথার উত্তর দাও—চুপ করে থাকলে হবে না।

নীরজা বললেন—গীতার ভক্তিযোগ সেদিন পড়ছিলাম, শুনলে তো দিদি? কর্মের চেয়েও ভক্তি বড়, স্বয়ং ভগবান বলেচেন—

আঃ, কী আপদ! মাগীর সব সময়েই কি আবোল-তাবোল বকুনি?

মুখে বললেন—আমি তো কিছু বুঝিনে, আপনারা যা বলেন। তবে এবার কিছু হবে না। নাতি সাত টাকা পাঠিয়েছিল, তা ঘর ভাড়াতেই গিয়েচে। হাতে টাকা না থাকলি—

তবুও দু-জনই নাছোড়বান্দা। দীক্ষা নিতেই হবে।

গুরুদেব বললেন—কাশীবাস করচো মা, তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েচে। গুরুদীক্ষা না নিলে সবই মাটি। আজ আছ, কাল নেই। পৃথিবী কিছুই না—ইহকাল কিছুই না—

নীরজা বললেন—গুরুর মুখেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহাকালেও তিনি, পরকালেও তিনি—

দ্রব ঠাকরুন মনে মনে বললেন—আ মরণ মাগীর! তবে সোয়ামী কোথায় যাবে মেয়েদের! ঢং দ্যাখো না—! যাই হোক, বহু তর্ক করেও দ্রব ঠাকরুনকে দ্রব করা গেল না। নাম দ্রবময়ী হলে কি হবে, ভেতরে বেজায় শক্ত। নীরজা অবিশ্যি তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিমতে একজন সত্তর বছরের মৃত্যুপথযাত্রিণীর ভালো করবারই যথেষ্ট চেষ্টা করছিলেন, সে রাজী না হলে তিনি আর কি করবেন?

নীরজার ভক্তি—হ্যাঁ, সে দেখবার মতো একটা জিনিস বটে। গুরুর পাদোদক পান না করে তিনি দাঁতে তৃণ কাটবেন না। গুরুর বাক্য বেদবাক্যের চেয়েও মূল্যবান তাঁর

কাছে। পুরানো একছড়া সোনার হার ছিল, সেটা বিক্রি করে এসে টাকা তুলে দিলেন গুরুদেবের হাতে।

কথাটা শুনে দ্রব ঠাকরুন জিজ্ঞেস করলেন—অতগুলো টাকা দিয়ে দিলে গুরুদেবকে?

—টাকা সার্থক হল, দিদি—

—তোমার নিজের হার?

—ও আমার বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে দিয়েছিল—তিনি হাতে করে দিয়েছিলেন—

—সেই হার তুমি দিয়ে দিলে বেচে?

—দিদি, সংসার অনিত্য, সবই অনিত্য। কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী? সবই ভগবানের মায়া। মায়ায় সব ভুলে থাকা—গুরুই কেবল নিত্য বস্তু—

—তা তো বটে।

এ মাগীর মুখে সব সময় বড় বড় কথা। দিগে যা তোর সব কিছু গুরুর পাদপদ্মে বিলিয়ে—তাঁর কি? বিয়ের পরে স্বামী নিজের হাতে যে হারছড়া দিয়েছিল, তা কোনো মেয়েমানুষ এভাবে ঘুচিয়ে দিতে পারে? গভীর রাত পর্যন্ত শুধু এই কথাটিই বার বার তাঁর মনে পড়ে। সে-সব দিন ঝাপসা হয়ে গিয়েচে, মনের আকাশ বিস্মৃতির মেঘে ঢাকা। ওই গোপীনাথপুরের ভিটে অমন ছিল কি তখন? ফুলশয্যার রাত।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, গত আষাঢ় মাসের প্রথমে উত্তর দিকের ভাঙা পাঁচিলের গায়ে এতটুকু একটা শসাগাছ নতুন বর্ষার জল পেয়ে গজিয়েচে দেখে তিনি শুকনো কঞ্চি কুড়িয়ে একটা মাচা বেঁধে দিয়েছিলেন—এতদিনে বড় হয়েচে, কত শসার জালি পড়েচে গাছটাতে। কে খাচ্চে সে বনের মধ্যে? হয়তো কনকী আসে লেবু তুলতে—একগাছ লেবু রেখে এসেছিলেন। সে-ই হয়তো শসা পেড়ে নিয়ে যায়—কে জানে!

হঠাৎ কি একটা কুস্বরে দ্রব ঠাকরুন চমকে ওঠেন। নীরজার ঘর থেকে শব্দটা আসচে।

মাগী এত রাত্রে করে কি? হুস্ হুস করে অত জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে কেন? ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা লাগলো নাকি?

দ্রব ঠাকরুন ডাকলেন—শুনচো—ওগো—কি হয়েচে? ওগো—

নীরজা বললেন—ডাকচেন কেন দিদি?

—বলি, ও শব্দ কিসের?

—কুম্ভকের রেচক-পূরক অভ্যেস করচি—অনেক রাত ভিন্ন হয় না কিনা—ঠাকুর

তাই বলে গেলেন।

সে আবার কি রে বাবা! মাগী তো ঘুমুতেও দ্যায় না রাত্তিরে!

দ্রব ঠাকরুন বললেন—যাকগে—ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা হয়নি তো?

—না দিদি—ঘুমুইনি এখনও। ঘুমুলে যোগের ক্রিয়া হয় না। জীবনটা যদি ঘুমিয়েই কাটাবো, তবে পরকালের কাজ করবো কখন?

—তা বেশ, বেশ।

—দিদি—ঘুমুলেন?

—না, কেন?

—নির্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে শান্তি পাচ্চিনে, পাবোও না। দেহ কি জন্যে দিদি? ঘুমুবার জন্যে নয়। আরামের জন্যে নয়—শুধু নিজের কাজ করে যাওয়ার জন্যে। দিন কিনে নাও, শুধু দিন কিনে নাও—

দ্রব ঠাকরুনের পিত্তি জ্বলে গেল। কিনগে যা দিন মাগী, যদি তোর পয়সা থাকে! রাত্তিরে একটু ঘুমুতে দে অন্তত।

শীতকাল এসে গেল। কানু বড়দিনের ছুটিতে একবার কাশী এসে পিতামহীর সঙ্গে দেখা করে গেল।

দ্রব ঠাকরুন তাঁকে বললে—কানু ভাই, অন্য একটা বাসা পাওয়া যায় না?

কানু বিস্মিত হয়ে বললে—কেন, এখানে কি হল? সত্যের মা রয়েচেন, এই তো সবচেয়ে ভালো—

—ও মাগী পাগল।

—পাগল! সেকি!

—না বাবু, বেজায় ধর্মিষ্টি। অত ধর্মিষ্টি আমার পোষাবে না। আমাকে তুই সরিয়ে নিয়ে যা—

কানু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে। ঠাকুরমার যেমন কাণ্ড।

বললে—আচ্ছা ঠাক্‌মা, শেষ বয়সে কাশীবাস করতে এলে—না হয় তুমিও হও একটু ধর্মিষ্টি! হ্যাঁ, উনি ওই রকমই বটে। সত্য বলছিল, মা কিছুতেই দেশে থাকতে চান না। এই গত বোশেখ মাসে সত্যর ছোট ভাইয়ের বিয়ে গেল, ওঁর ছোট ছেলের—ওঁকে কত চিঠিপত্তর, কত অনুরোধ—কিছুতেই গেলেন না। বললেন, যে মায়া একবার কাটিয়েচেন, তাতে আর জড়িয়ে পড়তে চান না। ছোট ছেলে টেলিগ্রাম পর্যন্ত করলে, কোনো ফল হল না।

দ্রব ঠাকরুন অবাক হয়ে বললেন—বলিস কি রে কানু, সত্যি?

—মিথ্যে বলচি তোমার কাছে ঠাক্‌মা?

—আমায় এখান থেকে তুই সরিয়ে দে ভাই।

—ছিঃ—আচ্ছা, তুমি অত নাস্তিক কেন ঠাক্‌মা? ওঁর সঙ্গে থেকে একটু ধর্ম শেখো না। চিরকালই বিষয় আর সংসার নিয়েই তো কাটালে।

—হাঁপ লেগে মরে যাবো যে এখানে থাকলে—

—আবার ওই সব নাস্তিকের মতো কথাবার্তা—ঠাক্‌মা তুমি কি?

শীত কেটে গ্রীষ্ম এল, চলেও গেল। আবার আষাঢ় মাসের প্রথম। দেশের খবর নেই অনেকদিন। ন-ঠাকরুনের চিঠি আগে আগে আসতো—গত তিন চার মাস তাও বন্ধ। কথায়-কথায় একদিন নীরজাকে কথাটা বলেই ফেললেন।

—দেশে কে আছে আপনার? শুনেচি সেখানে থাকে না কেউ?

—বাড়িটা, গাছটা পালাটা—

—দিদি, এখনও ঐ সবের মায়া? বিশ্বনাথের পাদপদ্মে মন সমর্পণ করুন, সব বন্ধন ঘুচে যাবে। কেউ কিছু নয়, কিছু নয়—একমাত্র তিনিই সত্যি। বলে নীরজা চোখ কপালে তুলে ওপরের দিকে চেয়ে রইলেন। দ্রব ঠাকরুন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—ওই যাঃ, দাঁড়াও, কড়ার দুধটুকু বুঝি বেড়ালে খেয়ে গেল! নাঃ বেড়ালের জ্বালায়—যত বা বেড়াল তত বা বাঁদর। অমন গামছাখানা সেদিন—

—দিদি, আজ আমার সঙ্গে চলুন, কেদারঘাটে কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা করবেন উপীন কথক। শোনবার জিনিস। কাশীতে এসে কাশীখণ্ড শুনতে হয়—

—আমার শরীর ভালো না, আজ থাক, তুমি যাও—

নীরজা নাছোড়বান্দা, অবশেষে নিয়ে গেলেন দ্রব ঠাকরুনকে। কেদারঘাটে এর আগেও দু-তিন বার দ্রব গিয়েচেন সত্যর মার সঙ্গেই। ওপরের রানার চওড়া চাতালের একপাশে ফর্সা রোগামত কথক ঠাকুর কথকতা শুরু করেচেন—তাঁকে ঘিরে বাঙালি মেয়ে-পুরুষের ভিড়। পুরুষের চেয়ে মেয়ে অনেক বেশি।

সত্যর মা জিজ্ঞেস করলেন—দিদি, প্রণামী কিছু এনেচেন তো?

—তা তো বললে না—আনিনি—

—আট আনার কম দেওয়া যায় না। আচ্ছা, আপনারটা আমি দিয়ে দেব এখন—

—আমার আট আনা না দিয়ে চার আনা বরং দ্যাও। নাতিরা ক-টাকা বা পাঠায়?

—এখানে যা দেবেন দিদি, পরকালে তোলা রইল—

বর্ষার গঙ্গায় ঢল নেমেচে। কেদারঘাটের সামনের নদীতে কাদের বড় একটা বজরা ভেসে চলেচে, দু-তিনখানা পানসিতে সুসজ্জিতা নরনারী নদীভ্রমণে বার হয়েচে। রামনগরের দিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু বাড়ির ছাদের কার্নিসে তরল সোনার মতো

ঝিলমিল করচে রাঙা রোদ। কথক ঠাকুর সুকণ্ঠে গান ধরেচেন, কাশী সকল তীর্থের সার, মৃত্যুর সময় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথ কানে মন্ত্র দেন—মানুষের শিবলোক প্রাপ্তি ঘটে—এই হল গানের অর্থ।

দ্রব ঠাকরুনের মন অজ্ঞাতে অনেকদূরে চলে গেল। তাঁর খয়েরখাগী গাছে কত কাঁঠাল হয়েচে এই আষাঢ় মাসে, বড্ড কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে আমগাছে আমও নিশ্চয়ই খুব ধরেছিল—নাতিরা কি গিয়েচে আম খেতে? তাদের সেদিকে দৃষ্টি নেই। বারো ভূতে লুটে খাচ্চে।

রাত্রি নামলো। নীরজা বললেন—চলুন দিদি—

দ্রব ঠাকরুন লক্ষ্য করেচেন সমস্ত সময় নীরজা মাগী ফোঁস ফোঁস করে কেঁদেচে। আর কেবল বলেচে—আহা-হা-হা!

যদি এ মাগীর সঙ্গ ছাড়তে পারতেন!—কিন্তু তা হবার নয়, কানু শুনবে না।

বাসায় এসে নীরজা দেখলেন তাঁর সঙ্গিনীর মন বড় খারাপ—অন্যমনস্কভাব, বিশেষ কোনো কথা বলে না।

কাশীখণ্ড শুনে আজ তাহলে খুব ভালো লেগেচে বোধ হয়। পাষাণ বুঝি গলেচে।

নীরজা বললেন—কি ভাবচেন দিদি?

—একটা-গাছ কাঁঠাল দেশে। খয়েরখাগীর কাঁঠাল, সে তুমি কখনো খাওনি—খেলে বুঝতে।

—দিদি, এখনও আপনার মায়ার বন্ধন গেল না? আপনার তো দুটো একটা গাছ, আমার তিনটে বড় বাগান—কলমের বোম্বাই, মাল্‌দ, ফজলি—মায় ন্যাংড়া পর্যন্ত। আমি তো ফিরেও চাইনি ওসব দিকে। ছেলেরা কাঁদে, বলে, এখন কি কাশীবাস করবার সময় হয়েচে তোমার? আমি বলি, না, সংসারের মায়ায় আর না। গানে বলে—কেবা কার পর, কে কার আপন? (এই মরেচে, মাগী আবার শুরু করেচে!) কালশয্যা পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে, দেখে পরস্পরে অসার আশার স্বপন।—তা আমি বলি—এতকাল তো সংসারের বন্ধনে ঘুরে আশার স্বপন অনেক দেখলুম। এইবার পরকালের কথা ভাবি। আর আমার এই যে গুরুদেব, উনি দেহধারী মুক্ত পুরুষ—ওঁর কৃপায়—(নীরজা গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করলেন।)

দ্রব ঠাকরুন মুখে বললেন—তা তো বটেই—

—চলুন দিদি, কাল বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে সেই মাইজির কাছে আপনাকে নিয়ে যাই—আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি, আপনার এখন উচিত গুরুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সব বন্ধন মুক্ত হয়ে একমনে কাশীবাস করা। আমাদের আর ক-দিন দিদি? শমন তো দোরে দাঁড়িয়ে—সব রকম তো দেখলুম শুনলুম।

দ্রব ঠাকরুন মনে মনে বললেন—তোমার মুণ্ডু করলুম, মাগীর কথার আবার ধরন শোনো না, ভাটপাড়ার ভট্‌চাজ্জি এসেচেন? মুখে বললেন—মুংলি বলে একটা গাই গোরু ছিল আমার—বড্ড ন্যাওটে। যেখানে যাবো, সেখানে যাবে। আমার হাতে না খেলে তার পেট ভরতো না। এই বেশ কচি-কচি বাঁশপাতা এনে মুখে দেতাম তুলি—আর—

—আঃ, আবার ওই সব কথা আপনার মুখে! জড়ভরতের কথা জানেন তো? অত বড় জ্ঞানী—পূর্বজন্মের এক হরিণের মায়ায় তাঁর সব গেল। ভগবানের চিন্তা করুন—ভগবানের চিন্তা করুন—সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

দ্রব ঠাকরুন কোনো কথা বললেন না। তাঁর ওর কথা একেবারেই ভালো লাগে না। মাগী যেন কী! কি বলে, কি করে! মাগী এমন পাষাণ যে, ছোট ছেলের বিয়েতে বাড়ি গেল না। মুখ দেখতে আছে ওর? ছিঃ—

সারারাত্রি সপ্নের ঘোরে দেখলেন তাঁর গোপীনাথপুরের ভিটেতে চালাঘরের ছাঁচতলায় ম্লান মুখে ছলছলে চোখে তাঁর মুংলি দাঁড়িয়ে রয়েছে—ন-বৌ তাকে যত্ন করচে না, বুড়ি হয়েচে মুংলি, তেমন দুধ তো আর দিত পারে না—মুংলিকে তিনি তার মায়ের পেট থেকে টেনে বার করে এতকাল নিজের মেয়ের মতো পুষেছিলেন—তিনি নেই, কে ওকে দেখে? কাঁঠাল হয়েচে বটে খয়েরখাগী গাছটাতে! এত কাঁঠাল তিন চার বছরের মধ্যে হয়নি। তিনি নাইতে যাচ্ছেন নদীতে, মুখুজ্যেগিন্নি বলচে—হ্যাঁ খুড়িমা, এবার তোমার গাছে কী কাঁঠাল ধরেচে! তা আমায় একটা দিও, তোমার নাতিদের খেতে দেবো—

খড় উড়ে উড়ে পড়চে বাড়ির চাল থেকে। কানু বা বিন্দে দেশে যায়নি, ঘরও সারায়নি। এবার বর্ষায় কি টিকবে চালে খুঁচি না দিলে?

কনক বলচে—অ ঠাক্‌মা, একটা নেবু দেবা? আমার মার অরুচি হয়েছে, কিছু খেতি পারে না—

সকালে উঠে নীরজা নিজেই গঙ্গাস্নান করে এসে স্বপাক হবিষ্যান্ন চড়িয়েচেন এবং প্রতিদিনের অভ্যাসমত ইষ্টমন্ত্র জপ শেষ করে গাল-বাদ্য সহকারে শিবপূজা করচেন। দ্রব ঠাকরুনের একটু বেলা হয়েছে আজ উঠতে। মনও খুব ভার। তাঁর আপনার জন পড়ে রইল—তাঁর মুংলি, তাঁর খয়েরখাগী গাছটা, তাঁর ডুমুরগাছ—আর তিনি কোথায়! আরও ওই মাগীর জ্বালায়...

নীরজার গাল-বাদ্য থামলো। দ্রব ঠাকরুনকে বললেন—আজ বড় সুখবর পেলুম দিদি—গঙ্গাস্নানে গিয়ে গুপ্তিপাড়ার সইয়ের সঙ্গে দেখা—সেও আমার মতো কাশীবাস করচে—বাঙালিটোলায় থাকে, বললে, গুরুদেব আসবেন সামনের

সোমবারে। হরিদ্বার থেকে ফেরবার পথে আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে তবে যাবেন। সইও একই গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েচে কিনা। আজ বড় শুভদিন আমার। গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেই বেঁচে আছি, এবার এলে আপনাকে দীক্ষা নিতেই হবে দিদি, আমি ছাড়বো না। গুরুদীক্ষা না হলে দেহ পবিত্র হয় না, ভবসাগর পার হতে হলে গুরুর চরণরূপ ভেলা চাই আগে—নইলে হাবু-ডুবু খেয়ে মরতে হবে যে দিদি।

দ্রব ঠাকরুন বললেন—তা তো ঠিক, তা তো ঠিক—

গুরুদেবের আগমনের পূর্বেই শনিবার সকালের গাড়িতে কানু এসে হাজির হল। দ্রব ঠাকরুন নাতির কাছে কেঁদে পড়লেন—তুই আমায় গুপীনাথপুরে নিয়ে চল ভাই, আমার আর কাশীবাসে কাজ নেই—বাবা বিশ্বনাথ মাথায় থাকুন। ও মাগীর কাছে আর দু-মাস থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

ফলে, সোমবার কাশীতে গুরুদেবের শুভাগমনের দিন দুপুরের ট্রেনে দ্রব ঠাকরুন দেশের ইষ্টিশানে তাঁর বোঁচকা-তোরঙ্গ নিয়ে নাতির সঙ্গে এসে নামলেন।

ন-ঠাকরুন শুনে ছুটে এলেন—ও দিদি—দিদি—

—হ্যাঁ ন-বৌ—আমার মুংলি ভালো আছে?

—ভালো নেই দিদি। ওঠে না, খায় না—তোমার যাওয়ার পর থেকেই গোয়ালে শুয়েই থাকে।

—সে আমার মন বলেচে ভাই, তুমি কি বলবে। তাকে রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেই তো আর টিকতে পারলাম না, চলে অ্যালাম। কানুকে বললাম, নিয়ে চল ভাই গুপীনাথপুর, মাথায় থাকুন বাবা বিশ্বনাথ—মুংলি কোথায়? ওকে কচি বাঁশপাতা খাওয়াবো নিজের হাতে, স্বপ্ন দেখিচি।

একটু পরে ন-ঠাকরুন দড়া ধরে মুংলিকে নিয়ে এলেন। সত্যিই তার সে চাহারা নেই। সব কাজ ফেলে দ্রব ঠাকরুন ছুটে গিয়ে তার গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। মুংলির চোখে জল পড়ে, তাঁরও চোখে জল পড়ে।

ন-ঠাকরুন বললেন—আর-জন্মে ও তোমার মেয়ে ছিল দিদি—আর-জন্মের মায়ার বাঁধন—

—রক্ষে করো ন-বৌ—তুমিও বড় বড় কথা বলতে শুরু করলে নাকি, সেই মাগীর মতো? মুংলি এ জন্মেই আমার মেয়ে—আর জন্ম-টন্ম ছেড়ে দাও।

—কে মাগী, কার কথা বলচো?

—সে বলবো এখন সব। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি দেশে এসে—বাবাঃ—

কানু হেসে বললে—নাঃ, ঠাক্‌মাকে নিয়ে আর পারা গেল না—এমন নাস্তিক—কাশীপ্রাপ্তি অদৃষ্টে থাকলে তো?

—তুই ভাই বল, ন-বৌ বলো—আমার এই ভিটেতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে যেতে পারি। কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠোনের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসীতলায়—আমাকেও তোরা ওখানে—

আঁচলের খুঁট দিয়ে দ্রব ঠাকরুন চোখের জল মুছলেন।

বেলা যায়-যায়—আষাঢ়ান্ত সুদীর্ঘ দিনমানের শেষে সূর্য ঢলে পড়েচে পশ্চিম দিকের নিবিড় বাঁশবনের আড়ালে। ঘেঁটকোল ফুল কোথায় জঙ্গলে ফুটেচে, বাতাসে তার কটু উগ্র গন্ধ। দ্রব ঠাকরুনের মন শান্তিতে, আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল। এগারো বছরের নববধূ এই বাড়ির উঠানে পা দিয়েছিলেন, এখন তাঁর বয়েস তিন কুড়ি ছয়।

কনক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বললে—ঠাক্‌মা, ভালো আছেন? এয়েচেন শুনে ছুটে দেখতে অ্যালাম—আমাদের কথা মনে ছিল?

ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল

চাকুরি গেল। এত করিয়াও কৃষ্ণলাল চাকুরি রাখিতে পারিল না। সকাল হইতে রাত দশটা পর্যন্ত (ডাউন খুলনা প্যাসেঞ্জার, ১০-৪৫ কলিকাতা টাইম) টিনের সুটকেস হাতে শিয়ালদ' হইতে বারাসত এবং বারাসত হইতে শিয়ালদ' পর্যন্ত 'তাঁতের মাকু'র মতো যাতায়াত করিয়া ও ক্রমাগত "দত্তপুকুরের বাতের তেল, দত্তপুকুরের বাতের তেল—বাত, বেদনা, ফুলো, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, দাঁত কনকনানি, এক কথায় যত রকম ব্যথা, শূলানি, কামড়ানো আছে সব এক নিমেষে চলে যাবে—আজ চব্বিশ বছর এই লাইনে ওষুধটি প্রত্যেক ভদ্রলোক ব্যবহার করচেন, সকলেই এর গুণ জানেন—" বলিয়া চিৎকার করিয়াও চাকুরি রাখা গেল না।

সেদিন বসু মহাশয় (ইন্ডিয়ান ড্রাগ সিন্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু) কৃষ্ণলালকে ডাক দিয়া বলিলেন—পাল মশায়, কাল রাত্রের ক্যাশ জমা দেননি কেন?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—অনেক রাত হয়ে গেল—খুলনার ট্রেন—প্রায় বিশ মিনিট লেট্।

—দেখুন, আগেও আমি অন্তত সতেরোবার আপনাকে সাবধান করে দিয়েচি। খুলনা ট্রেন দশটা একুশে স্টেশনে আসে। আমি সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অফিসে বসেছিলাম শুধু আপনার জন্যে। নিতাই দু-বার স্টেশনে দেখে এল ট্রেন রাইট-টাইমে

এসেচে। লেট্ এক মিনিটও ছিল না—

—আজ্ঞে বড়বাবু, শরীরটা কাল বড়ই—

—ও আপনার পুরনো কথা। ওকথা আর শুনবো না আজ। যাক, ক্যাশ এনেচেন এখন?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মতো বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিল। বলিল—ক্যাশটা আনিগে যাই—না—একটু মুশকিল হয়েচে, আচ্ছা, আসি—

—যান, আসুন—

কৃষ্ণলাল তবুও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া নৃত্যগোপালবাবু বলিলেন—কি হল?

—আজ্ঞে ওবেলা দেবো ওটা। বাসায় এনে রেখেছিলাম, চাবি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েচে, আমি যার সঙ্গে থাকি—

—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—একটু বেড়াতে বার হয়েছিলাম ওই গোলদীঘির দিকে—

—সব বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করিনে। কেন করিনে তাও আপনি জানেন। রাত দশটার পরেই ক্যাশ এনে দেওয়ার কথা—আপনি বুড়ো হয়ে গেলেন এই ক্যানভাসারের কাজ করে। জানেন না যে, ক্যাশ তখুনি জমা দেওয়ার নিয়ম আছে?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—

—এ রকম আরও কতবার হয়েচে বলুন দিকি? আপনার কথার ওপর বিশ্বাস করা যায় না আর। বড়ই দুঃখের কথা। আপনি আমাদের পুরনো ক্যানভাসার বলে আপনার অনেক দোষ সহ্য করেচি আমরা। কিন্তু এবার আর নয়। আপনি এ মাসের এই ক-দিনের মাইনে নিয়ে যাবেন আপিস খুললে—কমিশনের হিসেবটাও সেই সঙ্গে দেবেন। যান এখন।

অবশ্য এত সহজে কৃষ্ণলাল যাইতে রাজী হয় নাই—নৃত্যগোপালবাবুকে সে যথেষ্টই বলিয়াছিল, নৃত্যগোপালবাবুর বুড়োকর্তাকে গিয়া পর্যন্ত ধরিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না।

মুশকিল এই, চাকুরি যখন যাইবার হয়, তখন তাহাকে কিছুতেই ধরিয়া রাখা যায় না। মৃত্যুপথযাত্রী মানবের মতোই তার গতিপথ নির্মম, ধরাবাঁধা।

সুতরাং চাকুরি গেল।

তখন বেলা আড়াইটা। সকাল হইতে ইহাকে উহাকে ধরাধরির ব্যাপারেই এতক্ষণ সময় কাটিয়াছে। স্নান-আহার হয় নাই।

২৫/২ রামনারায়ণ মিত্রের লেনে ঢুকিয়াই যে টিনের চালওয়ালা লম্বা দোতলা মাটির ঘর, অর্থাৎ যে মাঠকোঠার ঠিক সামনেই আজকাল কর্পোরেশনের সাধারণ

স্নানাগার নির্মিত হইয়াছে—তারই পশ্চিম কোণে সতেরো নম্বর ঘরে আজ প্রায় এগারো বছর ধরিয়া কৃষ্ণলালের বাসা।

কৃষ্ণলাল ঘরে একা থাকে না। ছোট্ট ঘরে তিনটি ময়লা বিছানা মেঝের উপর পাতা। সে ঢুকিয়া দেখিল ঘরে কেবল যতীন শুইয়া ঘুমাইতেছে। আর একজন রুমমেট্ ট্রামের কন্ডাকটার, সাড়ে চারটার পরে সে ডিউটি হইতে ছুটি লইয়া একবার আধঘন্টার জন্য বাসায় আসে এবং তারপরেই সাজিয়া-গুজিয়া কোথায় বাহির হইয়া যায়।

নীচে পাইস হোটেলে ইহাদের খাইবার বন্দোবস্ত।

কৃষ্ণলালের সাড়া পাইয়া যতীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে বলিল—এত বেলায়?

—বেলায় তা কি হবে? চাকরিটা গেল আজ।

—সেকি! এতদিনের চাকরিটা—

—কত করে বললুম বড়বাবুকে। তা শোনে কি কেউ? গরিবের কথা কে রাখে বলো!

—হয়েছিল কি?

—ক্যাশ জমা দিতে দেরি হয়েছিল। বলে, তুমি ক্যাশ ভেঙেচ।

—তাইতো...তাহলে এখন উপায়?

—দেখি কোথাও আবার চেষ্টা—জুটে যাবে একটা না একটা। আমাদের এক দোর বন্ধ হাজার দোর খোলা—আমাদের অন্ন মারে কে!

সামান্য কিছু পয়সা হাতে ছিল—পাইস হোটেল হইতে শুধু ডাল-ভাত খাইয়া আসিয়া কৃষ্ণলাল কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল, পরে নবীন কুণ্ডু লেনে একটি খোলার বাড়িতে ঢুকিয়া ডাক দিল—ও গোলাপী—গোলাপী

তাহার সাড়ায় যে বাহির হইয়া আসিল, সে বর্তমানে রূপযৌবনহীনা প্রৌঢ়া,পরনে আধময়লা খয়েরী রংয়ের শাড়ি, হাতে গাছকয়েক কাচের চুড়ি। দু-গাছা সোনাবাঁধানো পেটি। মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, গায়ের রং এখনও বেশ ফর্সা।

গোলাপীকে ত্রিশ বছর আগে দেখিলে ঠিক বোঝা যাইত গোলাপী কি ছিল। এখন আর তাহার কি আছে? কৃষ্ণলাল তখন সবে ঔষধের ক্যানভাসারের পদে বহাল হইয়াছে—তাহার চমৎকার চেহারা ও কথাবার্তা বলিবার ভঙ্গিতে রেলগাড়ির প্যাসেঞ্জার কি করিয়া সহজেই ভুলিয়া যাইত—জলের মতো পয়সা আসিতে লাগিল।

এই নবীন কুণ্ডু লেনেই অন্য এক বাড়িতে এক বন্ধুর সহিত আসিয়া সে গোলাপীকে দেখে। তখন নতুন যৌবন, হাতেও কাঁচা পয়সা। গোলাপীর তখন বয়স

ষোলো-সতেরো রূপ দেখিয়া রাস্তার লোক চমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়। গোলাপীর মা-র হাতে বছরে বছরে মোটা টাকা জমে। কৃষ্ণলাল সেই হইতেই নবীন কুণ্ডু লেনের নৈশ অধিবাসী। কত কালের কথা। —গোলাপীর ঘরে মেহগনি কাঠের দেরাজ হইল, ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত বড় বিলাতি কাচ-বসানো আয়না হইল, সেকালে প্রচলিত ম্যাকাসার অয়েলের শিশির পর শিশি ভিড় জমাইয়া তুলিল—বাতায়ন মালতী ফুলের টবে সজ্জিত হইয়া বাড়ির অন্যান্য ঘরের অধিবাসীদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিল।

কাঁচা পয়সা কৃষ্ণলালের হাতে। প্রতিদিনের আয় তিন টাকা আড়াই টাকার নীচে নয়।

একদিন গোলাপীর মা অভিমানের সুরে বলিল—যাই বলো বাপু, গোলাপী আমায় প্রায়ই বলে, একখানা বাড়ি তার নিজের না হলে চলে না আর—তা তেমন কপাল কি—এই এক বাড়িতে ছত্রিশ জনার সঙ্গে—

—কেন মা? তার ভাবনা কি? কালই ঘর দেখে দিচ্চি—

—কত টাকা ভাড়ার মধ্যে হবে বলো—এই আমাদের পাড়াতেই আছে—

—যা তুমি বলবে। কুড়ি কি পঁচিশ—

—ত্রিশ টাকায় একখানা ভালো বাড়ি এ পাড়াতেই আছে—তাহলে তাই না হয়—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—এ আমায় জিজ্ঞেস করতে হয় মা?

গোলাপীরা নতুন বাড়িতে উঠিয়া আসিল। বড় পাঁচী বলিল—ওলো, একটু রয়ে-সয়ে নিস—দেখিস যেন আবার দড়ি না ছেঁড়ে—খুব বরাত তোর যাহোক গোলাপী। আর আমাদের ওই বুড়ো রায়বাবু রোজ আসেন আর বাঁধানো দাঁত জলের গেলাসে খুলে রাখেন—ক-দিন বললাম একখানা ঢাকাই শাড়ি, আর একটা বাজা-ঘড়ি দাও দেওয়ালে টাঙানোর, তা বুড়ো মড়া আজ সাত মাস ঘুরুচ্চে—আজ এলে হয় একবার—ও দাঁত খুলে জলের গেলাসে ডুবিয়ে রাখা বের করে দেবো—

শুধু বাড়ি? গোলাপীর টেবিল-হারমোনিয়ম হইল, জোড়া জোড়া শাড়ি, চেয়ার, এমন কি শেষে কলের গান পর্যন্ত। কোন্ সুখ গোলাপীর বাকি ছিল? প্রতি রবিবারে কৃষ্ণলালের সঙ্গে গাড়ি করিয়া (অবশ্য ঘোড়ার গাড়ি) কালীঘাটে গঙ্গাস্নান ও দেবীদর্শন করিতে যাওয়া তাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বছরের পর বছর কাটিয়া গেল।

গোলাপী আর কৃষ্ণলাল, কৃষ্ণলাল আর গোলাপী।

ইতিমধ্যে গোলাপীকে সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিতা দেখিয়া তাহার মা একদিন নবীন কুণ্ডু লেনের মায়া কাটাইয়া বোধ হয় উর্বশী বা তিলোত্তমালোকে প্রস্থান করিল। অমন জাঁকের শ্রাদ্ধ এ অঞ্চলে কেহ দেখে নাই এর আগে।

ক্রমে ক্রমে গোলাপীর যৌবনে ভাঁটা পড়িল। কৃষ্ণলালেরও আয়ের অঙ্ক কমিতে লাগিল। দত্তপুকুরের তেলের অনুকরণে শত শত বাতের তেল বাজারে বাহির হইল—রেলগাড়ির কামরাও নিত্যনূতন ক্যানভাসারে ভরিয়া গেল। যা ছিল কৃষ্ণলালের একার—তাহার মধ্যে অনেক ভাগ বসিল। পূর্বের সচ্ছলতা কমিতে লাগিল।

তারপর দশ-বারো বছর কাটিয়া গিয়াছে।

এই দশ-বারো বছরে সুন্দরী গোলাপী কুরূপা প্রৌঢ়াতে পরিবর্তিত হইয়াছে—তাহার সে বাড়ি চলিয়া গিয়া আবার সাত-আটটি নানা বয়সের সঙ্গিনীর সঙ্গে অন্য বাড়িতে থাকিতে হয়। তবুও কৃষ্ণলালের যাহা কিছু উপার্জন, এইখানেই তাহার সদ্ব্যয়। গোলাপীও তাহা বোঝে—এই ত্রিশ বছরের মধ্যে সে কৃষ্ণলালকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় নাই।

কৃষ্ণলাল বলিল—গোলাপী, চাকরিটা গেল।

গোলাপী বিস্ময়ের সুরে বলিল—সে কি গা!

—বড়বাবু রাগ করেচে, কাল ক্যাশ জমা দিইনি বলে।

—কি করলে সে টাকা?

—খরচ হয়ে গেল।

—কোথায় খরচ হয়ে গেল—কিসে খরচ হয়ে গেল? তোমার এখনও দোষ গেল না তা ওরা কি করে রাখে তোমায়? কাল কোথায় গিয়েছিলে?

—সে খরচ নয় গোলাপী। দক্ষিণেশ্বর সেদিন যাওয়ার দরুন দেনা ছিল মনে নেই? কাবুলীর কাছ থেকে টাকা নিইনি? রাত দশটার পরে ইস্টিশনের গেটে আমায় ধরেচে। রুপী দেও। শেষে ভাবলাম কি ছোরা মারবে না কি? ভয়ে পড়ে দিয়ে দিলাম টাকা। কাবুলীর দেনা, ও হজম করা কঠিন।

—তা নেও, বেশ হয়েচে। এখন খাওয়া হয়েচে, না হয়নি? আমার অদেষ্টে ঝি-গিরি নাচচে সে তো দেখতে পাচ্চি। তখন বন্নু, পাড়াগাঁয়ের দিকে চলো—কোথাও একখানা ঘরদোর বেঁধে দুজনে থাকা যাবে—তা না, তোমার বাপু কলকেতা আর কলকেতা। কলকেতা ছেড়ে আমি থাকতে পারবোনি। এখন থাকো কলকেতায়! কে এখানে খাওয়ায় দেখি!

—জুটে যাবে, এখানেই জুটে যাবে। অত ভাবনার কারণ নেই—

—তোমার এ বুড়ো বয়সে চাকরি নিয়ে তোমার জন্যে বসে আছে! এখন আর কি তোমার হাত্ত পা নেড়ে বক্তিমে করবার গতর আছে নাকি?

—দেখিয়ে দেবো গোলাপী, দেখবি? ভদ্রমহোদয়গণ, এই সেই বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম দত্তপুকুরের বাতের তেল—ইহা ব্যবহারে সর্বপ্রকার বাত-বেদনা, মাথাধরা, দাঁত কনকনানি, কাউর, ছুলি, কাটা ঘা, পোড়া ঘা—

গোলাপী হাসিতে হাসিতে বলিল—থাক গো গোসাঁই, আর বিদ্যে দেখাতে হবে না...সবাই জানে তুমি খুব ভালো বক্তিমে দিতে পারো—আহা, কি হাত পা নাড়ার ছিরি! যেন থিয়েটারের এ্যাক্টো করচেন!

—তাহলে বল চাকরিতে নেবে কি না?

—নেবে না আবার? একশোবার নেবে। আমি যাই এখন ঝি-গিরি করে নিজের পেট চালাবার চেষ্টা দেখি—নিজেই খেতে পাবে না তা আমায় আর খাওয়াবে কোত্থেকে! কী অদেষ্ট যে নিয়ে এসেছিলাম!

কৃষ্ণলাল চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া গোলাপী বলিল—বসো, দুটো মুড়িটুড়ি মেখে দি—খেয়ে একটু চা খেয়ে যাও—

অগত্যা কৃষ্ণলাল বসিল। বলিল—তাহলে বক্তৃতা এখনও দিতে পারি, কি বলো?

—নেও, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। দিতে পারো তো—সত্যি কথা যদি বলি তবে তো পায়া ভারী হয়ে যাবে।

—কি বলো না গোলাপী, বলতেই হবে।

—তোমার মতো অমন কারো হয় না, আমি তো কতই দেখলাম দাঁতের মাজনের ওষুধের ফিরিওয়ালা—আমাদের এই গলির মুখে হারমোনিয়াম গলায় বেঁধে নাচে, বক্তিমে দেয় পোড়ারমুখোরা—কিন্তু সে সব ফিরিওয়ালা তোমার মতো নয়—

কৃষ্ণলাল রাগের সুরে বাধা দিয়া বলিল—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তোকে নিয়ে আর পারিনে দেখচি—তারা হল ফিরিওয়ালা—আমরা হলুম ক্যানভাসার —হারমোনিয়াম পিঠে বেঁধে যারা গান গেয়ে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নেচে বেড়ায়, আমরা কি সেই দলের? অপমান হয়, ওকথা আমাদের বলো না।

—যাক যাক, ভুল হয়েচে, তুমি এখন ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে বসে চা খেয়ে নেও।

গোলাপীর মন আজ বেশ খুশি। কতদিন পরে যেন যুবক কৃষ্ণলালের অঙ্গভঙ্গি ও সুন্দর সতেজ গলার স্বর সে আবার শুনিল। ত্রিশ বৎসরের অন্ধকার কালো ছেঁড়া পর্দাটা কে যেন টানিয়া সরাইয়া দিল।

সে যত্ন করিয়া কৃষ্ণলালকে খাওয়াইল—কৃষ্ণলাল বিদায় লইয়া যখন আসে তখন বলিল—একটা কথা বলি শোনো। যদি খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট হয়, তবে আমার কাছে এসে অবিশ্যি খেয়ে যাবে। এই বেদ্দবয়েসে না খেলে শরীর থাকবে কেন? আমায় কিছু দিতে হবে না এখন। ওই সোনারবেনেদের ঠাকুরবাড়িতে একটা ঝিয়ের

দরকার, সকাল-সন্ধে কাজ করব—আমি কাল থেকে সেখানে কাজে লেগে যাবো—তা তোমায় বলাও যা না বলাও তাই—তুমি কি আসবে? তোমায় আমি চিনি কিনা!

কৃষ্ণলাল হাসিয়া বলিল—ভালোই তো। তোর রোজগারে এইবার খাই দিনকতক—সে সাধ আমার আছে অনেকদিন থেকেই। আচ্ছা তাহলে এখন আসি, ওবেলা হয়তো আসবো—সন্ধের পর।

তাহার পর এক মাস কাটিয়া যায়। কিন্তু গোলাপীর বাড়ি কৃষ্ণলাল আর আসিল না। সুখের দিনে গোলাপীকে সে অনেক দিয়াছে—এখন দুঃখের দিনে বসিয়া বসিয়া গোলাপীর অন্ন ধ্বংস করিবে তেমন বংশে জন্ম নয় কৃষ্ণলালের। বিশেষত দেখিতে হইবে, গোলাপীও প্রৌঢ়া—ঝি-গিরি ভিন্ন এখন আর তার কোনো উপায় নাই।

মেসের ভাড়া বকি পড়িয়াছিল দুমাসের, মেসের অধ্যক্ষ কৃষ্ণলালকে ডাকিয়া বলিল—কি কৃষ্ণবাবু, আমাদের রেন্টটা কি হবে?

—আজ্ঞে ক্ষেত্রবাবু, দেখতেই তো পাচ্চেন—চাকরিটা গেল, হাতে কিছু নেই। এ অবস্থায়—

—ফি-মাসে আমি পকেট থেকে ঘরভাড়া যোগাবো কোথা থেকে সেটাও তো দেখতে হবে! দুদিন সময় নিন—তারপর আপনি দয়া করে সিট ছেড়ে দিন, আমি অন্য ব্যবস্থা দেখি।

কৃষ্ণলাল পড়িল মহা বিপদে। একে খাইবার পয়সা নাই—তাহার উপর মাথা গুঁজিবার যে জায়গাটুকু ছিল, তাহাও তো আর থাকে না। তিনদিন কাটিয়া গেল, দু-একটি পূর্ব-পরিচিত বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া দু-চার আনা ধার লইয়া পাইস হোটেলের ডাল-ভাতে কোনোরকমে ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া এই তিনদিন কাটাইল। কিন্তু তিনদিন পরে তাহার সত্যই অনাহার শুরু হইল। দু-পয়সার ছাতু বা মুড়ি সারাদিনে—শুধু ছাতু, একটু গুড় বা চিনি জোটে না তাহার সঙ্গে। তাহার পর পেট পুরিয়া জল, কলের নির্মল জল।

মেসের ম্যানেজার আবার ডাক দিলেন—বলিলেন—কিছু হল?

—আজ্ঞে এখনো—এই ভাবচি—

—আমার লোক এসে গিয়েচে—কাল মাসের পয়লা। দু-মাসের ভাড়া পকেট থেকে দিয়েচি—এ মাসেরও দিতে হবে। আমিও ছা-পোষা মানুষ মশাই—কত লোকসান হজম করি বলুন? আপনি জিনিসপত্তর নিয়ে চলে যান—আমার ভাড়ার দরকার নেই।

পরদিন সকালেই জিনিসপত্র সমেত (একটা টিনের ট্রাঙ্ক ও একটি ময়লা বিছানা)

কৃষ্ণলালকে পথে দাঁড়াইতে হইল। বর্ষাকাল। জিনিসপত্র রাখিবার মতো জায়গা কোথায় পাওয়া যায়? গোলাপী অনেকবার মেসে খবর লইয়াছে—মধ্যে একদিন দু-ঘন্টা মেসের বাহিরের ফুটপাতে বসিয়াছিল তাহার অপেক্ষায় (কারণ ম্যানেজার তাহাকে চেনে, মেসে কুচরিত্রা স্ত্রীলোক ঢুকিতে দিবে না)—কৃষ্ণলাল দূর হইতে দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এখন গোলাপীর বাড়ি গেলে সে কান্নাকাটি করিবে, আটকাইয়া রাখিতে চাহিবে। নতুবা সেখানে জিনিসপত্র রাখা চলিত।

মেস হইতে কিছু দূরে বড় রাস্তার উপর একটা চায়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে কৃষ্ণলালের পরিচয় ছিল। বলিয়া-কহিয়া সেখানে কৃষ্ণলালের জিনিসপত্র আপাতত রাখিয়া দিল। তাহার পর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দেখিল সে গঙ্গার ধারে আহিরিটোলার স্টিমার ঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে।

সকাল হইতে কিছু খাওয়া হয় নাই। ঘাটের ধারে একটা গাছতলায় হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালা ভুট্টা পোড়াইতেছে। কৃষ্ণলাল এক পয়সার একটা ভুট্টা কিনিয়া জলের ধারে বসিয়া সেটি পরম তৃপ্তির সহিত খাইল।

একটা বিড়ি পাইলে হইত এই সময়...

এই সময় একটি ছোকরা ব্যাগ-হাতে আসিয়া তাহার পাশে ব্যাগটি নামাইয়া পকেট হইতে ঝাড়ন বাহির করিয়া সিমেন্ট-বাঁধানো রানার উপর পাতিল। বসিতে যাইবে, এমন সময় ছোকরা পকেটে হাত দিয়া কি দেখিয়া একবার চারিদিকে চাহিল এবং কাছেই কৃষ্ণলালকে দেখিয়া বলিল—একটু দয়া করে ব্যাগটা দেখবেন? এক পয়সার বিড়ি কিনে আনি—

বিড়ি কিনিয়া আনিয়া সে কৃষ্ণলালকে একটি বিড়ি দিল। কৃষ্ণলাল আগেই আন্দাজ করিয়াছিল, ছোকরা একজন ক্যানভাসার। এখন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি বুঝি ক্যানভাস করেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—কি জিনিস?

—হাতকাটা তেল—সার্জিক্যাল মলম—

—বেশ পাওয়া যায়? কমিশন কেমন?

—ভালোই। খদ্দেরকে হাত কেটে দেখাতে—সঙ্গে ছুরি থাকে—এই যে—

ছোকরা জামার আস্তিন গুটাইয়া দেখাইল—কব্জি হইতে কনুই পর্যন্ত হাতের সমস্ত অংশটা ছুরি দিয়া ফালা-ফালা করিয়া চেরা। কৃষ্ণলাল শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—এ কি! লাগে না?

ছোকরা হাসিয়া বলিল—লাগে—আবার মলম লাগালে সেরে যায়।

—কি রকম আয় করেন?

—চব্বিশ টাকা থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা মাসে।

কৃষ্ণলালের মন বেজায় দমিয়া গেল। এত কাণ্ড করিয়া ত্রিশ টাকা! অথচ এমন সময় গিয়াছে—যখন দত্তপুকুরের বাতের তেল ফিরি করিয়া সে মাসে ষাট-সত্তর টাকা অনায়াসে রোজগার করিয়াছে—তাহার জন্য নিজের হাত ছুরি দিয়া ফালা-ফালা করিয়া কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই।

ক্যানভাসারের কাজে আর সুখ নাই। আর সে এ কাজ করিবে না।

পরদিন কৃষ্ণলাল কলিকাতা ছাড়িয়া স্বগ্রামে রওনা হইল। বসিরহাট স্টেশনে নামিয়া সাত ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার পৈতৃক গ্রাম ইলশেখালি পৌঁছিতে তিনটা বাজিল। গ্রামে তাহার দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি ছাড়া অন্য কেহ আপনার জন নাই—নিজের পৈতৃক ভিটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। বহুদিন এদিকে আসে নাই, দেখাশোনাও করে নাই—খড়ের ঘর কতদিন টেকে? আজ প্রায় সতেরো - আঠারো বছর পূর্বে দু-পাঁচ দিনের জন্য একবার পিসিমার শ্রাদ্ধে গ্রামে আসিয়াছিল। সেই আর এই।

জ্ঞাতিরা অবশ্য কৃষ্ণলালকে জায়গা দিল। কিন্তু কিছুদিন থাকিয়া কৃষ্ণলালের কেমন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। গ্রামে তাহার মন টেকে না। কখনও সে দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রামে বাস করে নাই এখানকার লোকে কথাবার্তা বলিতে জানে না, ভালো করিয়া মিশিতে জানে না, চা খায় না। কলিকাতায় রাস্তার ভিখারিও চা খায়। তাহার উপর এই পাড়াগাঁয়ে যেমন জলকাদা, তেমনি জঙ্গল—রাত্রে মশার উৎপাতে নিদ্রা হয় না। এর মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রায় সকল বাড়িতেই দেখা দিয়াছে।

না, এখানে মন টেকে না। কৃষ্ণলাল চেষ্টা করিয়া দেখিল—এখানে সবাই যেন সারাদিন ঘুমাইয়া আছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইহারা চড়কতলার ক্ষুদ্র মাঠে বেলতলায় বসিয়া হুঁকা হাতে আড্ডা দেয়, পরচর্চা করে। কোনো কাজ নাই অথচ দুপুরে ভাত দু-টি মুখে দিতে-না-দিতে এদের চোখ ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে। দিবানিদ্রা চলে বেলা চারিটা পর্যন্ত—তারপর ঘুম হইতে রক্তবর্ণ চোখে উঠিয়া কেহ বা বাজারে দু-পয়সার সওদা করিতে যায়—সেখানেও আবার আড্ডা...এ-দোকানে ও-দোকানে বসিয়া তামাক খাওয়া...চার পয়সার সওদা করিতে তিন ঘন্টা লাগাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি আসে। তারপরই আহার ও নিদ্রা। কেরোসিন তেলের দাম চড়িয়া গিয়াছে—তেল খরচ করিয়া আলো জ্বালাইয়া রাখিতে কেহ রাজী নয়। কয়েক বাড়ি যাও—অন্ধকারে বসিয়া দু-একটা কথা বলো, গল্প করো—এক-আধ কল্কে তামাক খাও—তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া আবার বিছানা আশ্রয় কর। দিন শেষ হইয়া গেল।

কৃষ্ণলাল এরকম জীবনে অভ্যস্ত নয়। এ কি জীবন? অথচ সকলেই বলিবে, দাদা,

সংসার আর চলে না, বড় কষ্ট। কষ্ট ঘুচাইবার চেষ্টা কোথায়? আজ দীর্ঘ পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরিয়া যার কলিকাতায় ভীষণ কর্মব্যস্ত জীবন কাটিয়াছে, এ ধরনের অলস, শ্রমবিমুখ জীবনের ধারণাই করিতে পারে না সে।

সকালে উঠিয়াই নীচের তলার কলে স্নান সারিয়া লইতে হইত। খুব ভোরে স্নান না সারিলে এমন ভিড় জমিয়া যাইবে কলে যে, আর স্নান করা চলিবে না। নীচের তলায় সেকরার দোকানের লোকেরা, শালওয়ালা, দরজি, পুব দিকের ঘরে যে মুটেরা থাকে সবাই আসিয়া কলে ভিড় লাগাইয়া দিবে, ইহার পর আসিবে একদল বালতি হাতে জল ধরিতে ও চাউল ধুইতে। সারি সারি লোক দাঁড়াইয়া যাইবে কলসী হাতে জল ভরিতে। ওপরে তিন তলায় তিনটি মেসের চাকরেরা। সকলেই কর্মব্যস্ত, ঘড়ি ধরিয়া কাজ কলিকাতায়, 'সময় গেল। ছ-টা বাজে কখন কি হবে?' দিন আরম্ভ হইয়াছে...এখনি বাবুরা আসিয়া ভাত চাহিবে আটটা বাজিতে-না-বাজিতে, একটুকু দেরি করিলে চলিবে না।

স্নান সারিয়া কৃষ্ণলাল ব্যাগ হাতে বাহির হইত শেয়ালদ' স্টেশনে, প্রথমেই সাতটা দশ বারাসাত, সাতটা পঁচিশ নৈহাটি, পৌনে আটটা রাণাঘাট প্যাসেঞ্জার, সাড়ে আটটা বনগাঁ লোকাল, আটটা পঞ্চাশ দত্তপুকুর, ন'টা দশ কেষ্টনগর লোকাল...শুরু হইয়া গেল দিনের কাজ। বাতের তেল! বাতের তেল! দত্তপুকুরের বাতের তেল! যত প্রকার বাত, ফুলা, শূলানি, কনকনানি, মাথা ধরা, পেট বেদনা, ইহার একমাত্র ব্যবহারে ...ভদ্রমহোদয়গণ, এই ওষুধটি আজ ত্রিশ বছর যাবৎ এই লাইনে সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে—এই চলিল বেলা বারোটা পর্যন্ত। বারোটা পঞ্চান্ন শান্তিপুর ছাড়িয়া গেলে তবে সকালের কাজ মিটিল। কী জীবন! কী আনন্দ! কী পয়সা রোজগার! কাঁচা পয়সা রোজ আসে, রোজ সন্ধ্যায় উড়িয়া যায়, যে পয়সা আয় করিতে জানে, সেই জানে খরচ করিতে, ইহাতে ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণলাল আরও মাসখানেক কোনোরকমে কাটাইল।

আর চলে না। এ অলস জীবন তাহার অসহ্য, কখনো পা গুটাইয়া কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এভাবে সে থাকে নাই। বেশিদিন এভাবে থাকিলে সে পাগল হইয়া যাইবে, নয়তো মরিয়া যাইবে।

কিন্তু কলিকাতায় গিয়া সে খাইবে কি? কোনো উপায় তো দেখা যাইতেছে না। ইন্ডিয়ান ড্রাগ সিন্ডিকেটে আর চাকরি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবুও একবার বসু মহাশয়কে গিয়া ধরিয়া দেখিলে কেমন হয়? কিছু যদি না জোটে, তবে আহিরিটোলার ঘাটে সেই হাতকাটা তেলের ক্যানভাসার ছোকরার সঙ্গে দেখা করিয়া...তবে ছুরি দিয়া নিজের হাতটা ফালা-ফালা করিয়া কাটা—এ বৃদ্ধ বয়সে, ক্যানভাসারের চাকরির মতো

সম্মানের চাকরি, আরামের চাকরি আর নাই, কিন্তু হাত কাটিয়া দেখাইয়া জিনিস বিক্রয় করা? ওতে মানসম্ভ্রম থাকে না।

এভাবে গ্রামে বসিয়া থাকা জীবন নয়। চিরকাল কাজের মধ্যে থাকিয়া আজ বাঁচিয়া মরিয়া থাকা তাহার পোষাইবে না। গ্রামেও তো হাওয়া খাইয়া জীবন ধারণ করা যায় না—কেহ কেহ তাহাকে সামনের বছর দু-এক বিঘা ধান করিতে পরামর্শ দিল—কেহ বলিল, ডোবার ধারে জমিটা পড়ে আছে কেষ্ট খুড়ো, তোমারই পৈতৃক জমি, এই শীতকালে মানকচু লাগাও ওটাতে, তবু হাটে হাটে ঘুরে কিছু ঘরে আসবে, সামনের শীতকাল লাগাৎ—কৃষ্ণলালের হাসি পায়।

কলিকাতার রোজগার যে কি ধরনের, সেখানে ক্যানভাসারের কাজে মাসে যে টাকা এক সময় তাহার আয় ছিল, এখানে গোটা বছর কচু, কুমড়া বেচিয়াও যে সে আয় হওয়া অসম্ভব—এই মূর্খ, অর্বাচীনেরা তাহা কি করিয়া বুঝিবে?

অবশেষে সে একদিন বাক্স বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় আসিয়া হাজির হইল।

বাঁচিতে হয় তো ভাল করিয়াই সে বাঁচিবে।

ট্রেনে পুরানো ক্যানভাসারদের সঙ্গে দেখা। নবশক্তি ঔষধালয়, কবিরাজ অনঙ্গ মোহন দেব, বিশ্বাস কোম্পানি, ইন্ডিয়ান ড্রাগ সিন্ডিকেট প্রভৃতি ফার্মের লোক সব। সবাই জানে, সবাই খাতির করে!

—আরে, এই যে কেষ্টদা, আজকাল আর দেখিনে যে?

—কেষ্টদা, কোত্থেকে? বিয়ে-থাওয়া করলেন নাকি এ বয়সে?

—আজকাল কোন্ কোম্পানিতে আছেন কেষ্টদা? দেখিনে ট্রেনে আর?

—জমিজমা দেখতে গেছলে ভায়া? তা দেখবেই তো, থাকলেই দেখে —আমাদের কোনো চুলোয় কিছু নেই, যা করে এই বিশ্বাস কোম্পানি. হিংসে হয় তোমায় দেখে, দু-শো টাকা বছরে আয়ের সম্পত্তি! বলো কি! তবে তো তুমি—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কৃষ্ণলালকে এ বিড়ি দেয়, ও পানের কৌটা খুলিয়া সামনে ধরে। পুরাতন বন্ধুর দল। ইহাদের ফেলিয়া সে এতকাল ঘুমন্ত পুরীতে কাল কাটাইল যে কি ভাবিয়া? এখানে কাজ আছে, আমোদ আছে, পয়সা রোজগার আছে, তারপর ইয়ে আছে। আর সে কোথাও যাইবে না কলিকাতা ছাড়িয়া, মরিতে হয় এখানেই মরিবে।

পনরো-বিশ দিন এখানে-ওখানে হাঁটাহাঁটি করিয়াও কিন্তু চাকরি মিলিল না। বসু মহাশয় ঝাড়া জবাব দিলেন। এখন সুশ্রী চেহারার ছোকরা ক্যানভাসার—বেশ লম্বা জুলপি, ঘাড় বাহির করিয়া চুল ছাঁটা, লপেটা জুতা পায়ে, থিয়েটারের রামের মতো গলা, এই সবাই চায়। বয়স হইয়া গেলে, মানে, এখন উঁহাদের লোক আছে, দরকার

হইলে চিঠি লিখিয়া জানাইবেন পরে।

পুরোনো মেসেই উঠিয়াছিল, বারান্দাতে আছে। গোলাপীর সঙ্গে দেখা করে নাই। এখন করিতে চাহেও না সে। অনাহারে দু-দিন কাটিল মধ্যে। অবশেষে একদিন আহিরিটোলার ঘাটেই গিয়া হাজির হইল, যদি হাতকাটা তেলওয়ালা সেই ছোকরার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। সে সাড়ে বারোটার স্টিমারে রোজ বালি হইতে আসে বলিয়াছিল। সাত-আট দিন ক্রমাগত ঘুরিয়াও কিন্তু ছোকরার দেখা মিলিল না। কৃষ্ণলালের দুঃখ শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর চলে না। আচ্ছা, সে ক্যানভাসারি ভুলিয়া যাইতেছে না তো? আজ কতদিন চাকুরি নাই। কতদিন বক্তৃতা দিবার অভ্যাস নাই। চর্চা-অভাবে শেষে কিনা ছোকরা ক্যানভাসারেরা তাহাকে—কৃষ্ণলালকে ছাড়াইয়া যাইবে!

সেদিন কৃষ্ণলাল নিজের টিনের ছোট সুটকেসটি হাতে লইয়া ডালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে দাঁড়াইয়া হাত পা নাড়িয়া ক্যানভাসারের বক্তৃতা জুড়িয়া দিল, চর্চা রাখা দরকার তো বটেই, তা ছাড়া সে নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়, খরিদ্দার জুটে কি না সে একবার দেখিবে। এখনও তাহার যে গলা আছে, থিয়েটারেব রামের মতো গলাওয়ালা কোন্ ছোকরা ক্যানভাসার তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবে, সে দেখিতে চায়। দত্তপুকুরের বাতের তেল! ব্যবহারে সর্বপ্রকার বাত, বেদনা, মাথা ধরা, দাঁত শূলানি, হাত বেদনা, পিঠ বেদনা...ভদ্রমহোদয়গণ! এই ঔষধটি আজ ত্রিশ বছর ধরিয়া এই লালদীঘির মোড়ে...

কৃষ্ণলাল মিনিট পাঁচ-ছয় পরে সগর্বে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল। বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। একজন ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিয়া বলিল—আমায় একটা ছোট ফাইল—

কৃষ্ণলাল গম্ভীরভাবে বলিল—আমার কাছে ওষুধ নেই—আমি বসু ইন্ডিয়ান ড্রাগ সিন্ডিকেটের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের লোক, যাঁদের দরকার হবে, তাঁরা ১০৬সি, হরিধন পোদ্দারের লেনে বসু ইন্ডিয়ান ড্রাগ সিন্ডিকেটের অফিসে...আমার নামের এই স্লিপটা নিয়ে যান দয়া করে, টাকায় চার আনা কমিশন পাবেন—দাঁড়ান লিখে দিচ্চি—

দিন পাঁচ-ছয় কাটিল। কৃষ্ণলালের নেশা লাগিয়া গিয়াছে। সে বেলা তিনটার সময় রোজ সুটকেস হাতে ঝুলাইয়া ডালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে গিয়া বক্তৃতা জুড়িয়া দেয়। অফিস-ফেরতা লোকেরা ভিড় করিয়া শুনে।

সেদিন কৃষ্ণলাল দাঁড়াইয়া দত্তপুকুরের বাতের তেলের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক ভিড় ঠেলিয়া একেবারে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণলাল চমকিয়া উঠিল, বসু ড্রাগ সিন্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু মহাশয় স্বয়ং!

বসু মহাশয় কৃষ্ণলালের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, শুনুন একবার এদিকে—

কৃষ্ণলাল ভিড়ের পাশ কাটাইয়া কিছু দূরে বসু মহাশয়ের সঙ্গে গিয়া অপ্রতিভের মতো দাঁড়াইল; বসু মহাশয় বলিলেন, এ কি হচ্চে?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মতো মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—আজ্ঞে, আজ্ঞে, একবার চর্চাটা রাখচি, নইলে—

বসু মহাশয় বলিলেন, তাইতো বলি এ কি কাণ্ড! গত দিন পাঁচ-ছয়ের মধ্যে অফিসে আপনার নামের স্লিপ নিয়ে বোধ হয় একশো কি দেড়শো খদ্দের গিয়েছে। এত ওষুধ বিক্রি গত ক-মাসের মধ্যে হয়নি। একে তো এই ডাল সিজন যাচ্ছে, আমি তো অবাক ; সবাই বলে, লালদীঘির মোড়ে আপনাদের পাবলিসিটি অফিসার, তাঁরই মুখে শুনে...আমি বলি,আজ নিজে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখি তো নিজের চোখে। তা আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েচি আপনার এরকম কাজে—

কৃষ্ণলাল বিনীতভাবে বলিল, আজ্ঞে, ভাবলাম ছোকরা ক্যানভাসারদের মতো থিয়েটারি রামের গলা কোথায় পাবো—তবুও একবার দেখি দিকি—

বসু মহাশয় বলিলেন, শুনুন। ওসব থাক। আপনি আজই আপিসে আসুন এক্ষুনি। আপনাকে আজ থেকে হেড ক্যানভাসার অ্যাপয়েন্ট করলাম। ষাট টাকা মাইনে পাবেন আর কমিশন, শুধু তদারক করে বেড়াবেন কে কেমন কাজ করচে, আর ছোকরাদের একটু তালিম দিয়ে দেবেন, বুঝলেন না? আসুন চলে আমার গাড়িতে—

সন্ধ্যাবেলা। ...নবীন কুণ্ডু লেনে খোলার ঘরের সংকীর্ণ রোয়াকে গোলাপী ক্যানেস্ত্রাকাটা তোলা উনুনে আঁচ দিয়া প্রাণপণে পাখার বাতাস করিতেছে, এমন সময় বাহিরে কে পরিচিত গলায় ডাকিল—গোলাপী, ও গোলাপী, বাইরে এসে জিনিসগুলো ধরো দিকি। হাত ভেঙে গিয়েচে—

পারমিট

আজই সেই আশ্চর্য ব্যাপারটি আমার জীবনে ঘটেচে।

এমন সব অত্যাশ্চর্য কাণ্ডও মানুষের জীবনে ঘটে যায়! বিশ্বাস করতে পারছিলাম

না। এখনও ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়চি এক-একবার...

ভাদ্রের ভরা নদী। উভয় তীরের বনভূমির শাখা প্রশাখা জলের ওপর নত হয়ে আছে, এক এক জায়গায় জলমগ্ন নল-খাগড়ার বন নদীর স্রোতোবেগে থরথর করে কাঁপচে। এমনি এক স্থানে জলের ওপর কলমি শাকের দাম দেখে নৌকোর মাঝি সয়ারাম শাক তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো নৌকো থামিয়ে। আমার সঙ্গী নকুড় চক্কত্তি তাকে বকচে—সন্দে হবে, ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে শাক তুলতে যেও না।

নৌকো থেমে দাঁড়িয়ে জলের আবর্তে পাক খাচ্চে।

নকুড় চক্কত্তি বললে—একটা বিড়ি খাওয়া যাক, কি বলো হে?

আমার ওসব দিকে তত মন ছিল না। তবুও কলের পুতুলের মতো ওর হাত থেকে বিড়ি নিয়ে ধরালুম। নকুড় চক্কত্তি জলের ধারের ধানগুলো সম্বন্ধে কি যেন বলচে। একবার সে বললে—যাক, একটা কাজের মতো কাজ হয়েচে। ধানটা খুব জোর পাওয়া গিয়েচে। তুমি না গেলে হাকিম কি ধান দিত? হাকিমের স্ত্রী তোমায় চেনে নাকি? ও না থাকলে আজ ধান হত, না ছাই হত!

আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম—হ্যাঁ।

গল্পে এমন ঘটনা অনেক পড়া গিয়েচে—কিন্তু বাস্তব জীবনে কটা ঘটে তাই ভাবচি। একটাও না, অথচ সন্দে পড়লে হয়তো মনে হবে, এমন গল্প অনেক পড়া গিয়েচে। জীবনের অলিখিত কাব্যে কত অধ্যায় কত ঘটনা—এর পাঠক কে না, যে সে-জীবন যাপন করচে। বহির্দেশে দণ্ডায়মান বিরাট জনতা উৎসুক শ্রোতা হতে পারে, দর্শক হতে পারে কিন্তু রসিক সমঝদার নামমাত্র, তার বেশি নয়।

বাগজোলার খালের মধ্যে দিয়ে জলের তোড় মাঠের দিক দিয়ে দু-ধারের ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এসে নদীতে পড়চে। জলের তোড়ে একটা প্রকাণ্ড জগডুমুর গাছ শেকড় ছিঁড়ে জলে ঝুঁকে পড়ে আছে। নকুড় চক্কত্তি বললে — দ্যাখ তো বাবা সয়ারাম, গাছটাতে যদি কচি কচি ডুমুর পাওয়া যায়। নৌকোটা একটু থামিয়ে পাড় দিকি দু-টো—তরিতরকারির যা দাম, তবুও দুটো ডুমুর নিয়ে গেলে কাজ হবে—ধানটা পেয়ে বড্ড সুবিধে হয়েছে—কি বলো রামলাল?

আমি বললাম—হ্যাঁ।

—তোমার আজ হয়েচে কি হে? কোনোদিকে যেন মন নেই—

—যা হয়েচে তা হয়েচে, ধান পেয়েচ তো?

—ওঃ—দশ টাকায় এক মণ ধান ; এ না পেলে তোমার আমার মতো লোকের—

নকুড় চক্কত্তির কথাটা আমার মনে লাগলো বটে কিন্তু কথাটা সত্যি, আমাদের মতো অবস্থার লোকের কি অবস্থা হত আজ যদি সুবিধে দরের ধান পাওয়া না যেত?

অথচ আজ নকুড় চক্কত্তি নিজের নামের সঙ্গে আমার নামটা জড়ালে শুনে মনের মধ্যে খচ্ করে উঠলো কোথায়!

অনেক দিন আগের কথা। আমার পিসিমার বাড়ি বামুনহাটি থেকে ফিরে আসছিলাম। আমি কলেজ থেকে বেরিয়েচি চার-পাঁচ বছর, কিন্তু তখনও কলকাতায় থাকি, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই চিরকাল মন। এক মাড়োয়ারি ফার্মে কাজ শিখি। এগারো মাইল রাস্তা মেঠো পথ। হেঁটে আসতে আসতে কাপাসীপাড়ার হাটতলায় বাঁধানো পুকুরের চাতালে বসে একটু বিশ্রাম করচি, এমন সময় খুব ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় দুটি লোককে আমার দিকে আসতে দেখে একটু আশ্চর্য হলাম।

লোক দুটির মধ্যে একজন ভট্চাজ বামুন, মাথায় টিকি, ফর্সা রং, গায়ে সাদা উড়ুনি। অন্য লোকটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের ছোকরা মাত্র। দুজনেই খুব ঘর্মাক্ত, হাঁপাতে-হাঁপাতে যেন অনেক দূর থেকে আসচে। ভট্চাজ মশায় আমার কাছে এসে বললেন—ওঃ, ছুটতে ছুটতে এসে ধরেচি। পাওয়া গিয়েচে শেষকালে। তোমার পিসিমার বাড়ি গিয়ে শুনি তুমি আধ ঘন্টা আগে বেরিয়েচ—তখুনি রমেশকে বললাম, পা চালা রমেশ। ধরতেই হবে পথে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—ব্যাপার কি? আপনারা আমায় খুঁজচেন?

—হ্যাঁ, বাবাজী, হ্যাঁ। দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নিই আগে—

মনে মনে ভাবচি এমন তো কোথাও চুরি বা খুন করে পালাচ্চি নে, তবে এরা এমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমার পেছনে ছোটে কেন? কিন্তু কিছু পরেই ভট্চাজ মশায় আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করলেন। আমায় বললেন—তোমায় এখুনি যেতে হবে বাবাজী। এই পাশেই গ্রাম, সীতানাথবাবুর নাম শোনোনি? এ অঞ্চলের জমিদার। তোমার সঙ্গে তাঁর এক মেয়ের সম্বন্ধ আমি প্রস্তাব করেচি। তুমি এসেচ খবর পেয়ে তোমার পিসিমার বাড়ি দৌড়েছিলাম। এটি আমার ভাইপো—

এতক্ষণে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল বটে, কিন্তু সবটা নয়। বললাম—কিন্তু আমি সেখানে যাবো কেন হঠাৎ?

—মেয়ে দেখতে, মেয়ে দেখতে। তাঁরাই পাঠিয়ে দিয়েছেন আমায়। সীতানাথবাবু বললেন—নিয়ে এসো তাঁকে।

—তিনি কি করে জানলেন আমি পিসিমার বাড়ি গিয়েচি—

—তোমার যাবার দিন আমি তোমাকে দেখেছিলাম বাবাজী। সেদিন হাটে তোমার পিসেমশায়ের সঙ্গে দেখা, তিনি বললেন, তুমি ওখানেই আছ। আমি এসে সীতানাথবাবুকে বলতেই তিনি বললেন, নিয়ে এসো, মেয়ে দেখে যান তিনি।

আমার মনের খট্কা গেল না। কোথাও কিছু ভুল হয়ে থাকবে হয়তো। আমি বিবাহ

করার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠিনি। আমার পিসেমশায়ের বাড়ি দু-বছর পাঁচ বছর অন্তর একবার যাই, তিনিই বা কি করে জানলেন আমি বিয়ে করবো কি না?

হঠাৎ আমার মনে একটা তীব্র কৌতূহল হল। এমনভাবে রাস্তা থেকে ডেকে কেউ আমাকে কখনো মেয়ে দেখাতে নিয়ে যায়নি। সীতানাথবাবু কেমন জমিদার, কেমন তাঁর মেয়ে, এ আমায় দেখতে হবে।

ওরা দুজনে আমায় নিয়ে পাশের এক রাস্তা ধরলে। সে-রাস্তার দুধারে ঘন বাঁশবন, কাপাসীপাড়ার কুম্ভকার পাড়া ছাড়িয়ে একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের মধ্যে অনেক দূরে কাদের একটা সাদা রংয়ের বাড়ি। ভট্চাজ মশায় বললেন—ওই হল রায়েদের বাড়ি—এ অঞ্চলে নামডাক আছে ওদের। বংশও খুব ভালো—নাম শোনোনি?

আমি বিনীতভাবে বললাম, আমার এ অঞ্চলে তত বেশি যাতায়াত নেই। কাজেই অনেক লোকেরই নাম শুনিনি।

একটা সাবেক আমলের বড় বাড়ির সামনে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়িটা দেখেই বুঝলাম এক সময়ে এ বাড়ির মালিকেরা দেশের জমিদার ও শাসক ছিল, যদিও এখন এদের সে অবস্থা নেই। থাকলে রাস্তা থেকে ডেকে এনে আমায় মেয়ে দেখাতো না।

একটি বেশ সুন্দর মতো ছোকরা আমাদের ডাক শুনে বাইরে এল, তারপর এলেন বাড়ির কর্তা স্বয়ং সীতানাথ রায়। আমাদের সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন বৈঠকখানার মধ্যে। খুব বড় সাবেকী বৈঠকখানা, দেওয়ালে বড় বড় হরিণের শিং, ঝাড় লণ্ঠন টাঙানো, বড় বড় পুরানো বিবর্ণ ছবি ভেতরে বাহিরে ঝুলনো। বৈঠকখানার এক পাশের তক্তপোশের ওপর অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র—সেতার, তানপুরা, ডুগিতবলা ইত্যাদি। মনে হল সেগুলো ব্যবহার করবার লোক আছে এ বাড়িতে। বেশ যত্নে তদ্বিরে গুছিয়ে রাখা। এক কোণে আট-দশ গাছা বড় হুইলের ছিপ। ভট্চাজ মশায় আমায় দেখিয়ে বললেন—এই ইনিই, এঁরই নাম রামলাল চাটুয্যে—

এমন কিছু বিখ্যাত লোক আমি নই, অথচ কথার ভাবে মনে হল আমার সম্বন্ধে এঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েচে। সীতানাথবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন—আপনার পিসেমশায় ভবশঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। তিনি আমার সঙ্গে একবার আপনার কথা বলেছিলেন, তখন আপনি কোথায় পশ্চিমে চুনের ব্যবসা করতেন—খুব ব্যবসার ঝোঁক আপনার। এই তো চাই বাঙালির। চাকরি চাকরি করে দেশ উচ্ছন্ন গেল।

বিনীতভাবে বললাম—চুনের ব্যবসা করিনে, করবার চেষ্টায় গিয়েছিলাম বটে।

—কোথায় যেন সেই?

—আজ্ঞে পশ্চিমে, বিন্ধ্যাচলের কাছে। ঘুটিং পাথর কিনে পুড়িয়ে চুন করে,

সেখানে বড় বড় ভাঁটি আছে চুন পোড়ানোর।

—এখন কি করা হয় আপনার?

—বিজনেস করি কলকাতায় এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগে। আমাকে 'আপনি' বলবেন না, আপনি পিসেমশায়ের বন্ধু, আমাকে—

—তাতে কি, তাতে কি বাবাজী? ব্রাহ্মণসন্তান, কুলীনের সন্তান, সব নমস্য। কত বড় কুলীন বংশে আপনারা—

এইবার খানিকটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সীতানাথ রায় মশায় পুরাতনপন্থী লোক, এখনও কৌলীন্য মানেন, আমাদের কুলীন হিসেবে এক সময়ে বেশ নামডাক ছিল বাবা বলতেন। এখন আর ওসব কে মানে বা গ্রাহ্য করে? তবে এই সব অজ পাড়াগাঁয়ে—

সীতানাথ রায় মশায়ের চেহারা আমার খুব ভালো লেগেচে। বেশ লম্বা, দোহারা, ফর্সা চেহারা, মাথার চুল ধবধবে সাদা, মুখশ্রীতে একটা সদানন্দ, উদার অথচ একটু যেন নির্বোধের ভাব। তাতে মানুষকে আরও বেশি আকৃষ্ট করে তাঁর দিকে। আমি নিজে তো ধূর্ত মানুষের চেয়ে নির্বোধ লোক ঢের বেশি পছন্দ করি।

আমায় বললেন—আমার বড্ড আনন্দ হচ্চে আপনি আজ এসেচেন আমার বাড়ি—বিয়ে হোক না-হোক, সে ভবিতব্য। কিন্তু আপনার আসাতেই—

গ্রামের দু-তিনটি ভদ্রলোক, কেউ কোঁচার টিক গায়ে, কেউ একটা আধময়লা পাঞ্জাবি গায়ে, এসে বৈঠকখানায় ঢুকে আমাদের দিকে চেয়ে নমস্কার করে বসলেন অন্যদিকে। রায় মশায় বললেন—ওদিকে কেন, সরে আসুন সরে আসুন—এই ইনিই রামলালবাবু—আলাপ-পরিচয় করুন—

কিন্তু তাঁরা নিতান্ত গ্রাম্য লোক, আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে তাদৃশ সাহস করলেন না বোধ হয়। একটু পরে তাঁদের একজন নিজেই তামাক সেজে টানতে লাগলেন। ভট্চাজ মশায়ও তামাক খাবেন বলে ওদিকে উঠে গেলেন। আমি আর রমেশ এদিকে বসে রইলাম। সীতানাথ রায় মশাই একটু পরে বাড়ির ভেতর থেকে এসে বললেন—চলুন, একটু মিষ্টিমুখ করবেন।—অজ পাড়াগাঁয়ে এইটিই বলা রীতি। একটু শহর ঘেঁষা জায়গা হলে বলতো—চলুন, চা খাবেন।

বৈঠকখানা ছাড়িয়ে খুব বড় একটা হলঘর পার হয়ে ডাইনে বাঁয়ে দু-দিকেই বারান্দাওয়ালা কুঠুরির সারি। অনেকগুলি কুঠুরি, আট-দশটার কম নয়, তারপর আবার খোলা রোয়াক, পুব-পশ্চিমে লম্বা। তারপর চাতাল-বাঁধানো উঠান পার হয়ে ওদিকের আর একটা বড় টানা ঢাকা বারান্দায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। আমি চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলুম। প্রাচীন জমিদারবাড়ি বটে। ভেতরটা আগাগোড়া

চকমেলানো, খুব উঁচু কার্নিশযুক্ত ছাদ—তবে সেকেলে বাড়ি, ছোট ছোট দরজা জানালা।

বারান্দায় আট-দশজন লোকের প্রচুর জলযোগের আয়োজন সজ্জিত ছিল। সীতানাথ রায় মহাশয়ের প্রৌঢ়া গৃহিণী সকলকে লুচি পরিবেশন করলেন—কারণ এখানে বাইরের লোকের মধ্যে এক যা আমিই আছি, আর সবাই এই গ্রামেরই লোক। আমার মনে হল তিনি লুচি পরিবেশনের ছলে আমায় দেখতে এসেচেন এবং বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বার বার দেখচেন।

জলযোগান্তে রায় মশায় আমায় পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমি পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বললেন—এসো বাবা, এসো—

মনে হল ঠিক যেন নিজের মা।

আমায় আর একটি বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন গৃহিণী নিজে। বললেন—বড় কুলীন বংশ, যদি এখন আমার মেয়ের শিবপুজোর জোর থাকে—তোমরা পাঁচজনে আশীর্বাদ করো—

এঁরা আমার সঙ্গে যে অমায়িক, হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করলেন, শুধু এই সব পল্লি গ্রামেই তার তুলনা মেলে। নিজে আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম এঁদের আত্মীয়তায়। জানালা দিয়ে চোখে পড়চে ওঁদের চকমেলানো ছাদের ওপর ঝুঁকে-পড়া নারিকেল বৃক্ষের কম্পমান শাখা-প্রশাখা।

একটু পরে বাইরের ঘরে মেয়ে দেখানো হল।

মেয়ে সুন্দরী না হোক, বেশ দেখতে শুনতে। বড় ঘরের মেয়ে বলে বোধ হয় বটে। সীতানাথ রায় মশায় নিজে যত্ন করে মেয়েকে গান-বাজনা শিখিয়েচেন। বললেন—ভট্‌চাজ মশায়, বিনু মা আমার গান-বাজনা জানে, সেতার বাজাতে পারে—সেটা একটু শুনতে উনি যদি চান—

আমি সলজ্জমুখে চুপ করে রইলাম। ভট্‌চাজ মশায় বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ—বিনু দিদি, ধরো একবার সেতারটা—

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভভাবে গিয়ে বৈঠকখানার ঢালা বিছানায় বসে সেতার বাজালে, সীতানাথ রায় মশায় নিজে ডুগি-তবলা ধরলেন। আমি গান-বাজনা বিশেষ কিছু বুঝিনে, করি কয়লা আর চুনের আড়তদারি, তবুও মনে হল মেয়েটি কাঁচা হাতে সেতার ধরেনি। সেতার নামিয়ে খানিক পরে যখন সে দু'টি গান গাইলে, তখন মেয়েটির কণ্ঠস্বর আমার কাছে বেশ ভালোই লাগলো। তবে, ঐ যে বললুম, ও জিনিসের সমঝদার নই আমি।

সেই অপরাহ্নটি আমার জীবনের এক অদ্ভুত অপরাহ্ন বটে। দূর-সম্পর্কের পিসিমার

বাড়ি থেকে ফিরচি। থাকি কলকাতায়, যখন আসি বাড়িতে কালেভদ্রে, তখন হাঁটাপথে এগারো-বারো মাইল পথ নানা ধরনের পাড়াগাঁ, বিল, বাঁওড়ের মধ্যে দিয়ে যাবার প্রলোভনেই পিসিমার বাড়ি যাই—বিশেষ কোনো আত্মীয়তার টানে নয়।

সেই পথে ফেরবার সময়ে এ যেন এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। কখনো শুনিনি যাদের নাম, তাদের বাড়িতে এসে এমন অমায়িক ব্যবহার পাওয়া আমার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব। এই প্রাচীন জমিদারবাড়ি, ওই ভাঙা পুজোর দালানের কার্নিশে বটচারাটা, জানালার বাইরে ওই গোলার সারি, এই সুগায়িকা মেয়েটি—সব যেন স্বপ্ন। আমি জানি এ-বিয়ে হবে না, বিয়ে করার ইচ্ছেও নেই আমার, থাকলেও উপায় নেই—ব্যবসা-জীবনের সবে আমার শুরু, এখন বিয়ে করে নিজেকে সংসার-জালে জড়িত করতে চাইনে আমি। তা ছাড়া ওঁরা অনেক কিছু ভুল খবর শুনেচেন আমার সম্বন্ধে, এটা ওঁদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলাম। আমি সামান্যই ব্যবসা করি, তাও একটি বন্ধুর সঙ্গে ভাগে। সামান্য পুঁজির ওপর ব্যবসা—এমন কিছু আয় হয় না যাতে কলকাতা শহরে বাসা করে পরিবার নিয়ে সচ্ছলভাবে থাকা যায়।

এমন সময় ভট্চাজ মশায় এমন একটি কথা বললেন যাতে আমি একেবারে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি বললেন—বাবাজীর নিজের বাড়ি আছে কলকাতায়, নিজেই করেচেন—

রায় মশায় বললেন—হ্যাঁ, সে তো আপনি বললেন সেদিন—

আমি অবাক। ভট্চাজ মশায় জেনেশুনে মিথ্যে কথা বলচেন ঘটকালি অগ্রসর করবার জন্যে, না, উনি আমার সম্বন্ধে ভুল খবর পেয়েছেন?

আমি তখনি প্রতিবাদ করতাম কিন্তু হঠাৎ কেমন দুর্বলতা এসেগেল মনে। ওই যে মেয়েটি এখানে বসে আছে, ওর কাছে এখুনি এত খেলো হব কেন? বিয়ে হবে না জানি, মেয়েটি উঠে যাক—আমিও এখান থেকে চলে যাই—তারপর আমি যা করবো তা আমার জানাই আছে।

রায় মশায়ই বললেন—তাহলে মেয়েটিকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে পারি?

অপরাধের বোঝা যথেষ্টই ভারী হয়েছে তাঁর কাছে আমার। আর নয়—আমি মেয়েকে নিয়ে যেতে বললাম। একটু পরে এল বাড়ির মধ্যে থেকে মেয়ের হাতের নানারকম সূচের কাজকর্ম—একটি রাশ। কত রকমের তুলোর কুকুর, পশমের আসন, রুমাল, টেবিলঢাকা কাপড়, মাছের আঁশের হাঁস ফ্রেমে বাঁধানো—ইত্যাদি। একটি সুদর্শন ছোট ছেলের সঙ্গে একজন ঝি সেগুলো নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলে। গিন্নিমা নাকি সেগুলি পাঠিয়েছেন।

আরও আধ ঘন্টা।

এইবার রওনা হতে হবে। ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সীতানাথ রায় মশায় আমাকে প্রথমে কিছুতেই আসতে দেবেন না. রাত হয়ে আসচে—এখন তিনি আমায় ছেড়ে দিতে পারেন না। রাত্রে এখানেই থাকতে হবে।

আমি বললাম—কোনো অসুবিধা হবে না, মঙ্গলগঞ্জের ঘাটে নৌকো ভাড়া করে চলে যাবো। সে ঘাট তো মোটে দু-মাইল। জ্যোৎস্নারাত্র, বেশ চলে যাবো।

সীতানাথ রায় মশাই আমার সঙ্গে একাই খানিক দূর হেঁটে চললেন। বললেন—আপনাকে আর বেশি কি বলবো, মেয়ে আমার বড্ড ভালো।

—আজ্ঞে নিশ্চয়ই।

—আপনার মতামতটা যদি জানাতেন—

—সে আমার মামার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে জানাবো, কারণ মামাই বলতে গেলে এখন অভিভাবক—

বলা বাহুল্য, যে মাতুলকে কর্মকর্তা নির্দেশ করলাম, তাঁর খবর পর্যন্ত রাখিনি আজ তিন-চার বছর।

বললুম—তাহলে আপনি আর এগোবেন না—সন্দে হয়ে এল—

স্থানটি নির্জন। গ্রাম ছাড়িয়ে বড় একটা বিল ডান দিকে, সামনে ধু ধু মাঠের বুক চিরে সাদা বালির রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে চলে গিয়েচে। কেউ কোথাও নেই।

রায় মশায় এদিক ওদিক তাকিয়ে সুর নীচু করে বললেন—যাতে এ হয়, তা তোমাকে করতেই হবে বাবাজী। আমার স্ত্রীর বড্ড পছন্দ হয়েচে তোমাকে, আমায় ডেকে বলছিল। আর কি জানো, বাইরে ঠাট যতই দ্যাখো, তেমন অবস্থা তো আর নেই। তোমার মতো সুপাত্র কোথায় পাবো? দেনা-পাওনার জন্য কিছু আটকাবে না—তোমার কলকাতার বাড়ি সাজানোর আসবাবপত্তর দিতে পারব না হয়তো, তবে মেয়ের গা সাজানো গহনা দেবো। ত্রিশ ভরি সোনা দেবো, ওর গর্ভধারিণীর যা আছে, তা দুই মেয়েকে তিনি ভাগ করে দেবেন। তাহলে মনে থাকে যেন বাবাজী—

এই প্রথম তিনি আমায় ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করলেন।

চলে এলাম সেদিন এবং কয়েকদিন পরে কলকাতাতেও এলাম। তারপর আমি কোন উচ্চবাচ্য করিনি এ বিষয়ে। সীতানাথ রায় মশায় পত্র দিয়েছিলেন, লোক পাঠিয়েছিলেন। বহু অনুরোধ করেছিলেন—শেষ পর্যন্ত যদি আমি বিবাহ করি, উৎকৃষ্ট ধানের জমি মেয়ের নামে লেখাপড়া করে দিতে চেয়েছিলেন—প্রায় পনরো বিঘে। বড়ই দুঃখের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে হল আমায়। তিনি আগাগোড়া ভুলের ওপর যে বাড়ির ভিত পত্তন করেছিলেন, সে ভিতের ওপর আমি বাড়ি তুলতে পারিনি।

সব কথা খুলে বলনি কেন?

তখন বয়স ছিল কম। গর্বে বাধে, মুখ ছোট হয়ে যায়। এখন হলে সব খুলে বলতাম, তখন তা পারিনি।

এখন দেশেই আছি। এই যুদ্ধের বাজারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার চালানো বড়ই কষ্ট। ব্যবসা অনেকদিন নষ্ট হয়ে গিয়েচে—বন্ধুই হোক আর যে-ই হোক, ভাগে ব্যবসা না করাই ভালো—এই অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা ক্রয় করতে হয়েছে অতি কষ্টে উপার্জিত হাজার সাতেক টাকার বিনিময়ে।

সেদিন প্রভা বললে—সামনের মাসে ধান ফুরিয়ে যাবে। ছত্রিশ টাকা চালের মণ, কি করে এই পুরীপাল্লা চালাবো? সস্তায় নাকি কনট্রোলের ধান দিচ্চে মহকুমায়—চেষ্টা করে দেখো না।

তাই আজ কদিন ধরে হাঁটাহাঁটি করছি মহকুমায়। ধান সস্তায় দেবার মালিক এক বড় অফিসার, তিনি কলকাতা থেকে এসে দিন পনরো আছেন। তাঁর আরদালি কদিন ফিরিয়ে দিয়েচে।

আজ নকুড় চক্কত্তি বললে, এমনি না হয়—একজন উকিল ধরে হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিতে হবে। রোজ হেঁটে আর পারিনে—

তাই দুজনে মিলে একখানা নৌকো ভাড়া করে এসেছিলাম।

বেলা দশটার সময় হাকিমের বাসার ফটকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না, ভেতরে ঢুকতেও সাহস হয় না। এমন সময় হাকিমের ছোক্‌রা আরদালিকে আসতে দেখে তাকে বললাম—ওহে, শোনো, আমাদের দরখাস্তখানা নিয়ে যাও না সাহেবের কাছে।

হাকিম বাঙালি হলেও তাঁকে সাহেব বলাই নিয়ম।

লোকটা ইতস্তত করচে দেখে নকুড় চক্কত্তি তাকে দু-আনা পয়সা দিয়ে বললে—পান বিড়ি খেয়ো। আমরা গরিব লোক, নিয়ে যাও দরখাস্তখানা, আজ ন-দিন হাঁটাহাঁটি করচি। ধান মঞ্জুর হলে তোমায় আরো কিছু দেবো—

আরদালি কি ভেবে দরখাস্ত নিয়ে চলে গেল।

দু-ঘণ্টা কারো দেখা নেই—কেউ ডাকে না। সাহেব তো দূরের কথা, আরদালিরও টিকি আর দেখা যায় না। নকুড় চক্কত্তি বললে—কি ব্যাপার হে, দু-আনা পয়সাই গেল এ বাজারে—থাকলে তবুও ছেলেপিলের জন্য দু-আনার কুচো গজা-টজা নিয়ে গেলে—

এমন সময় সেই ছোকরা আরদালি বারান্দায় বেরিয়ে বললে—রামলালবাবু কার নাম?

নকুড় চক্কত্তি বললে—যাও হে, তোমার ডাক পড়েচে—দেখে এসো—আমার কথাটাও একটু বলো। না-খেয়ে মরে যাবে ছেলেপিলে—

বারান্দা পার হয়ে সামনের সাজানো মাঝারি গোছের ঘরে ঢুকেই আমি সামনে একটি মহিলাকে দেখে একেবারে চমকে গেলাম। থতমত খেয়ে সরে যাব কি না ভাবচি, এমন সময়ে মেয়েটি হাত তুলে আমায় নমস্কার করলে। আমি আরও থতমত খেয়ে গেলাম।

হাতের একখানা কাগজ দেখিয়ে মেয়েটি বললে—এ দরখাস্ত আপনি করেচেন? আমি আপনার নাম দেখে বুঝেচি আর গ্রামের নাম দেখে—আমায় চিনতে পারলেন না?

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে মেয়েটির দিকে ভালো করে চাইলাম। কোথায় যেন দেখেচি, কিন্তু মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেচি।

মেয়েটি মৃদু হেসে বললে—আমাদের বাড়ি আপনি গিয়েছিলেন—আমার বাবার নাম শ্রীসীতানাথ রায়, কাপাসীপাড়া—

আমার সমস্ত শরীর যেন কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচে। এই সেই স্মৃতি, সীতানাথ রায়ের মেয়ে।

মেয়েটি আবার বললে—আমি আপনাকে আরও দু-দিন দেখেচি। দেখেই চিনেছিলাম, একটু সন্দেহ ছিল—আজ দরখাস্তে আপনার নাম দেখে আর সন্দেহ রইল না। উনি একটু বিশ্রাম করচেন। আপনার দরখাস্ত ওঁকে বলে মঞ্জুর করিয়েচি—নিয়ে যান। চেহারা খারাপ হয়ে গিয়েচে আগেকার চেয়ে। একটু চা খাবেন?

আমি যেন সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে বললাম—না—না—এখন থাক—

মেয়েটি হাত তুলে নমস্কার করে বললে—এবার এখানে এলে কিন্তু আবার দেখা করবেন। ওঁকে বলেচি আমার বাপের বাড়ির দেশে আপনার পিসিমার বাড়ি। অবিশ্যি আসবেন, চা খাবেন সেদিন—

আমি দরখাস্ত হাতে নিয়ে বার হয়ে এলাম। সস্তায় দু-মণ ধানের পারমিট পেয়েছি। স্ত্রী-পুত্র এখন দু-মাস খেয়ে বাঁচবে।

ওর ভালো নাম বোধ হয় ছিল নিস্তারিণী। ওর যৌবন বয়সে গ্রামের মধ্যে অমন সুন্দরী বৌ ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যেও ছিল না। ওরা জাতে যুগী, হরিনাথ ছিল স্বামীর নাম। ভদ্রলোকের পাড়ায় ডাকনাম ছিল, 'হ'রে যুগী।

নিস্তারিণীর স্বামী হরি যুগীর গ্রামের উত্তর মাঠে কলাবাগান ছিল বড়। কাঁচকলা ও পাকাকলা হাটে বিক্রি করে কিছু জমিয়ে নিয়ে ছোট একটা মনোহারী জিনিসের ব্যবসা করে। রেশমী চুড়ি ছ-গাছা এক পয়সা, দু-হাত কার এক পয়সা—ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে মনে হল 'কার' মানে ফিতে বটে ; কিন্তু 'কার' কি ভাষা ? ইংরিজিতে এমন কোনো শব্দ নেই, হিন্দি বা উর্দুতেও নেই, অথচ 'কার' কথাটা ইংরিজি শব্দ বলে আমরা সকলেই ধরে নিয়ে থাকি। যাক্ সে। হরি যুগীর বাড়িতে দু-খানা বড় বড় মেটে ঘর, একখানা রান্নাঘর, মাটির পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। অনেক পুষ্যি বাড়িতে, দু-বেলা পনরো-ষোলোখানা পাত পড়ে। হরি যুগীর মা, হরি যুগীর দুটি ছোট ভাই, এক বিধবা ভগ্নী, তার দুই ছেলেমেয়ে। সংসার ভালোই চলে, মোটা ভাত, কলাইয়ের ডাল, ঝিঙে আর লাল ডাঁটা চচ্চড়ির অভাব কোনোদিন হয়নি, গোরুর দুধও ছিল চার-পাঁচ সের। অবশ্যি দুধের অর্ধেকটা ব্রাহ্মণপাড়ায় যোগান দিয়ে তার বদলে টাকা আসতো।

গ্রামের মধ্যে সুন্দরী বৌ-ঝির কথা উঠলে সকলেই বলতো—'হ্রে যুগীর বৌয়ের মতো প্রায় দেখতে'। গ্রামের নারীসৌন্দর্যের মাপকাঠি ছিল নিস্তারিণী। গেরস্তঘরের বৌ, স্নান করে ভিজে কাপড়ে ঘড়া কাঁকে নিয়ে যখন সে গাঙের ঘাট থেকে ফিরতো, তখন তার উদ্দাম সৌন্দর্য অনেক প্রবীণের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিত।

এ গ্রামে একটা প্রবাদ আছে অনেকদিনের।

তুলসী দারোগা নদীর ঘাটের পথ ধরে নীলকুঠির ওদিক থেকে ঘোড়া করে ফিরবার সময়ে তুঁতবটের ছায়ায় প্রস্ফুট তুঁতফুলের মাদকতাময় সুবাসের মধ্যে এই সিক্তবসনা গৌরাঙ্গী বধূকে ঘড়া কাঁকে যেতে দেখল। বসন্তের শেষ, ঈষৎ গরম পড়েচে—নতুবা তুঁতফুল সুবাস ছড়াবে কেন?

তুলসী দারোগা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ জাঁহাবাজ দারোগা—'হয়'কে 'নয়' করবার অমন ওস্তাদ আর ছিল না। চরিত্র হিসেবেও যে নিষ্কলঙ্ক ছিল, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। তুলসী দারোগার নামে এ অঞ্চলে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। তার সুনজরে একবার যিনি পড়বেন, তাঁর হঠাৎ উদ্ধারের উপায় ছিল না। এ হেন তুলসী দারোগা হঠাৎ উন্মনা হয়ে পড়লো সুন্দরী গ্রাম্যবধূকে নির্জন নদীতীরের পথে দেখে। বধূটিকে সন্ধান করবার লোকও লাগালে। হরি যুগীকে দু-তিনবার থানায় যেতে

হল দারোগার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু নিস্তারিণী ছিল অন্য চরিত্রের মেয়ে, শোনা যায় তুলসী দারোগার পাঠানো বৃন্দাবনী শাড়ি সে পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বলেছিল তাদের কলাবাগানের কল্যাণে অমন শাড়ি সে অনেক পরতে পারবে, জাতমান খুইয়ে বৃন্দাবনী কেন, বেনারসী পরবার শখও তার নেই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে তুলসী দারোগা এখান থেকে বদলি হয়ে চলে যায়।

আর একজন লোক কিন্তু কথঞ্চিৎ সাফল্যলাভ করেছিল অন্যভাবে। গ্রামের প্রান্তে গোঁসাইপাড়া, গ্রামের মধ্যে তারা খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, প্রায় জমিদার। বড় গোসাঁইয়ের ছেলে রতিকান্ত নদীর ধারে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে গিয়েছিল—সন্ধ্যার প্রাক্কালে, শীতকাল। হঠাৎ সে দেখলে কাদের একটি বৌ ঘড়াসুদ্ধ পা পিছলে পড়ে গেল—খুব সম্ভব তাকে দেখে। রতিকান্ত কলকাতায় থাকতো, দেশের ঝি-বৌ সে চেনে না। সে ছুটে গিয়ে ঘড়াটা আগে হাঁটুর ওপর থেকে সরিয়ে নিলে, কিন্তু অপরিচিতা বধূর অঙ্গ স্পর্শ করলে না। একটু পরেই সে দেখলে বধূটি মাটি থেকে উঠতে পারছে না, বোধ হয় হাঁটু মচকে গিয়ে থাকবে! নির্জন বনপথ, কেউ কোনোদিকে নেই, সে একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। কাছে দাঁড়িয়ে বললে—মা, উঠতে পারবে, না, হাত ধরে তুলবো?

তারপর সে অপরিচিতার অনুমতির অপেক্ষা না করেই তার কোমল হাতখানি ধরে বললে—ওঠ মা, আমার ওপর ভর দিয়ে। কোনো লজ্জা নেই—উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করো তো—

কুণ্ঠিতা সঙ্কুচিতা বধূ ছিল না নিস্তারিণী। সে ছিল যুগীপাড়ার বৌ—তাকে একা ঘাট থেকে জল আনতে হয়, ধান ভানতে হয়, ক্ষার কাচতে হয়—সংসারের কাজকর্মে সে অনলস, অক্লান্ত। যেমনি পরিশ্রম করতে পারে, তেমনি মুখরা, তেমনি সাহসিকতাও বটে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের গৌরবে তখন তার নবীন বয়সের নবীন চোখ দুটি জগৎকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে।

সে উঠে দাঁড়ালো, রতিকান্তের সঙ্গে কিন্তু কোনো কথা বললে না। বুঝতে পারলে গোসাঁইপাড়ার বাবুদের ছেলে তার সাহায্যকারী। বাড়ি গিয়ে দু-তিন দিন পরে সে স্বামীকে দিয়ে একছড়া সুপক্ক চাঁপাকলা ও নিজের হাতে তৈরি বাঁশসলা ধানের খইয়ের মুড়কি পাঠিয়ে দিলে গোসাঁইবাড়ি। বললে—আমার ছেলেকে দিয়ে এসো গে—

নিস্তারিণী সেই থেকে সেই একদিনের দেখা সুদর্শন যুবকটিকে কত কি উপহার পাঠিয়ে দিত। রতিকান্তের সঙ্গে আর কিন্তু কোনোদিন তার সাক্ষাৎ হয়নি। গোসাঁই-বাড়ির ছেলে যুগীবাড়িতে কোনোদিন আসেনি।

রতিকান্ত কলকাতাতেই মারা গিয়েছিল অনেকদিন পরে। নিস্তারিণীর দু-তিন দিন ধরে চোখের জল থামেনি, এ সংবাদ যখন সে প্রথম শুনলে।

গ্রামের অবস্থা তখন ছিল অন্যরকম সকলের বাড়িতে গোলাভরা ধান, গোয়ালে দু-তিনটি গোরু থাকতো। সব জিনিস ছিল সস্তা। নিস্তারিণীদের বাড়ির পশ্চিম উঠানে ছোট একটা ধানের গোলা। কোনো কিছুর অভাব ছিল না ঘরে। বরং ব্রাহ্মণপাড়ার অনেককে সে সাহায্য করেছে।

একবার বড্ড বর্ষার দিনে সে বাড়ির পিছনের আমতলায় ওল তুলচে—এমন সময় বাঁড়ুয্যে-বাড়ির মেয়ে ক্ষান্তমণি এসে বললে—

—ও যুগী বৌ!

নিস্তারিণী অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলে। বাঁড়ুয্যে-বাড়ির মেয়েরা কখনো তাদের বাড়ির বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলে না। সে বললে—কি দিদিমণি?

—একটা কথা বলবো?

—কি বলো দিদিমণি—

—আমাদের আজ একদম চাল নেই ঘরে। বাদলায় শুকুচ্চে না, কাল ধান ভেজে দুটো চিড়ে হয়েছিল। তোমাদের ঘরে চাল আছে, কাঠাখানেক দেবে?

নিস্তারিণী এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, তার খাণ্ডার শাশুড়ী কোনোদিকে আছে কি না। পরে বললে—দাঁড়াও দিদিমণি—দেবানি, চাল ঘরে আছে। শাশুড়ীকে লুকিয়ে দিতি হবে—দেখতি পেলে বড্ড বকবে আমারে। তা বকুক গে, বলে বামুনের মেয়েকে বাড়ি থেকে ফিরিয়ে দেবো?

আর একবার বাঁড়ুয্যে-বাড়ির বৌ তার বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ; সে বৌ ছিল গ্রামের মধ্যে নামডাকওয়ালা খাণ্ডার বৌ — শাশুড়ীর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া বাধাতো, কেরোসিনের টেমি ধরিয়া শাশুড়ীর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল। পাড়ার কেউ ভয়ে বৃদ্ধাকে স্থান দিতে পারেনি, যে আশ্রয় দেবে তাকেই বড় বৌয়ের গালাগালি খেতে হবে। যুগী বৌ দেখলে বাঁড়ুয্যে-বাড়ির বেড়ার কাছে বড় সেগুনতলার ছায়ায় ন-ঠাকরুন চুপ করে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদচেন। ও গিয়ে বললে— ন-ঠাকরুন, আসুন, আমাদের বাড়ির দাওয়াতে বসবেন— বড় বৌ বকেছে বুঝি?

ন-ঠাকরুন শুচিবেয়ে মানুষ, তা ছাড়া বাঁড়ুয্যে-বাড়ির গিন্নি হয়ে যুগীবাড়ি আশ্রয় নিলে মান থাকে না। সুতরাং প্রথমে তিনি বললেন— না বৌ, তুমি যাও, আমার কপালে এ যখন চিরদিনের, তখন তুমি একদিন বাড়িতে ঠাঁই দিয়ে আমার কি করবে? নগের বৌ যেদিন চটকাতলার চিতেয় শোবে, সেদিনটি ছাড়া আমার শান্তি হবে না মা। ওই কালনাগিনী, যেদিন আমার নগের ঘাড়ে চেপেচে—

নিস্তারিণী ভয়ে ভয়ে বললে—চুপ করুন ন-গিন্নি, বৌ শুনতি পেলি আমার

এস্তক রক্ষে রাখবে না। আসুন আপনি আমার বাড়িতে। এইখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবেন কেন মিছে—

ন-গিন্নিকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সে নিজের হাতে তার পা ধুয়ে দিয়ে পিঁড়ি পেতে দাওয়ায় বসালে। কিছু খেতে দেওয়ার খুব ইচ্ছে থাকলেও সে বুঝলে বড় ঘরের গিন্নি ন-ঠাকরুন এ বাড়িতে কোনো কিছু খাবে না, খেতে বলাও ঠিক হবে না। সে ভাগ্য সে করেনি।

অনেক রাত্রে গিন্নির বড় ছেলে নগেন খুঁজতে খুঁজতে এসে যখন মায়ের হাত ধরে নিয়ে গেল, তখন নিস্তারিণী অনেক অনুনয়-বিনয় করে বড় এক-ছড়া মর্তমান কলা তাঁকে দিয়ে বললে— নিয়ে যান দয়া করে। আর তো কিছু নেই, কলাবাগান আছে, কলা ছাড়া মানুষকে হাতে করে আর কিছু দিতে পারিনে—

তার স্বামী সে-বার রামসাগরের চড়কের মেলায় মনোহারী জিনিস বিক্রি করতে গেল। যাবার সময় নিস্তারিণী বললে— ওগো, আমার জন্যি কি আনবা?

—কি নেবা বলো? ফুলন শাড়ি আনবো?

—না, শোনো, ওসব না। একরকম আলতা উঠেচে, আজ মজুমদারবাড়ি দেখে এলাম। কলকেতা থেকে এনেচে মজুমদার মশায়ের ছেলে— শিশিনিতে থাকে। কি একটা নাম বললে, ভুলে গিইচি।

— শিশিনিতে থাকে?

— হ্যাঁ গো। সে বড় মজা, কাটির আগায় তুলো দেওয়া, তাতে করে মাখাতে হয়। ভালো কথা, তরল আলতা— তরল আলতা—

— কত দাম?

— দশ পয়সা। হ্যাঁগো, আনবে এক শিশিনি আমার জন্যি?

— দ্যাখবো এখন। গোটা পাঁচেক টাকা যদি খেয়েদেয়ে মুনাফা রাখতি পারি, তবে এক শিশিনি ঐ যে কি আলতা তোর জন্যি ঠিক এনে দেবো।

এইভাবে গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার সাথে টেক্কা দিয়ে নিস্তারিণী প্রসাধন দ্রব্য ক্রয় করেছে। তাদের পাড়ার মধ্যে সে-ই সর্বপ্রথম তরল আলতা পায়ে দেয়। শূদ্রপাড়ার মধ্যে ও জিনিস একেবারে নতুন—কখনো কেউ দেখেনি। আলতা পরবার সময়ে যে দেখতো সে-ই অবাক হয়ে থাকতো। হাজরী বুড়ি মাছ ধরতে এসেছে একদিন—সে অবাক হয়ে বললে—হ্যাঁ বড় বৌ, ও শিশিনিতে কি? কি মাখাচ্চ পায়ে?

নিস্তারিণী সুন্দর রাঙা পা দুখানি ছড়িয়ে আলতা পরতে বসেছিল, একগাল হেসে বললে— এ আলতা দিদিমা। এরে বলে তরল আলতা।

— ওমা, পাতা আলতাই তো দেখে এসেচি চিরকাল। শিশিনিতে আলতা থাকে, কখনো শুনিনি। কালে-কালে কতই দ্যাখলাম। কিন্তু বড় চমৎকার মানিয়েছে তোমার পায়ে বৌ— এমনি টুকটুকে রং, যেন জগদ্ধাত্রী পিরতিমের মতো দেখাচ্চে—

এ সব ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

শীতের সকালবেলা। ওদের বড় ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে নিস্তারিণী শুয়ে আছে। সংসারের সাবেক অবস্থা আর নেই, হরি যুগী বহুদিন মারা গিয়েচে—হরি যুগীর একমাত্র ছেলে সাধনও আজ তিন-চার বছর একদিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গিয়েচে। সুতরাং নিস্তারিণী এখন স্বমীপুত্রহীনা বিধবা। তার শাশুড়ী এখনও বেঁচে আছে, আর আছে এক বিধবা জা, জায়ের এক মেয়ে, এক ছেলে।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের সে উচ্ছলযৌবনা সুন্দরী গ্রাম্য বধূটিকে আজ আর রোগগ্রস্তা, শীর্ণকায়া, মলিনবসনা প্রৌঢ়ের মধ্যে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। হরি যুগীর মৃত্যুর সঙ্গে তাদের সে গোয়ালভরা গোরু ও গোলাভরা ধান অন্তর্হিত হয়েছে— ঘরের চালে খড় নেই, তিন-চার জায়গায় খুঁচি দেওয়া, খসে-পড়া চালে বর্ষার জল আটকায় না। গত বর্ষায় চালের ওপর উচ্ছেলতা গজিয়ে একদিক ঢেকে রেখেচে, মাটির দাওয়ার খানিকটা ভেঙে পড়েচে, পয়সার অভাবে সারানো হয়নি। কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে। সংসারের কর্তা, যার আয়ে সংসারের শ্রী, সে চলে যাওয়ায় নিস্তারিণীর আদর এ বাড়িতে আর নেই। আগে ছিল সে-ই সংসারের কর্ত্রী, এখন তাকে পরের হাত-তোলা খেয়ে থাকতে হয়— তার ছেলে সাধন বাপের মনোহারী দোকান আর কলাবাগান কোনো রকমে বজায় রেখেছিল।

তিন বছর আগের এক ভাদ্র মাসে খুব বৃষ্টির পরে সাধন নদীর ধারে কলাবাগানে কাজ করতে গিয়ে সেখানে মারা যায়। কেন মারা যায় তার কারণ কিছু জানা যায়নি। সন্ধে পর্যন্ত সাধন ফিরলো না দেখে তার ঠাকুরমা নাতিকে খুঁজতে বার হচ্চে, এমন সময় বেলেডাঙার দু-জন মুসলমান পথিক এসে খবর দিলে— সাধন মুখ গুঁজড়ে কলাবাগানের ধারের পথে কাদার ওপরে পড়ে আছে— দেহে বোধ হয় প্রাণ নেই।

সকলে ছুটতে ছুটতে গেল। গ্রামের লোক ভেঙে পড়লো। সকলে গিয়ে দেখলে সাধন সত্যিই উপুড় হয়ে কাদার ওপর পড়ে, সর্বাঙ্গে কাদা মাখা, তার ওপর দিয়ে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিয়েচে। যেখানে শুয়ে আছে সেখানটা রক্ত পড়ে অনেকখানি জায়গা রাঙা, খানিকটা বৃষ্টির জলে ধুয়েও গিয়েচে। রক্তটা পড়েচে সাধনের মুখ থেকে।

গরিবের ঘরের ব্যাপার, দু-দিনেই মিটে গেল। সংসারের অবস্থা আরো খারাপ

হয়ে পড়লো ক্রমে—বাড়িতে উপার্জনক্ষম পুরুষ মানুষের মধ্যে বাকি কেবল হরি যুগীর ভাই যুগলের ছেলে বলাই। যুগলও বহুদিন পরলোকগত, দাদার মৃত্যুর পর-বৎসরই সে বিধবা স্ত্রী ও দু-বছরের শিশুপুত্রকে রেখে মারা যায়। বলাই এখন উনিশ বছরের, বেশ কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান যুবক।

নিস্তারিণীকে এখন আদর করে 'নিস্তার' বা 'বড় বৌ' বলে কেউ ডাকে না—যে ডাকতো সে নেই। এখন তার নাম 'সাধনের মা'। কেউ ডাকে পিনটুর ঠাক্‌মা। পিনটু সাধনের শিশুপুত্র—এখন তার তিন বছর বয়েস। সাধনের বিধবা বৌয়ের বয়স এই সবে সতেরো।

নিস্তারিণী ডাক দিল— ও পিনটু, পিনটু—

পিনটু উঠানের আমতলায় খেলা করছিল, কাছে এসে বললে—কি ঠাক্‌মা?

— তোর মাকে একবার ডেকে দে—

পিনটুর ডাকে তার মা এসে দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বললে— কি হয়েছে, ডাকচো কেন?

— আমি আজ দুটো ভাত খাবো, বল তোর ঠাকুরমাকে—

পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়ে বললে—ভাত বললিই অমনি ভাত, খাবা কোথা থেকে? সে আমি বলতে পারবো না ঠাকুরমাকে!

— তবে একগাল খই কি চিঁড়েভাজা যা হয় দে এখন—খিদেয় মলাম—

— হ্যাঁ, আমি তোমার জন্যি বামুনপাড়ায় বেরুই লোকের দোরদোর। অসুখ হয়েচে, চুপ করে শুয়ে থাকো বাপু।

ওরা ওই রকম। সাধনের বৌ মুখঝঙ্কার দেয়, তাকে একেবারেই মানে না। সেকালের আর একালের মেয়েতে কি তফাৎ, তাই সে ভাবে এক এক সময়ে। তার একদিন সতেরো বছর বয়স ছিল, কখনো শাশুড়ীর একটা কথার অবাধ্য হতে সাহস হত তার? আশ্চয্যি!

একটু পরে নিস্তারিণীর শাশুড়ী এসে দূরে দাঁড়িয়ে বললে—বলি, হ্যাঁ বৌ, তোমার আক্কেলখানা কি? আজ নাকি ভাত খেতে চেয়েচ? জ্বর রয়েচে চব্বিশ প্রহরের জন্যি। ভাত খেলেই হল অমনি?...বলি, সোয়ামী খেয়েচ, পুত্তুর খেয়েচ, দেওর খেয়েচ— এখনো খাওয়ার সাধ মেটেনি তোমার?

নিস্তারিণী বড় দুর্বল হয়ে পড়েচে অসুখে—তবু সে বললে, সোয়ামী পুত্তুর তো তুমিও খেয়েছিলে, তবুও তিন পাথর করে ভাত মারো তো তিনটি বেলা। লজ্জা করে না বলতি?

নিস্তারিণীর শাশুড়ী একথার উত্তরে চিৎকার করে গালাগালি দিয়ে এক কাণ্ডই

বাধালে। সাধনের বউকে ডেকে বলে দিলে—ওকে কিছু খেতে দিবিনে আজ বলে দিচ্চি। এ সংসারে যে খাটবে, সে খাবে। আমরা সবাই মায়ে-ঝিয়ে খাটি, ও শুধু শুয়ে থাকে। রোগ নিয়ে শুয়ে থাকলি এ সংসারে চলে না। তার ওপর আবার যে সে রোগ নয়, ওকে বলে পাণ্ডুর রোগ। মুখ হলদে, চোখ হলদে, হাত পা ফুলেচে, ও কি সহজ রোগ? ও আর উঠবেও না, খাটবেও না, কেবল শুয়ে-শুয়ে পাথর-পাথর খাবে।

নিস্তারিণী বললে—খাবো—খাবো, বেশ করবো। আমার খোকা কলাবাগান সামলে রাখতো, তারই আয়ে বাড়িসুদ্ধ খাওনি? সেই কলাবাগান তদ্বির করতে গিয়েই বাছা আমার চলে গেল। তোমরা এদের বাপ-ছেলের রক্তজলকরা কলাবাগান, মনিহারী ব্যবসা ঘোচালে। এখন আমায় বসিয়ে খেতে দেবে না তো কি করবে? নিশ্চয়ই দিতে হবে।

— বাসী আখার ছাই খেয়ো, দেবো। ডাইনি রাক্কুসি— আমার সংসার তোর দিষ্টিতে জ্বলেপুড়ে গেল— নইলে কি না ছেল, গোলাভরা ধান ছেল না? হাঁড়িভর্তি ডালডুল, গোয়ালভর্তি গোরু-ছাগল— ছেল না কি?

উভয় পক্ষের চেঁচামেচি শুনে ওর জা নির্মলা সেখানে এসে পড়লো। এটি হরি যুগীরর ছোট ভাই যুগলের বিধবা স্ত্রী। এর একমাত্র পুত্র বলাই এই সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষ মানুষ। বলাইয়ের বয়েস এই উনিশ বছর।

বলাই বাঁশ কিনে গাড়ি বোঝাই দিয়ে রেলস্টেশনে নিয়ে যায়, সেখান থেকে মালগাড়িতে উঠিয়ে কলিকাতায় পাঠায়। গত বছরখানেক এ ব্যবসা করে সে গোটা পঞ্চাশ টাকা হাতে জমিয়েচে— মার হাতেই এনে দিয়েচে সে টাকা। নির্মলা আবার সে টাকাটা থেকে কুড়িটি টাকা শাশুড়ীকে দিয়েচে। বুড়ি সেই টাকায় পাশের গ্রাম থেকে দুধ কিনে এ গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় যোগান দেয়, তাতেও সামান্য কিছু লাভ থাকে। বুড়ির বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেলেও সে এখনও দুপুর রোদে সারা পাড়া, সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়— দূর দূরান্তরের চাষাগাঁয়ে হাঁসের ডিম, মুরগির ডিম সংগ্রহ করতে যায় ব্রাহ্মণপাড়ায় বিক্রির জন্যে।

নির্মলা নিজেও বসে থাকে না, তিনু গাঙ্গুলীর বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে মাসে দু-টাকা মাইনে পায়।

সুতরাং এ সংসারে এখন নির্মলার প্রতিপত্তিই বেশি। নিস্তারিণীর দিন সকল রকমেই চলে গিয়েচে। এখন নির্মলার ছেলে বলাই পয়সা আনে, নির্মলা নিজে পয়সা আনে, বলাইয়ের পয়সায় ওর ঠাকুরমা দুধের যোগান দিয়ে কিছু আয় করে। নিস্তারিণী শীর্ণ পাণ্ডুর দেহে উত্থানশক্তিরহিত শয্যাগত অবস্থায় শুধু 'খাই খাই' করে

রোগের দুষ্টক্ষুধায় অবোধ বালিকার মতো। হরি যুগী বেঁচে থাকলে তার সে অন্যায় আবদার খাটতো, সাধন বেঁচে থাকলেও খাটতো। আজ তার আবদার কান পেতে শোনবার লোক কে আছে এ সংসারে?

নির্মলার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ— বেশ ধপধপে ফর্সা, কৃশাঙ্গী, মুখচোখ ভালোই, মাথায় এখনো এক ঢাল চুল, চুলে একটিও পাক ধরেনি। যুগীদের মেয়েরা সাধারণত সুন্দরী হয়ে থাকে—নির্মলার মেয়ে তারা বেশ সুন্দরী। তারা বলাইয়ের ছোট, এই মাত্র চোদ্দো বছর বয়েস। আজ বছর দুই হল এই গ্রামেই তার বিয়ে হয়েচে।

নির্মলা এসে বললে—দিদি, চেঁচিও না। ঝগড়া করে মরচো কেন?

নিস্তারিণী কাঁদতে কাঁদতে বললে— দ্যাক দিকি ছোট বৌ, আমায় কিনা রাক্ষসি, ডাইনি বলে। আমি নাকি এসে ওনার সংসারে আগুন নাগিয়ে দিইচি। আমার সোয়ামী পুত্তুরের অন্ন উনি কোনোদিন বুঝি দাঁতে কাটেননি—

নির্মলা বললে— সে তো তুমিও ওনাকে বলেচো। যাক, এখন চুপটি করে শুয়ে থাকো।

— ও ছোট বৌ, আমি দুটো ভাত—

— না, আজ না। তোমার গা ফুলেচে, মুখ ফুলেচে—তুমি ভাত খাবে কি বলে আজ?

— তা হোক, তোর পায়ে পড়ি—

— আচ্ছা এখন চুপ করো, বেলা হোক। ভাত রান্না হোক, আমি বলবো অখন।

নিস্তারিণীর হাত, পা, মুখ ফুলেচে একথা ঠিকই। বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েচে একথা ঠিকই। কী বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েচে তার, ওর দিকে যেন আর তাকানো যায় না— এমন খারাপ দেখতে হয়েচে ও। যত্ন করবার কেউ না থাকাতে আরও দিন-দিন ওর অবস্থা খারাপতর হয়ে উঠেচে। খেতে ইচ্ছে করে কিন্তু আগ্রহ করে খেতে দেবার কেউ নেই। রোগীর পথ্য তো দূরের কথা, দুটি ভাত তাই কেউ দেয় না।

ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে সে নাতিকে ডেকে চুপি চুপি বললে— পিনটু, দুটো পেয়ারা আনতে পারিস?

পিনটুর মা ছেলেকে বলে—খবরদার, যাবিনি বুড়ির কাছে। ওর পাণ্ডুর রোগ হয়েচে, ছোঁয়াচে রোগ। ছেলে খেয়ে বসে আছে ডাইনি, আবার নাতিকে খাবার যোগাড় করচে। ঠ্যাং ভেঙে দেবো যদি ওর কাছে যাবি—

বেলা দুপুরের পরে সে ভীষণ জ্বরে বিকেল পর্যন্ত অঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল— কখন যে এ বাড়ির লোকে খাওয়া-দাওয়া করেচে তা সে কিছুই জানে না।

যখন তার খানিকটা জ্ঞান হল, তখন ভাদ্র মাসের রোদ প্রায় রাঙা হয়ে উঠোনের আমগাছটা, বাঁশঝাড়গুলোর আগায় উঠে গিয়েচে। মুখের কাঁথাটা খুলে দিয়েই ও চিঁ চিঁ করে প্রথমেই ডাকলে—ও পিনটু, পিনটু—

পিনটু কোথা থেকে ছুটে এসে বললে— কি ঠামা?

— আমার জন্যি সেই পেয়ারা এনেছিলি?

— না ঠামা।

— আনিসনি? ছেলেমানুষ, ভুলে গিয়েচিস। বোস এখানে।

কিন্তু পিনটু বসতে ভরসা পায় না, মা দেখতে পেলে মার খেতে হবে। সে আনমনে খেলা করতে করতে অন্যদিকে চলে গেল। একটু পরে নিস্তারিণী আবার ডাঁকলে—ও ছোট বৌ—ছোট বৌ—

কেউ উত্তর দিল না, কারণ এ সময়ে বাড়িতে কেউ থাকে না।

আরও দু-বার ডাক দিয়ে নিস্তারিণী অবসন্ন হয়ে পড়লো, তার বেশি চেঁচামেচি করবার ক্ষমতা নেই।

বেশ খানিকক্ষণ পরে নির্মলার মেয়ে তারা এসে বললে—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা, ডাকছিলে?

নিস্তারিণী চিঁ চিঁ করতে করতে বললে—কাত্‌রে কাতরে মরে গেলাম। তা যদি তোমাদের একজনও উত্তর দেবে। একজন এমন রুগী বাড়িতে রয়েচে—বোস এখানে একটু—

তারা ওর মায়ের মতো ছিপছিপে গড়নের সুন্দরী বালিকা। নতুন বিয়ের কনে, পাশেই শ্বশুড়বাড়ি। নবীন যুগীর ছেলে অভিলাষ তার স্বামী। এই মাত্র শ্বশুড়বাড়ি থেকেই আসছে। আসবার কারণ অন্য কিছু নয়। অভিলাষ এখুনি গরম মুড়কি মেখেচে, বালিকা স্ত্রীকে আদর করে বলেচে, তোদের বাড়ি থেকে ধামি নিয়ে আয়, মুড়কি খেতে দেবো। এই জন্যেই তার আগমন। রোগগ্রস্তা জ্যাঠাইমা বুড়ির বকুনি শুনবার জন্যে সে এখন এখানে বসতে আসেনি। সুতরাং সে বিব্রত মুখে বললে—ও জ্যাঠাইমা, আমি এখন বসতে পারবো না, তোমার জামাই মুড়কি মেখেচে, নিয়ে বেলেডাঙায় ফিরি করতে বেরুবে—

— তোর মা কোথায়?

— বাড়িতে কেউ নেই। মা গাঙ্গুলীবাড়ি কাজ করতে গিয়েচে, ঠাকুমা নরহরিপুরে হাঁসের ডিম আনতে গিয়েচে—

— পিনটুর মা কোথায়?

— ঐ যে শিউলীতলায় বসে বাসন মাজচে—

— একটু ডেকে দিয়ে যা দিকি মা—

পরে সুর খুবই নীচু করে বললে—মা, দুটো মুড়কি অভিলাষের কাছ থেকে নিয়ে আয় না। আমার নাম যেন করিসনে—

তারা বললে— সে আমি পারবো নি। অসুখ গায়ে মুড়কি খাবে কি? তারপর শেষকালে ঠাক্‌মা টের পেলে আমায় বকে ভূত ছাড়াবে। চললাম আমি— ও বৌদিদি, শুনে যাও, জ্যেঠিমা ডাকচে—

পুত্রবধূ বিরক্ত মুখে এসে দূরে উঠোনে দাঁড়িয়ে বললে— বলি, ডাকের ওপর ডাক কেন অত? আমার সংসারে কাজকর্ম নেই, না, তোমার কাছে বসে থাকলে চলবে? কি বলচো বলো —

নিস্তারিণী কাতরসুরে বললে— তা রাগ করিসনে আমার ওপর-বৌমা। আমায় দুটো ভাত দে—

— দিই। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, ভাত না খেলে কি চলে!

— তবে আমি কি খাবো, খিদে পায় না?

— আমি জানিনে। আদিখ্যেতার কথা শোনো। খিদে পায় তা আমি কি করবো? ঠাক্‌মা এলে বলো। ঠাক্‌মা না বললি আমি ভাত দিতি পারবো না।

— পিনটু কোথায়? একটু ডেকে দে আমার কাছে—বড্ড ইচ্ছে করে দেখতি—

পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—অত সোহাগে আর কাজ নেই। ছেলের মাথা খেয়ে বসে আছে, এখন নাতিটি বাকি।

নিস্তারিণী মিনতির সুরে বললে— অমন করে বলতে নেই, বৌমা। তা দে ডেকে, কিচ্ছু হবে না, দে একবার ডেকে—

পুত্রবধূ হাত-পা নেড়ে বললে— না-না— হবে না। তোমার পাণ্ডুর রোগ হয়েচে, বিশ্রী ছোঁয়াচে রোগ। আমি ছেলে পাঠাতি পারবো না তোমার কাছে। গেলি আমারি যাবে— তোমার কি?

কথা শেষ করেই মুখ ঘুরিয়ে পুত্রবধূ চলে গেল। নিস্তারিণীর দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে ছেঁড়া, ময়লা, তেলচিটে বালিশটা ভিজিয়ে দিলে। এমন কথাও লোককে লোকে বলে— তাও নিজের পুত্রবধূ। সাধনের নাম রেখেচে ওই ধূলোগুঁড়োটুকু—ওই অবোধ শিশু। মা সাতভেয়ে কালী, তার মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন!— সে না তার ঠাকুরমা? বৌমা বলে কিনা, গেলে তারই যাবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে নির্মলা বামুনবাড়ির কাজকর্ম সেরে ফিরে এল। বড় জায়ের কাছে গিয়ে বললে— কেমন আছ দিদি? দেখি, গা দেখি—

নিস্তারিণী না ঘুম না জ্বরে আচ্ছন্নমত হয়ে পড়ে ছিল, কপালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ

পেয়ে জেগে উঠে বললে—কে? ছোট বৌ? তুই আবার আমায় ছুঁলি কেন, তোর পাছে পাণ্ডুর রোগ হয়— আজ আমায় বৌমা বলেছে—হ্যাঁ ছোট বৌ, সাধনের ছেলে আমার কেউ নয়? বলো তুমি—

নিস্তারিণী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। নির্মলা বললে— চুপ করো, চুপ করো দিদি, সবই তোমার কপাল। পিরতিমের মতো বৌ ছিলে, সব তো দেখেচি। স্বভাব-চরিত্তির সম্বন্ধে কেউ একটা কথা বলতি পারেনি কোনোদিন।

— কেন, দেওরদের কোলেপিঠে করে মানুষ করিনি? আমি যখন ঘর করতি এলাম, তোর সোয়ামী তখন ন-বছরের ছেলে। আমার পাত থেকে বেগুন-পোড়া ভাত মেখে খেতো— আর আজ আমি হইচি নাকি ডাইনি—

— চুপ করো দিদি। এসব কথা আমি সব জানি। এখন কি খাবে তাই বলো—

নিস্তারিণী মিনতির সুরে বললে— দুটো ভাত—

— না, আমায় বকিও না। সারাদিন কাজ করে দুঃখ-ধান্দা করে এলাম। দুটো মুড়ি নিয়ে এসেচি—

— শোন ছোট বৌ, অভিলাষ আজ গরম মুড়কি মেখেচে, তারা বলে গেল—

— না, সে সব হবে না। গুড়ের মুড়কি জ্বর হলে খায় না। দুটো তেল নুন দিয়ে মুড়ি মেখে দিক, খেয়ে একঘটি জল খেয়ে আজ রাত্তির মতো পড়ে থাকো। শুনেচ কাণ্ড, বাজারে নাকি চালের পালি দেড় টাকা। ভাত আর খাতি হবে না। বলাই আর কত রোজগার করবে? কি করে এই বিধবার পুরী চালাবে। ধান ফুরিয়ে এসেচে, এবার আমাদের মতো গরিবদের না-খেয়ে মরণ।

নিস্তারিণী স্তব্ধ হয়ে শুনলে। অসুস্থতার দরুন সে বহুদিন অবধি বৈষয়িক ব্যাপারে নিস্পৃহ, তবুও দেড় টাকা এক পালি চাল শুনে সে যেন অত জ্বরের ঘোরের মধ্যেও চমকে গেল। সেকালে যে তাদের গোলার ধান বিক্রি হয়েচে,—আঠারো আনা করে সরু বাঁশসলা কি চামরমণি ধানের মণ।....মনে আছে, একবার তার প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশনের জন্য গোলা থেকে পঁচিশ টাকার ধান বিক্রি হয়— পাঁচ সিকা ছিল এক মণ ধানের দাম।

নিজের হাতে সে কত ধান বিলিয়ে দিয়েচে....একবার গাঁয়ে আকাল হয়েছিল, টাকায় সাড়ে তিন সের হয়ে উঠলো চালের দাম। বামুনপাড়ার মেজ গিন্নি একদিন তাকে বাড়িতে ডেকে বললেন,—"বৌ, তোমায় একটা কথা বলি। খাওয়া-দাওয়ার বড্ড কষ্ট, দু-মণ ধান আমাকে ধার দিতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তোমার কোনো অভাব নেই। গোলা আরও উথলে উঠুক তোমার।" সে শাশুড়ীকে লুকিয়ে দু-মণ ধান বার করে দিয়েছিল গোলা থেকে। শাশুড়ী চিরকালের খাণ্ডার, কাউকে কিছু

জিনিস দেওয়া পছন্দ করতো না কখনো। কিন্তু তখনকার দিনে এ সংসারে তার প্রতিপত্তি ছিল অন্যরকম। সে যা করবে তাই হবে। তার ওপর কথা বলবার কেউ ছিল না। কোথায় গেল সে সব দিন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। নির্মলা এক বাটি দুধ নিয়ে এসে বললেন—ও দিদি, খেয়ে নাও একটু দুধ।

নিস্তারিণী বললে—আমার এখানে একটু বোস ছোট বৌ—কেউ বসে না।

নির্মলার বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসবার জো নেই। এক্ষুণি সব খেতে চাইবে, শেষ রাত্রে উঠে চার কাঠা ধানের চিড়ে কুটতে হবে বাঁড়ুয্যেদের।

তারপর আবার যে একা, সেই একা। সারা দিনরাত আজ একটি মাস ধরে একাই শুয়ে থাকতে হচ্চে। নির্মলা তাকে ধরাধরি করে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিয়ে গেল।

একদিন দু-দিন করে কতদিন যে কাটলো, নিস্তারিণীর কোনো খেয়াল নেই। কেবল আবছা-আবছা দিনগুলো আসে, সে সব দিনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন নিঃসঙ্গ, কেবল ছোট্ট খোকা পিনটুকে দেখতে ইচ্ছে করে....কিন্তু তার মা তাকে পাঠায় না, একটুও বসতে দেয় না কাছে। পুত্রবধূ হয়ে শাশুড়ীকে দেখতে পারে না...তার নাকি ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে বলে। আর কেবল সবাই বকে, সবাই বকে।

একদিন সে শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করলে আর আকাশে বৃষ্টি হয় না। হলদে রঙের রোদ বাঁশঝাড়ে, আমগাছের মাথায়। তেলাকুচো লতায় সাদা সাদা ফুল ধরেচে, বলাইয়ের হাতে পোঁতা উঠোনের রাঙা ডাঁটা শাক ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। বর্ষাকাল তা হলে চলে গিয়েছে।

পুত্রবধূ আমতলায় কাট কাটছে। জিজ্ঞ্যেস করলে— ও বৌমা, এটা কি মাস?

— সে খোঁজে কি দরকার তোমার?

— বল না বৌমা।

শেষা ভাদ্দর। তোমার কি হুঁশ পোড়েন আছে? সেদিন চাপড়া ষষ্ঠী গেল, খোকাকে তোমার আশীর্বাদ করা দরকার। তোমার কাছে গিয়ে ডাকলে, তা যদি একটা কথা বললে—

বিকেলে ও-পাড়ার বুধো গোয়ালার মা দেখা করতে এসে বললে—ও মা, এ কি চেহারা হয়ে গিয়েছে! আহা, কতদিন হয়েছে আসিনি— বলি, শুনচি বড্ড অসুখ, একবার দেখে আসি। উদরী হয়েছে বুঝি, পেট যে ফুলেচে বড্ড। সোনার পিরতিমে চেহারা ছিল বৌমার। আমি তো আজকের লোক নই, যখন হরি প্রথম বিয়ে করে এল— ওই আমতলায় দুধে-আলতার পিঁড়িতে দাঁড়াল, বেশ মনে আছে। রূপে একেবারে ঝলক দিয়ে গেল যেন। সে চেহারার আর কিছু নেই। এমন নক্ষি বৌ—

আহা, তার এত কষ্টও ছেল অদেষ্টে।

নিস্তারিণী যেন সব বিষয়ে নিস্পৃহ, উদাসী হয়ে পড়েছে। এ সব কথা শুনে যায় বটে, কিন্তু কার বিষয়ে কে যেন কথা বলছে। সে কালের সে বড়বৌ তো কোনকালে মরে-হেজে গিয়েছে। সে রূপসী, লক্ষ্মীর মতো সংসারজোড়া বড়বৌ কোথায় আজ?...কেবল খেতে ইচ্ছে হয়। পান্তাভাত কতকাল খায়নি। কেউ দেয় না— দেখাই করে না এসে। সন্ধ্যার পরে নির্মলা এসে একটু কাছে বসে। বলে—ও দিদি, তোমার জন্যি একটা জিনিস এনেছি মনিববাড়ি থেকে।

নিস্তারিণী ব্যগ্রভাবে বলে— কি— কি?

— চুপ করো। দুটো তালের বড়া। গিন্নি ভাজছে, তা আমাকে খেতে দেলে—

— কতকাল খাইনি। দে—

নির্মলা বেশীক্ষণ বসতে পারে না, রান্নাঘরে খই ভেজে দিতে হবে জামাই অভিলাষকে। তারা বলে দিয়েছে— কাল মুড়কি মাখবে সকালবেলা। সে মুড়কির ব্যবসা করে, কিন্তু খই ভাজা কাজটা মেয়েমানুষের, পুরুষের নয়— ওটা শাশুড়ীর বিনা সাহায্যে সম্পূর্ণ হয় না।

রান্নাঘরে যেতে সাধনের বৌ বললে—কাকীমার বুড়ির কাছে রোজ বসা চাই-ই। অমন ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে— পাপের দেহ তাই কষ্ট পাচ্ছে— নইলে মরে যেত কোনকালে।

নির্মলা ধমক দিয়ে বললে— অমন বলিসনে বৌমা, মুখে পোকা পড়বে। সতী নক্ষী মেয়ের নামে কিছু বোলো না। তোর আপন শাশুড়ী না? তুই ও-সব কথা মুখে বের করিস কি করে? আজই না হয় ও অমন হয়ে গিয়েচে— ও যে কি ছিল, আমি সব দেখিচি। এই সংসারের যা কিছু ঝক্কি চিরটাকাল ও পুইয়েছে। দেওরদের মানুষ করা, বিয়ে-থাওয়া দেওয়া— ও না থাকলে সংসার টিকতো না। আজই না হয় ওর—

সাধনের বৌ ঠোঁট উল্টে বললে— হোক গে যাক বাপু। ও নিজের ছেলে খেয়েছে— ওর ওপর আমার এতটুকু ছেদ্দা নেই। যতই বলো।

— ও খেয়েছে, কি বলিস বৌমা! ও ছেলে খেয়েছে! যাবার অদেষ্টে যায় চলে। কার দোষ দেবো? তা হোলে তো তোকেও বলতে পারি— তুই সোয়ামী খেয়েছিস।

এই কথার উত্তরে খুড়শাশুড়ী ও বৌয়ে তুমুল ঝগড়া বেধে উঠলো।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি। পুজো প্রায় এসে পড়েছে। নিস্তারিণী একেবারে উত্থানশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। দিনের অর্ধেক সময় তার জ্ঞান থাকে না। এক-একবার চেতনা সজাগ হয়ে ওঠে, তখন কেবল এদিক-ওদিক চেয়ে নাতিকে খোঁজে,

নির্মলাকে খোঁজে। ওর মলিন বিছানা ও সারা দেহে কেমন একটা দুর্গন্ধ বলে আজকাল কেউই কাছে আসতে চায় না। কেবল খাওয়ার সময় কোনোদিন নির্মলা, কোনোদিন বা সাধনের বৌ দুটি ভাত দিয়ে যায়। সেদিন ও চোখ মেলে ভাত খাবার চেষ্টা করলে— কিন্তু পারলে না। অনেকক্ষণ পরে পুত্রবধূ বললে—ভাত খাওনি যে, খাইয়ে দেবো?

নিস্তারিণী অবাক হয়ে গেল অসুখের ঘোরের মধ্যেও। বললে— তাই দে বৌমা।

সাধনের বৌ ভাত দুটি খাইয়ে এঁটো থালা নিয়ে চলে গেল। একটু পরে নির্মলা বাড়ি এল। রোগীকে দেখতে গিয়ে ওর মনে হল অবস্থা ভালো নয়। আপন মনে বললে— ঠাকুর, ওকে মুক্তি দাও, বড্ড কষ্ট পাচ্ছে—

প্রতিদিন সন্ধ্যায় যেমন নিস্তারিণীর জ্ঞান হয় আজও তেমনি হল। জাকে অবোধ বালিকার মতো আবদারের সুরে বললে— দুটো পান্তাভাত আর ইলিশ মাছ ভাজা খাবো—

নির্মলা দু-তিন দিন চেষ্টার পরে অতি কষ্টে এই যুদ্ধের বাজারে ইলিশ মাছ জুটিয়ে এনেছিল, কিন্তু জাকে খেতে দিতে পারেনি।

নিস্তারিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে ঝুঁকলো পরদিন দুপুর থেকে।

সে অসুখের ঘোরে কোন্ বিস্মৃত পথ বেয়ে ফিরে গেল তার যৌবন দিনের দেশে। বাঁড়ুয্যেদের ন-গিন্নী যেন এসে হেসে বলচেন, আমায় আজ দু-কাঠা চাল ধার দিতে হবে বৌ। বৌমা তাড়িয়ে দিয়েচে বাড়ি থেকে—তুমি না দিলে দাঁড়াবো কোথায়?...যে সব লোক কত কাল আগে চলে গিয়েচে, তারা যেন এসে দিনরাত ওর বিছানার চারিপাশে ওকে ঘিরে ভিড় করচে। বহুদিন পূর্বের শরৎ-অপরাহ্ণের মতো হাট থেকে ফিরে ওর স্বামী যেন হাসিমুখে বলচে— ও বড়বৌ, কলা বিক্রির দরুন টাকাগুলো এই নাও, তুলে রেখে দাও— আর এই ইলিশ মাছটা— ভারি সস্তা আজ হাটে—

ওর সব দুঃখ, সব অপমান অনাদরের দিনের, হঠাৎ আজ এমন অপ্রত্যাশিত অবসান হল কিভাবে? নিস্তারিণী অবাক হয়ে যায়, বুঝতে পারে না কোনটা স্বপ্ন— কোনটা সত্য। সে একগাল হেসে স্বামীর হাত থেকে ইলিশ মাছটা নেবার জন্যে হাত বাড়ায়।

নির্মলা চোখ মুছতে মুছতে বললে— সতী লক্ষ্মী সগ্‌গে চলে গেল— বৌমা পায়ের ধুলো নে— তারপর সে নিজেও ঝুঁকে পড়ে মাতৃসমা বড় জায়ের পায়ে হাত ঠেকায়।

গায়ে হলুদ

শ্রাবণ মাসের দিন, বর্ষার বিরাম নেই, এই বৃষ্টি আসছে এই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্চে। ক্ষেতে আউশ ধানের গোছা কালো হয়ে উঠচে, ধানের শিষ দেখা দিয়েচে অধিকাংশ ক্ষেতে।

পুঁটি সকালে উঠে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে— চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন। হয়তো বা একটু পরে টিপ্‌-টিপ বিষ্টি পড়তে শুরু করে দেবে। আজ তার মনে একটা অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি, সেটাকে আনন্দও বলা যেতে পারে, ছদ্মবেশী বিষাদও বলা যায়। কি যে সেটা ঠিক করে না যায় বোঝা, না যায় বোঝানো। আজ তার বিয়ের গায়ে-হলুদের দিন। এমন একটা দিন তার বারো বৎসরের ক্ষুদ্র জীবনে এইবার এই প্রথম এল। সকালে উঠতেই জ্যেঠিমা বলেচে— ও পুঁটি, জলে ভিজে ভিজে কোথাও যেন যাসনি ; আর তিনটে দিন কোনও রকমে ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে যে বাঁচি।

আজ কি বার ?—মঙ্গলবার। শনিবার বুঝি বিয়ের দিন। পুঁটির মনে সত্যিই কেমন হয়, আনন্দের একটা ঢেউ যেন গলা পর্যন্ত উঠে আটকে গেল। বিয়ে বেশি দূরে কোথাও নয়, এই গ্রামেই, এমন কি এই পাড়াতেই। এক ঘর ব্রাহ্মণ আজ বছরখানেক হল অন্য জায়গা থেকে উঠে এসেচেন এখানে, দু-খানা বড় খড় মেটে ঘর বেঁধেচেন একখানা রান্নাঘর। এতদিন ধরে সে সঙ্গিনীদের সঙ্গে সেই বাড়িতে কুল পাড়তে গিয়েচে, সত্যনারাণের সিন্নি আনতে গিয়েচে, যখন পাড়ার প্রান্তের ঘন জঙ্গল কেটে সে ভদ্রলোক বাড়ি তৈরি করেন ঘাটে যাবার পথের একেবারে ডান ধারে, তখন সে কতবার ভেবেচে এই ঘন বনের মধ্যে বাড়ি করে বাস করবার কার না জানি মাথাব্যথা পড়ল।

কে জানত, সেই বাড়িটাই— আজ এক বছর এখনও পোরেনি— তার শ্বশুরবাড়ি হবে!

কতদূর আশ্চর্যের কথা, কতদূর বিস্ময়ের কথা, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ তারই ক্ষুদ্র জীবনে এমন একটা মহাশ্চর্য ব্যাপার সম্ভব হল। যখনই সে এ কথাটা ভাবে তখনই সে সুদ্ধু তার মন সুদ্ধু যেন কতদূরের কোথায় চলে যায়।

ঐ ভদ্রলোকের একটি মাত্র ছেলে, নাম সুবোধ, তারই সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েচে। সুবোধকে এই সম্বন্ধের আগে তাঁদের বাড়িতে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেচে—বেশ ফর্সা, লম্বামত মুখ, এবার ম্যাট্রিক দিয়েচে, এখনও পরীক্ষার ফল বার হয়নি। আগে আগে, সত্যি কথা বলতে গেলে, সুবোধের মুখ পুঁটি তত পছন্দ

করতো না। তার দাদার সঙ্গে যতবার এসেচে তাদের বাড়িতে পুঁটি ভাবতো— দেখো না ঘোড়ার মতো মুখখানা। কিন্তু আজকাল আর সুবোধের মুখ ঘোড়ার মতো তো মনে হয়ই না, মনে হয় বেশ চমৎকার মুখ। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে অমন চোখ অমন রং, অমন মুখের গড়ন কার আছে?

রায়েদের পাঁচি সেদিন বলেছিল তাকে— হ্যাঁরে, তুই যে বড় ঘোড়ামুখো বলতিস, তোর অদেষ্টে শেষকালে কিনা সেই ঘোড়ামুখোই জুটল।

পুঁটি মারতে ছুটে গিয়েছিল তার পিছু-পিছু।

পুঁটির বাবা গোলার দোরে দাঁড়িয়ে ধান পাড়বার ব্যবস্থা করচে। তার বাবা বেশ চাষীবাসী গেরস্ত। পুঁটিদের বাড়িতে চারটা বড় বড় ধানের আউড়ি আছে, গোলা আছে একটা। আউড়ি জিনিসটা গোলার চেয়ে অনেক ছোট, তিন-চার বিশ ধান ধরে—আর একটা গোলায় ধরে এক পৌটি অর্থাৎ যোলো বিশ ধান।

তাদেরও ধান আছে গোলাভর্তি, সব ক'টা আউড়িভর্তি। কলিকাতায় চাকুরি করেন এ পাড়ার হরিকাকা, তিনি মাঝে মাঝে গাঁয়ে এসে পুঁটির বাবাকে বলেন—আর কি রায় মশায়, এ বাজারে তো আপনিই রাজা। গোলাভর্তি ধান রেখেচেন ঘরে, আপনার মহড়া নেয় কে? কলকাতায় 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে এক সের চাল নিতে হচ্চে— আর আপনি—

পুঁটি জিজ্ঞেস করেছিল—কিসে দাঁড়িয়ে চাল নিতে হয় বাবা, বলছিল হরিকাকা?

— কে জানে কিসে দাঁড়িয়ে, তুই নিজের কাজ কর, আমি নিজের করি— মিটে গেল।

— তুমি জান না বুঝি ও কথাটার মানে? না বাবা?

— না জেনেও তো পায়ের ওপর পা দিয়ে এ বাজারে চালিয়ে দিলাম মা। কলকাতার মুখ না দেখেও তো বেশ যাচ্চে।

কলকাতায় নাকি মানুষের এক সের চালের জন্যে চার ঘণ্টা কোথায় নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়— যে বাড়িতে তার বিয়ে হচ্ছে, তাদের অবস্থা এত ভালো নয়। সুবোধ যদি পাস করে, তবে হরিকাকা ভরসা দিয়েচেন কলকাতায় নিয়ে তাকে ওঁর আপিসে চাকুরি করে দেবেন। তা হলে তাকেও কি কলকাতায় গিয়ে বাসায় থাকতে হবে আর সেই কিসে দাঁড়িয়ে রোজ এক সের চাল নিয়ে এসে রাঁধতে হবে? সে বড় কষ্ট— তবে মানে সুবোধ যদি সঙ্গে থাকে, সে বোধ হয় সব রকম কষ্টই করতে প্রস্তুত আছে।

তাদের ধানের গোলা থেকে ধান পাড়া হচ্চে, খাব্‌রাপোতা থেকে সতীনাথ কলু আড়ৎদার এসেচে— ধান কিনে নিয়ে যাবে। বিয়ের খরচপত্র ধান বেচে করতে হবে

কিনা।

ওর জ্যেঠিমা বললেন— ও পুঁটি, আজ কোথাও বেরিও না। নাপিত ও-বাড়ি থেকে হলুদ নিয়ে আসবে, সেই হলুদ গায়ে দিয়ে তোমায় নাইতে হবে।

এমন সময় সাধন জেলে এসে ভিজতে ভিজতে উঠোনে দাঁড়াল। হাত জোড় করে মাথা নীচু করে প্রণাম করে বললে—প্রাতপেন্নাম।

তার বাবা বললে— ও সাধন, বাবা, তোমায় ডেকেছি যে একবার। আমার যে কিছু মাছের দরকার এই শনিবারে।

কি জানি কেন, পুঁটির বুকটা দুলে উঠল। এই শনিবার— এই শনিবারে তা হলে সত্যিই তার—

সাধন বললে— আজ্ঞে, মাছের যে বড্ড গোলমাল যাচ্চে। গাঙে কি মাছ আছে? ডুমোর বাঁওড়ের মাছ সব যাচ্চে কলকাতায়। বিরাশি টাকা দর। এমন দর বাপের জন্মে কোনও কালে শুনিনি রায় মশায়। এক সের দেড় সের পোনা ইস্তক পড়তে পাচ্চে না। মরগাঙে বাঁধাল দিয়েলাম— একদিন কেবল একটা সাড়ে এগারো সের গজাড় মাছ—

পুঁটির বাবা বিস্ময়ের সুরে বললে—সাড়ে এগারো সের গজাড়! এমন কথা তো কখনও শুনিনি—

—অরিবৎ গজাড় রায় মশায়। মাছের এমন দর, গজাড় মাছই বিক্রি হয়েল দশ আনা সের।

পুঁটি আর সেখানে দাঁড়াল না। মাকে এমন আজগুবী খবরটা দিতে ছুটল বাড়ির মধ্যে। বিষ্টি একটু থেমেছে, একটু কোথাও বেরুতে পারলে ভালো হত। তার জীবনে যে একটা আশ্চর্য ব্যাপার হতে চলেচে এ কথাটা কারও সঙ্গে আনন্দ করে বলাও চলে না। বেহায়া বলবে, নিন্দে করবে। কেবল বলা চলে তার সমবয়সী পাঁচি আর ক্ষেন্তি জেলেনীর মেয়ে টুনির কাছে। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার— তার চেয়ে অন্তত সাত বছরের বড় লতিদিদির এখনও বিয়ে হয়নি—অথচ লতিদিকে সবাই বলে সুন্দরী, লতিদির বাপের অবস্থা ভালো। লতিদি লেখাপড়া জানে ভালো। গান করে, ওর বাবা যখন কলকাতায় চাকরি করত, তখন লতিদি স্কুলে পড়ত সেখানে। কত বই পড়ে বসে বসে দুপুর বেলা। পুঁটি ভালো লেখাপড়া জানে না, বইয়ের নাম পড়তে পারে না, লতিদি একটু ঠ্যাকারে, সে লেখাপড়া জানে না বলে বুঝি আর মানুষ না?

তাকে বলে—তুই বই-টই নাড়িসনে পুঁটি। কি বুঝিস তুই এর আস্বাদ?

পুঁটি হয়তো বলে— এ কি বই বল না লতিদি।

— যাঃ যাঃ, আর বইয়ের খবরে দরকার নেই। শরৎ চাটুজ্যের নাম শুনেচিস।

কোথা থেকে শুনবি? তোরা শুধু জানিস ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কি করে চিঁড়ে কুটতে হয়। তাই করগে যা— এদিকে কেন আবার?

আচ্ছা, আজ তার লতিদিকে বলতে ইচ্ছে হচ্চে— কই লতিদি, তুমি এত বই পড়ে-টড়ে বসে আছ, এত সব নাম জান— কই, তোমার তো আজও বিয়ে হল না। আমার জীবনে এত বড় একটা আশ্চর্যি কাণ্ড তো টুক্ করে ঘটে গেল। ধানের নিন্দে কর, বাবার গোলায় ধান ছিল বলে তো আজ—কই, তোমাদের তো—তারপর ম্যাট্রিক পাস বর। এ গাঁয়ে পাসকরা ছেলে একমাত্র আছে মুখুজ্যেদের জীবনদা। সে নাকি দুটো পাস—কোথায় চাকরি করচে যেন—ঐদিকে কোথায়। যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্চে, সে মুখ্যু নয়। পাসের খবর বেরুবার দেরি নেই—বাবা বলেন, সুবোধ নিশ্চয়ই পাস করবে। হে ভগবান, তাই করো, পাস যেন সে করে, সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে সে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে।

নাপিত এসে বললে মা ঠাকরুন, ও-বাড়ি থেকে দেখে এলাম। গায়ে-হলুদের লগ্ন বেলা দশটার পর। আপনাদের যা দিতে হবে তার আগে দিয়ে দেবেন।

গায়ে-হলুদের তত্ত্ব আসবে ও-বাড়ি থেকে। কি রকম জিনিসপত্র না জানি আসে। পুঁটির মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। একখানা লাল কাপড় নিশ্চয়ই তারা দেবে। পুঁটির মোটে তিনখানা শাড়ি আর একখানা ডুরে শাড়ি আছে মায়ের বাক্সে তোলা। এবার তার অনেক কাপড় হবে, গহনাও হবে। পাঁচ ভরি সোনা দেবার কথাবার্তা হয়েচে। এতদিন দুটি দুল ছাড়া অন্য কোনও গহনা তার অঙ্গে ওঠেনি— অথচ ঐ কুমারী মেয়ে লতিদিরই হাতে ছ-গাছা করে চুড়ি, গলায় লকেট্ ঝোলানো হার, কানে পাশা, হাতে আংটিও আছে। ও থাকতো শহরে, সেখানে মেয়েদের চালচলন আলাদা। এসব পাড়াগাঁয়ে কুমারী মেয়েরা কাচের চুড়ি ছাড়া আবার কি গহনা পরে? অত পয়সাও নেই তার বাপের। গোলায় দুটো ধান আছে মাত্র, নগদ পয়সা কোথায়? যা কিছু করতে হয়, সে ঐ ধান বেচে।

ভীষণ বৃষ্টি এসেচে। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ঝড়। রান্নাঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে বকনা বাছুরটা ভিজচে। কচুপাতায় জল জমে আবার গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়চে। তাদের কৃষাণ বীরু মুচি বলচে— ও দিদি ঠাকুরোন, তা একটু তামাক দ্যাও মোরে, বিয়েবাড়ি যে মনেই হচ্চে না। দু-দশ ছিলিম তামাক পোড়বে তবে তো বোঝবো যে নগনশা লেগেচে।

পুঁটি বীরুকে ধমক দিয়ে বললে— যাঃ, তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। তামাক আমি কোথায় পাবো? কাকীমার কাছে গিয়ে চাইগে যা—

একটু বেলা হয়েচে। বাড়িতে অনেক লোক এসেচে বিয়ের জন্যে। বিয়েবাড়ির মতো দেখাচ্চে বটে— কুমোরপুরের কাকীমা, পাঁচঘরার মাসীমা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেচেন— আজ বেলা এগারোটার সময়ে আরও একদল আসবে, ইস্টিশানে গাড়ি গিয়েচে। মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে নাইতে গেল। কুমোরপুরের কাকীমা যাবার সময়ে তাকে বলে গেল— বাঁড়ুয্যে-বাড়ি পিঁড়ি চিত্তির করতে দিয়ে আসা হয়েচে, দেখে আসিস পুঁটি সে দু-খানা পিঁড়ি হয়েচে কি-না।

কাকীমার এটা অন্যায় কথা। তার লজ্জা করে না? নিজের বিয়ের পিঁড়ি নিজে বুঝি সে চাইতে যাবে? এত বেহায়া সে এখনও হয়নি।

তার বাবা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে হেঁকে বললেন— ও পুঁটি, হাতায় করে একটু আগুন নিয়ে এস মা—

চণ্ডীমণ্ডপের দোর পর্যন্ত গিয়ে ও শুনলে ওর বাবা আর একজন অজ্ঞাত লোকের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্তা

— তা হলে পালকির বন্দোবস্ত দেখতে হয়—

— আজ্ঞে পালকি কোথায় মিলবে? ষোলোডুবুরির কাহারপাড়া নির্বংশ। পালকি বইবার মানুষ নেই এ দিগরে।

— তবে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এস বনগাঁ থেকে।

— এ কাদা-জলে দশ টাকা দিলেও আসবে না। আসবার রাস্তা কই?

— ওরা বিদেশী লোক। বর আসবার ব্যবস্থা আমাদেরই করে দিতে হবে, বুঝলে না? আমরাই পারচিনে, ওরা কোথায় কি পাবে? হিম হয়ে বসে থেকো না। যা হয় হিল্লে লাগিয়ে দ্যাও একটা।

— আচ্ছা বাবু, বলদের গাড়িতে বর আনলি কেমন হয়?

— আরে না না— সে বড় দেখতে খারাপ হবে। সে কি— না না। শুনচি ওরা ইংরিজি বাজনা আনচে। বলদের গাড়ির পেছনে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে, তাতে লোক হাসবে।

— কেন বাবু, তাতে কি? বলদের গাড়িতে কি আর বর যায় না? একেবারে আপনাদের বাড়ির পেছনে এসে থামবে— সেই তো ভালো।

— বলদের গাড়িতে বর যাবে না কেন? সে কি আর ভদ্দরলোকের বর যায়? তা ছাড়া পেছনের ওপথ আইবুড়ো পথ। ওখান দিয়ে বর আসবে না, সামনের তেঁতুলতলার রাস্তা দিয়ে বরকে আনতে হবে। তুমি আজই যাও দিকি ষষ্ঠীতলা। সেখানে ক-ঘর কাহার আছে শুনিচি। সেখান থেকেই পালকি আনাতে—

— সে যে এখান থেকে তিন কোশ সাড়ে তিন কোশ রাস্তা বাবু।

পুঁটি সেখানে আর দাঁড়ালো না। সুবোধ আসবে বর সেজে বলদের গাড়িতে? হি— হি— সে বড় মজা হবে এখন। ধুতরো ফুলের মালা গলায় দিয়ে?

দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করে নিয়েই হাসতে হাসতে পুঁটির দম বন্ধ।

— ও তিনু— তিনু রে— শোন শোন একটা মজার কথা—

তিনু চার বছরের খুড়তুতো ভাই। উঠোনের নীচে দিয়েই যাচ্চে। সে মুখ উঁচু করে ওর দিকে চেয়ে বললে— কি লে ডিডি?

— জানিস? এই আমাদের বাড়ি বর আসবে—

— বল?

— হ্যাঁ-রে। ধুতরো ফুলের মালা পরে বলদের গাড়ি চেপে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে— হি— হি—

তিনু না বুঝে হাসলে— হি— হি—

এই সময়ে ওদের জ্যাঠাইমা বাড়ির ছেলেমেয়েকে ডাক দিলেন— ওরে, সবাই এসে কাঁঠাল খেয়ে যা— ও হিমু, পান্তা ভাত কে কে খাবে ডাক দিয়ে নিয়ে আয়। এক হাঁড়ি পান্তা রয়েচে সেগুলো কাঁঠাল দিয়ে ওঠাতে তো হবে। ভাত ফেলতে পারবো না এই যুধ্যের বাজারে—

পান্তা ভাত ও কাঁঠাল পুঁটির অতি প্রিয় খাদ্য। কিন্তু আজ এখন তার খাবার নাম করবার জো নেই— খিদেও পেয়েছিল, ইচ্ছে করলে সে কলসী থেকে কাঁঠালবীচি ভাজা আর মুড়ি লুকিয়ে পেড়ে নিয়ে খেতে পারতো— কিন্তু সে ইচ্ছে তার নেই। তাতে ভগবান রাগ করবেন। আজকের দিনে সে ভগবানকে রাগাবে না।

বেলা বাড়লো। ও বাড়িতে শাঁক ও হুলুর শব্দ শোনা গেল। অবিশ্যি খুব কাছে নয় পুঁটির ভাবী শ্বশুরবাড়ি। তা হলেও শাঁকের শব্দ না আসবার মতো দূরও নয়।

ওর খুড়তুতো বোন শ্যামা বললে— ওই শোন দিদি, দাদাবাবুর গায়ে হলুদ হচ্চে—

পুঁটি ধমক দিয়ে বললে— চুপ। মেরে ফেলে দেবো। দাদাবাবু কে?

— বা-রে, হয়েচেই তো— আর তো দু-দিন দেরি—

— না। তা হোক। আগে থেকে বলতে নেই।

— জ্যাঠাইমা তো বলচে।

— কি বলচে?

— বলচে, আমাদের জামাইয়ের গায়ে-হলুদ হচ্চে—সেখান থেকে তত্ত্ব নিয়ে নাপিত এবার এসে পৌঁছে যাবে—

— তা বলুক গে। আমাদের বলতে নেই।

— আচ্ছা দিদি— দাদাবাবু— ইয়ে সুবোধবাবু পাস করেছে?

— খবর এখনও বের হয়নি।

— আমি ও-পাড়ায় রাধীদের বাড়ি গিইছিলাম এই এট্টু আগে। রাধীর দাদা পাস করেচে, কাল বিকেলে কলকাতা থেকে ওর কাকা খবর দিয়েচে।

— তোর দাদাবাবুর— ইয়ে মানে ওর— দূর, ওই কেশববাবুর ছেলের খবর কে পাঠাবে কলকাতা থেকে? ওদের তো কেউ নেই কলকাতায়।

একটু পরে ওদের বাড়িতে শাঁক বেজে উঠলো, হুলু পড়লো। নাপিতে তত্ত্ব নিয়ে আসচে তেঁতুলতলার পথে, বাড়ি থেকে দেখা গিয়েচে।

পুঁটির বুক আনন্দে দুলে উঠলো— জ্যাঠাইমা বলছিলেন, আশীর্বাদ হয়ে গেলেও বিয়ে না হতে পারে, কিন্তু গায়ে-হলুদ হয়ে গেলে বিয়ে নাকি আর ফেরে না।

এবার তা হলে সেই আশ্চর্য ব্যাপারটা তার জীবনে ঘটে গেল।

কেউ আর বাধা দিতে পারবে না। পাড়াগাঁয়ে কত রকমে ভাঙচি দেয় লোকে। তার বিয়েতেও ভাঙচি দিয়েছিল। বলেছিল, মেয়ের রং কালো, মুখ-চোখ ভালো না— লেখাপড়া জানে না— আরও কত কি। কিন্তু সুবোধ— না। ছিঃ, ও নাম করতে নেই, নাম হিসেবে মনে ভাবতে নেই।

তারপর বাকি অনেকগুলো কি ব্যাপার স্বপ্নের মতো তার চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেল। শাঁকের বাদ্যি, হুলুধ্বনি, মা, কাকীমা, জ্যাঠাইমা তাকে তেল-হলুদ মাখিয়ে দিলেন। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এল লালপাড় শাড়ি, তেল-হলুদ, একটা বড় মাছ, এক হাঁড়ি দই। তার সমবয়সী বন্ধু তিনজন খেতে এল তাদের বাড়ি। তাকে কাছে বসিয়ে কত যত্ন করে মাছ দিয়ে, দই দিয়ে, মা জ্যাঠাইমা কত আদর করে খাওয়ালেন, কত মিষ্টি কথা বললেন। সোনার পিঁড়িতে সিঁদুর দেওয়া হল, প্রদীপ দেখানো হল— যাতে শূন্য ধানের গোলা সামনের ভাদ্র মাসে আউশ ধানে অন্তত অর্ধেকটা পুরে যায়। বাবা বলেন, গোলার ধান খালি হয়ে যেতো না। মধ্যে কি একটা গভর্নমেন্টের হাঙ্গামা এল— কেউ গোলায় ধান জমিয়ে রাখতে পারবে না। তাতেই অনেক ধান কর্জ দিতে হল গ্রামের লোকজনকে।

গায়ে-হলুদের তত্ত্বে আরও অনেক জিনিস এসেছিল, খাওয়া-দাওয়ার পরে গাঁয়ের মেয়েরা কেউ কেউ দেখতে এল— তখন সে নিজেও দেখলে। আগে লজ্জায় ওদিকেও সে যায়নি। একটা শাড়ি, একটা ব্লাউজ, সায়া একটা— আলতা, সাবান, আয়না আর গন্ধ তেল। এসব জিনিস তার নিজস্ব। কারও ভাগ নেই এতে। সে ইচ্ছে করে যদি কাউকে দেয় তবেই সে পাবে, নইলে নিজের বাক্সে রেখে দিতে পারে, কারও কিছু বলবার নেই।

সব কাজ মিটতে বেলা দুটো বেজে গেল।

পুঁটির মন ছটফট করছিল, ও পাড়ার লতিদি, হিমি, অন্ন, রাধা— এরা কেউ আসেনি— এদের গিয়ে একবার দেখা দেওয়া দরকার— যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তার গায়ে-হলুদের মতো আশ্চর্য ব্যাপারটা আজ সত্যিই ঘটে গিয়েচে। আচ্ছা, যখন ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে তাদের বাড়ির দোরে তেঁতুলতলার ওই পথটা দিয়ে, বোধনতলার কাছে পালকি নামিয়ে প্রণাম করে— বাজি পুড়বে, লোকজনের হৈ হৈ হবে— ওঃ, সে সময়ের কথা ভাবাও যায় না। দেখে যেন পাড়ার সব মেয়েরা এসে।

সে বেড়াতে বেড়াতে গেল মুখুয্যেবাড়ি। মুখুয্যে-গিন্নি ওকে দেখে বললেন— কি রে পুঁটি, আয় মা, আয়। গায়ে-হলুদ হয়ে গেল? আহা, এখন ভালোয় ভালোয় দু-হাত এক হয়ে গেলে— বোসো মা, বোসো।

একটু পরে লতিকাও সেখানে এসে হাজির হল। পুঁটিকে দেখে বললে— ও পুঁটি, তোর আজ গায়ে-হলুদ ছিল না? হয়ে গেল? কি তত্ত্ব এল শ্বশুরবাড়ি থেকে?

মুখুয্যে-গিন্নি বললেন—বোস মা তোরা। লতি, পুঁটির সঙ্গে গল্প কর। একটা চা করে আনি। যাক, ভালোই হল, আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কী কষ্ট, যে দেয় সে-ই জানে!

পাশের বাড়ির জানালা দিয়ে গাঙ্গুলীদের ছোট বৌ ডেকে বললে—ও কে, পুঁটি নাকি? গায়ে-হলুদ হয়ে গেল? তা কই, আমাদের একবার বলতেও তো হয়। এই তো বাড়ির পেছনে বাড়ি—

পুঁটি বললে— গেলেন না কেন বৌদি? আমরা তো বারণ করিনি যেতে। শাঁক যখন বাজলো, তখনও যদি যেতেন—

লতিকা ভাবলে, পুঁটি ছেলেমানুষ, এ উত্তরটা দেওয়া ওর উচিত হল না। এখানে ওকথা বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু এর পরবর্তী ব্যাপারের জন্যে সে বা পুঁটি কেউ প্রস্তুত ছিল না। গাঙ্গুলীদের ছোট বৌ মুখ লাল করে উত্তর দিলে— কি বললি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমরা কখনও গায়ে-হলুদ দেখিনি, শাঁকে ফুঁ পড়লে অমনি কুকুরের মতো ছুটে যাব তোমাদের বাড়ি পাতা পাততে? অত অংখার ভালো না রে পুঁটি। তোমার বাপের বড্ড ধানের গোলা হয়েচে, না? অমন বিয়ে আমরা কখনও কি দেখিচি জীবনে? ছেলের না আছে চাল, না চুলো— সংসারে মানুষ নেই বলে হাঁড়ি ঠেলতে নিয়ে যাচ্চে। ছেলের বিদ্যে কত, তা জানতে বাকি নেই— এবার তো ম্যাট্রিক ফেল করেচে—

এখানে লতিকা আর না থাকতে পেরে বললে— কে বললে ছোট বৌদি?

সুবোধবাবুর পাসের খবর তো পাওয়া যায়নি?

— কেন পাওয়া যাবে না? চিঠি এসেচে ফেল করেচে বলে— ওরা সে চিঠি লুকিয়ে ফেলেচে। বিয়ের আগে ও-খবর জানাজানি হতে দেবে না। উনিই হাট থেকে চিঠি আনেন। পোস্টকার্ডে চিঠি। উনি সন্দের পর সুবোধদের বাড়ি দিয়ে এলেন। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া—

পুঁটির চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে বিশ্বসংসার লেপে মুছে গিয়েচে। মুখরা দর্পিতা ছোট বৌয়ের মুখের কাছে সে কি করে দাঁড়াবে? চেঁচামেচি শুনে মুখুয্যে-গিন্নি হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন, লতিকা ওর হাত ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল।

মুখুয্যে-গিন্নি ঘরের মধ্যে এসে চাপা গলায় বললেন— আহা, ছেলেমানুষ— ওর সাদ-আহ্লাদের দিনটা অমন করে বিষ ছড়াতে আছে—ছিঃ ছিঃ— দ্যাখ তো মা লতি, কাণ্ডটা—

কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট পুঁটির হাত ধরে ততক্ষণ লতিকা বলচে— চল চল পুঁটি, তোকে বাড়ি দিয়ে আসি— ছিঃ, বৌদির কী কাণ্ড! ওসব কথা মনে করিসনে, মিথ্যে কথা। চল পুঁটি— ভাই—

লতিকার গলার সুরে ও কথার ভাবে কিন্তু পুঁটির মনে হল লতিদিও এ খবরটা জানে—কি জানে হয়তো গাঁয়ের সবাই জানে—সে-ই কেবল জানতো না এতক্ষণ। পথে পা দিয়েই লজ্জায় অপমানে সে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলে বললে—লতিদি, আমি কী বলেছিলাম ছোট বৌদিকে? খারাপ কথা কিছু?

ঠাকুরদার গল্প

অনেক দিন আগের কথা।

একালে সে জিনিস শুনলে ভাববে গল্পকথা বুঝি, কিন্তু সেকালের দেশের সামাজিক অবস্থা ছিল অন্যরকম, তখন ওরকম সম্ভব ছিল।

যাক, আসল গল্পটা বলি

আমার তখন বয়স কুড়ি-একুশ— একহারা চেহারা, মাথায় বাবরি চুল, গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখি। খেতেও পারি খুব। ভোজসভার নামকরা খাইয়ে ছিলেন সেকালে আমার পিতামহ তোমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ বিষ্ণুরাম রায়, সারসার জমিদারবাড়িতে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে পুরো খাওয়ার পর এক হাঁড়ি রসগোল্লা খেয়ে ধুতি চাদর আদায় করে এনেছিলেন। সকলে বলতো নিমাই বংশের নাম রাখবে। তাঁর ডাকনাম

ছিল নিমাই।

আষাঢ় মাসের শেষ, ঘোর বর্ষা সে-বার। বাবা তার আগের বছর মারা গিয়েছেন, সুতরাং বাইশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর আমন ধানের জমিতে ধান রোয়ার ভার পড়লো আমার ঘাড়ে। বড়দাদা কুসঙ্গে মিশে অল্প বয়সে গাঁজা ধরেছিলেন, পাড়াগাঁয়ে যা হয়ে থাকে, গাঁজা খাওয়ার দলে তাঁরই সমবয়সী লোক ছিল অনেক, তারা কুপরামর্শ দিয়ে আমাদের পৈতৃক-জমি ফাঁকি দিয়ে মৌরসী নেবার চেষ্টা করলে।

একদিন দাদা এসে বললেন—খালপাড়ের জমিটা মৌরসী চাইচে একজন, বেশ মোটা সেলামী। দিবি? আমি দাদার নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার চেয়ে বয়সে বড়— অথচ তাঁর বুদ্ধি এরকম! কে এমন সুপরামর্শ দিয়েচে কি জানি। বললাম—কত সেলামী দিচ্ছে?

— পনেরো টাকা বিঘে।

— জমিগুলো কিন্তু চিরদিনের মতো হাত-ছাড়া হয়ে যাবে।

— তাতে কি? এখন সত্তর আশি টাকা হাতে আসবে—

— আমার ওতে মত নেই দাদা।

এই থেকেই দাদার সঙ্গে আমার মতভেদ হয়ে গেল। তিনি আর আমার সঙ্গে কথা বলেন না, মার সঙ্গে বলেন, তাঁর অংশের জমি তিনি আলাদা করে নেবেন, নিজের জমি যা খুশি করবেন, এতে কার কি বলবার আছে— ইত্যাদি।

আমরা চাষীবাসী গৃহস্থ। ধান ছাড়া অন্য আয় নেই, জমি ছাড়া অন্য সম্পত্তি নেই। আষাঢ় মাস এল, ধান রোয়ার সময়। দাদা কিন্তু জমির দিকে একবারও গেলেন না, এক পয়সার সাহায্যও করলেন না। আমি ভেবেচিন্তে মুস্তফাপুরের কাজী সাহেবদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। মুস্তফাপুরের কাজীরা বেশ অবস্থাপন্ন তবে বুড়ো কাজী সাহেব শুনেছিলাম খুব রুক্ষ মেজাজের মানুষ— কিন্তু আমার তখন আর কোনো উপায় ছিল না।

কাজী সাহেবের বাড়ি বেশ দোমহলা কোঠা, বাইরে লম্বা বৈঠকখানা। কাজী আবদুর রহমান বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। আমায় দেখে বললেন—কোথা থেকে আসা হচ্চে? তারপর আমার পরিচয় পেয়ে বললেন—ও, আপনি বিষ্ণুরাম রায়র নাতি? তা কি মনে করে?

— আমায় কিছু টাকা ধার দিতে হবে দয়া করে, বিশেষ দরকার। রোয়ার খরচ নেই কিছু হাতে।

— টাকা হবে না।

— কাজী সাহেব, না দিলে আমার কোনো উপায় নেই। এই তিন ক্রোশ রাস্তা

রোদ্দুরে হেঁটে এসেচি, আমার দাদা মানুষ নন, তিনি কিছু দেখাশুনা করলে আজ এই কষ্ট হয় আমার! ধান রোয়া না হলে সারা বছর চালাবো কি করে বলুন।

কাজী সাহেব বললেন— আপনাকে এখানে আহারাদি করতে হবে। ছেলেমানুষ, এতখানি হেঁটে এসেচেন— এমন সময়, বাড়ি ফিরে যাবেন সে হবে না। আমাদের প্রজা আছে একঘর নাপিত, এই পাশেই বাড়ি তাদের, গোয়ালে রান্নাবান্না করুন, আমি জিনিসপত্তর পাঠিয়ে দিচ্চি। তারাই জলটল তুলে দেবে। নতুন হাঁড়ি কুমোরবাড়ি থেকে আনিয়ে দিচ্চি। আহারাদি করে সুস্থ হোন, ওবেলা কথাবার্তা হবে। স্নান সেরে আসুন দীঘি থেকে।

দিব্যি সরু চালের ভাত, কই মাছের ঝোল, গাওয়া ঘি, টাটকা দুধ, মর্তমান কলা, আখের গুড়ের পাটালি ইত্যাদি দিয়ে পরিতোষপূর্বক ভোজন পর্ব সমাধা হল। কাজী সাহেবের আতিথ্যের ও সৌজন্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম দুপুরের পর। তিনি সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন, কত টাকা হলে জমি রোয়া হয়? কত বিঘে জমি? বললাম, এগারো।

হিসেব করে টাকা গুণে আমার হাতে দিয়ে বললেন— না। যখন জমি ছাড়া ভরসা নেই তখন আমার পরামর্শ শুনুন। লাঙ্গল গোরু কিনুন, পরের লাঙ্গলের ভরসায় চাষ চলে না। হাতিয়ার না থাকলে কি লড়াই হয়?

আমি বললাম— টাকা কোথায় পাই বলুন। লাঙ্গল গোরু করতে এখন অন্তত শ' খানেক টাকা দরকার।

— আচ্ছা যেদিন আপনি আজকের টাকা শোধ দিতে আসবেন, সেদিন এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলা যাবে, আজ নয়।

বাড়ি ফিরে আসতেই মা সব শুনে বললে— খুব ভদ্দরলোক তো ওরা। আমার দু-গাছা বালা আছে, বাঁধা দিয়ে কাজী সাহেবের টাকা দিয়ে আয়।

আমি বললাম— বেশ কথা মা।

সেই টাকা ফেরত দিতে গিয়ে কাজী সাহেব গোরু কিনবার জন্যে আমায় একশো টাকা ধার দিলেন আবার। আমায় বললেন— আজ তেত্রিশ বছর লোককে টাকা ধার কর্জ আর দাদন দিয়ে আসচি, এই আমাদের সাত পুরুষের ব্যবসা। যে মহাজন খাতক চেনে না, সে মহাজন নয়। আপনি টাকা নিয়ে যান, দলিল দিতে হবে না।

এইভাবে সেই আষাঢ় মাসে ধান রোয়া আমিই নিজের চেষ্টায় শেষ করলাম। বাংলা ১২৮২ সাল। তখন সাড়ে তিন টাকায় উৎকৃষ্ট আমন চাল এক মণ পাওয়া যায়, পাকি ওজনের গাওয়া ঘি এই গ্রামে বসেই বারো আনা সের কিনেচি। দুধ ষোলো সের টাকায়। সে সব এখন বললে রূপকথা বলে মনে হবে।

গ্রামে পীতাম্বর ঘোষ বলে একজন প্রজা ছিল আমাদের। গোরু কেনা সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সে বললে— বাবা ঠাকুর, গঙ্গাপারে একটা হাট আছে, সেখানে সস্তায় বলদ পাওয়া যায়। একবার আমি সেখান থেকে গোরু কিনে এনেছিলাম। চলুন সেখানে। আমিও যাবো।

মার সম্মতি নিয়ে পীতাম্বরের সঙ্গে হাঁটাপথে রওনা হলাম। সঙ্গে কাজী সাহেবের দেওয়া সেই একশো টাকা। গেঁজের মধ্যে কাঁচা টাকা নিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েচি পীতাম্বরের পরামর্শে। তখনকার আমলে রাস্তাঘাটে চোর-ডাকাতের বিশেষ ভয় ছিল। মা পীতাম্বরকে তুলসীগাছ ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিলেন সে যেন আমাকে একা রেখে পথের মধ্যে কোনো দরকারে কোথাও না যায়।

মা জানতেন না এই যাত্রার কি পরিণাম, কে-ই বা জানতো! আজও ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই এমন একটা ঘটনা একদিন কি করে ঘটেছিল আমার বাইশ বৎসরের জীবনে।

চাঁদুড়ের গঙ্গাতীর আমাদের গ্রাম থেকে সাত ক্রোশ। বেলা দুটোর সময় খেয়ায় গঙ্গাপারে গেলাম। পীতাম্বর বললে, বাবা ঠাকুর, এখান থেকে কোশ-চারেক দূরে একখানা গ্রাম আছে, সেখানে আমাদের স্বজাতির বাস আছে অনেক। সন্ধে পর্যন্ত হাঁটতে পারবেন?

তখন আমার জোয়ান বয়েস। বললাম, খুব।

পীতাম্বর বললে— তবে চলুন বাবা ঠাকুর।

সন্ধ্যার অন্তত ঘণ্টাখানেক পরে আমরা সে গ্রামে পৌঁছে গেলাম। ষাট বছর আগের সে-সব কথা আজও বেশ মনে আছে আমার। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে পীতাম্বর বাসার সন্ধানে কোথায় চলে গেল, আমি একটা নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়েই আছি অন্ধকারে। পীতাম্বর আর ফেরে না। আধঘণ্টা পরে দেখি পীতাম্বর এসে ডাকচে, আছেন নাকি বাবা ঠাকুর? চলুন—

তারপর একটা খড়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে তুললে। মনে হল সেটা কোনো গৃহস্থের বাইরের চণ্ডীমণ্ডপ হবে। একপাশে কতকগুলো বিচালি, অন্যদিকে ধানের বস্তা। একটা মাদুর পর্যন্ত পাতা নেই মাটির মেজেতে। তার ওপর অস্পষ্ট অন্ধকার। আলো নেই। বাড়ির লোকেরা এমন অভদ্র যে একবার খোঁজ পর্যন্ত নিলে না আমাদের।

পীতাম্বরকে বললাম— দেশলাই জ্বালি, একবার দেখে নিই সাপ-খোপ কোথাও আছে কি না। এমন বাড়িতেও নিয়ে এসেছ তুমি।

— বাবু, এ রাঢ় দেশ। বড় খারাপ জায়গা। বিদেশী মানুষকে জায়গা দেয় না।

এরা বোধহয় জানেও না যে আমরা বাইরের ঘরে আছি।

কোনো রকমে রাত কাটিয়ে ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল দু-জনে। শাঁকমুড়ি বলে একটা ছোট বাজারে চিঁড়ে দই কিনে আমরা ফলার করলাম— আগের রাত্রে অনাহারে আছি, তার ওপর আমার জোয়ান বয়েসের খিদে! আধ সের করে চিঁড়ে আর আধ সের দই, পোয়াটাক গুড় ও এক ছড়া কলা এক-একজনে চক্ষের নিমেষে উড়িয়ে দিলাম।

পীতাম্বরের মহৎ দোষ ছিল তামাক খেতে বসলে সে হঠাৎ উঠতো না। মুদির দোকানে আহারান্তে তামাক খেতে বসলো তো বসলোই। এদিকে বেলা পড়ে আসতে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

মুদির দোকানে পয়সা মিটিয়ে আমরা আবার পথ হাঁটি। বেলা যখন বেশ গড়িয়ে এসেচে, তখন উপর দিক থেকে খুব মেঘ করে এল। পীতাম্বর বললে— বাবা ঠাকুর, আগে সিজে-ডুমুর দ' বলে গ্রাম। অনেক বামুনের বাস। কিন্তু জায়গাটাতে যাবো কি না তাই ভাবচি—

— কেন?

— বিখ্যাত ডাকাতের জায়গা। বামুনরাই ডাকাত। গঙ্গা দিয়ে এক সময় বিদেশী মাল বোঝাই নৌকো যাওয়ার উপায় ছিল না। আজকাল তেমনটা নেই—তবুও বাবা ঠাকুর, বিশ্বেস নেই। সঙ্গে অতগুলো টাকা—

— গ্রামের মধ্যে ঢোকা ভালো বাইরের মাঠে থাকার চেয়ে। মাঠের মধ্যেও ডাকাতি করে নিতে পারে তো? চলো, কোনো ব্রাহ্মণের বাড়ি আশ্রয় নিই।

— কিন্তু বাবা ঠাকুর, কোনো রকমে যেন জানতে দেবেন না যে, আমাদের কাছে টাকা আছে ; সিডে-ডুমুর দ' জায়গা ভালো না।

সন্ধ্যার আগে আশ্রয় প্রার্থী হয়ে দু-তিনটি ব্রাহ্মণ-বাড়ি গেলাম—কিন্তু কেউ জায়গা দিল না। আমরা বাইরের রোয়াকে শুয়ে থাকতে চাইলাম—রাত্রে কিছু খাবো না বললাম, কিন্তু কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করলে না।

অবশেষে একটা দেউড়িওয়ালা উঁচু পাঁচিল-তোলা পুরোনো আমলের কোঠাবাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভাবচি, এখন কি করা যায়—একজন বৃদ্ধ হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে এলেন। আমায় বললেন, কে?

—আজ্ঞে, আমাদের বাড়ি এখানে নয়।

—এখানে কি মনে করে?

—বিদেশী লোক, রাত্রে একটু থাকবার জায়গা খুঁজচি।

—তোমরা?

—আজ্ঞে ব্রাহ্মণ?

—কি ব্রাহ্মণ? উপাধি কি?

—রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উপাধি রায়।

বৃদ্ধ একবার আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বললে—এসো বাপু। সঙ্গে কেউ আছে? তাকেও ডাকো।

এভাবে আশ্রয় পেয়ে প্রথমটা খুব খুশি হয়ে উঠেছিলাম বটে কিন্তু পরে সদর দেউড়ি পার হয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে সেই পুরানো আমলের বাড়ির চেহারা দেখে কেমন ভয়-ভয় হল। নির্জন বাড়িটায় কেউ যেন কোথাও নেই—এখানে যদি এরা টাকার জন্যে আমাদের খুন করে পুঁতে রাখে, তবে লাশ সনাক্ত করবার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভেতরে গিয়ে দু-মহল পার হয়ে তৃতীয় মহলে ঢুকে নারী কণ্ঠের স্বর শুনে একটু ভরসা হল। মেয়েদের সামনে খুনটা অন্তত করতে পারবে ন! চটাওঠা একটা খুব বড় রোয়াকের একপাশে বর্ষার জলে আগাছা গজিয়ে রীতিমত বন হয়েচে। আমার ভয় হল ওখানে নিশ্চয়ই সাপ লুকিয়ে থাকে। সেই রোয়াকে আমাদের বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলো।

পীতাম্বর চাপা গলায় বললে—বাবা ঠাকুর, এ কি-রকম জায়গা? চলো সরে পড়ি।

আমি ভরসা পেয়েচি মেয়েদের দেখে। বললাম—বনেদী গেরস্ত, অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েচে এখন। কোনো ভয় নেই।

একটু পরে বৃদ্ধ ফিরে এসে বললে—তোমার সঙ্গের লোকটি কি জাত? গোয়ালা? বেশ। ওকে এই পেছনের পুকুর থেকে এক ঘড়া জল আনতে হবে, তোমাদের হাত পা ধোবার জন্যে। আমার বাড়িতে লোকের অভাব।

আমি বললাম—যাও পীতাম্বর—

পীতাম্বর দেখি আমায় চোখ টিপচে। আমি ধমক দিয়ে বললাম—যাও না—বসে কেন?

অগত্যা সে চলে গেল। আমি একা পড়ে গেলাম অত বড় বাড়ির মধ্যে। পীতাম্বরের সন্দেহের অর্থ বুঝিনি এমন নির্বোধ নই আমি। খুব সর্তক হয়ে রইলাম—নিজের দশ হাতের মধ্যে অপরিচিত লোককে আসতে দিচ্ছিনে—কাউকে বিশ্বাস নেই এখানে। প্রসিদ্ধ ডাকাতের জায়গা সিজে-ডুমুর দ'।

বৃদ্ধ দেখি আবার আসচে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওর হাতে লুকোনো সড়কি নেই তো? উঠে দাঁড়ালে তবুও ছুট দিতে পারবো।

বৃদ্ধ বললে—দাঁড়িয়ে কেন, বোসো বোসো। তোমাদের বাড়ি কোথায় বললে?

—আজ্ঞে সনাতনপুর, নদে' জেলা।

—বাপের নাম কি?

—ভূষণচন্দ্র রায়।

—কি কর? বয়স কত? ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্চে।

বৃদ্ধ একটা আশ্চর্য প্রশ্নও করলে হঠাৎ। বললে—গায়ত্রী মন্ত্র বলো তো?

ব্যাপার কি? বৃদ্ধ পাগল-টাগল নয় তো? রাত্তিরটা কাটলে বাঁচি।

কি করি, আবৃত্তি করে গেলাম গায়ত্রী।

একটু পরে জল নিয়ে পীতাম্বর ফিরে এল, আমরা হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করলাম। রাত্রের আহারাদিও শেষ হল। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে টানা বারান্দার একপশে একটা ঘরে বৃদ্ধ আমার শোয়ার জায়গা দেখিয়ে দিলে।

বিছানায় সবে শুয়েছি। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আমার ঘরে ঢুকলেন। স্ত্রীলোকটির রং ফর্সা, বয়স চল্লিশের কম নয়, হাতে মোটা সোনার বালা, পরনে রাঙাপাড় শাড়ি। আমার মায়ের বয়সী। দেখে আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। উঠে বসবার চেষ্টা করলাম বিছানা থেকে।

তিনি বললেন—না না, থাক, তুমি শোও। বড্ড কষ্ট করে এসেচ, কিছু খাওয়া তো হল না—কিই বা ঘরে আছে?

এমন সময় আবার বৃদ্ধটি ঘরে ঢুকে এমন একটি কথা বললে, যাতে আমি আবার ভাবলাম বৃদ্ধটির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ। সে স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বললে—কেমন, পছন্দ, হয়?

স্ত্রীলোকটি বললেন—সেকথা এখন কেন? বাছা ঘুমুক। চলো আমরা যাই এখন।

ওরা চলে গেলে আমি ভাবলাম, পীতাম্বরকে ডাক দেবো নাকি? কি ব্যাপার এদের? নরবলি-টলি দেবে না তো? পছন্দ কিসের হবে? রাত্রি বোধ হয় কাটলো না।

সকালে পীতাম্বরকে ডাক দিয়ে বললাম—চলো সকালেই বেরুনো যাক।

—তা যেমন আপনি বলেন বাবা ঠাকুর। একটা কথা বলবো?

—কি?

—কাল আমি শোবার পরে সেই বুড়ো আমার কাছে গিয়ে অনেক খোঁজখবর নিলেন। আপনার বাড়ি কোথায়, কে আছে, অবস্থা কেমন, কিসে চলে—সে অনেক কথা। এ জায়গা ভালো নয়, এখুনি এখান থেকে চলে যাওয়া ভালো।

বৃদ্ধ কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগল, কাল রাত্রে আমাদের খাওয়া-দাওয়া ভালো

হয়নি, আজ এখানে থাকতেই হবে। আমার সঙ্গে তার নাকি একটা কথাও আছে।

—কি কথা?

—আহারাদি করে নাও, ওবেলা হবে এখন সে-সব—

বৃদ্ধকে যেন বড় ব্যস্ত বলে মনে হল। বৃদ্ধ পিছন ফিরতেই পীতাম্বর আমায় এসে চুপি চুপি বললে—বাবা ঠাকুর, বড় বিপদ।

—কি রে?

—এরা ডাকাত। সদর দেউড়ি বন্ধ করে দিয়েচে। টাকার সন্ধান পেয়ে গিয়েচে। বাইরে যেতে দেবে না।

—সত্যি?

—দেখে আসুন নিজের চোখে সদর দেউড়িতে তালা লাগানো।

কথাটা কিন্তু আমার মনে লাগলো না। রাত্রির অন্ধকারে এরা যে কাজ অনায়াসে শেষ করতে পারতো, তার জন্যে দিনমানে দেউড়ি বন্ধ করে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা পাবে কেন? পীতাম্বর হাজার হোক গোয়ালার ছেলে, আশি বৎসরে সাবালক হয় না।

রাত্রের সেই স্ত্রীলোকটি একটু পরে এসে বললেন—বাবা, কুয়োর জল তুলে দিচ্চি। বেশ করে নেয়ে নাও। কিন্তু এবেলা কিছু খেয়ো না যেন।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—খাব না কেন মা?

এ নিশ্চয়ই নরবলি না হয়ে যায় না!

স্ত্রীলোকটি বললেন—মা বলে ডেকেচ তো? তা হলেই হয়ে গেল। কর্তার কাছে সব শুনো।

বলতে বলতে বৃদ্ধ এসে হাজির। বললে—সোজা কথা বলি শোনো। আমার একটি নাতনী আছে, সেটিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। সুন্দরী মেয়ে—তোমাকে এখুনি দেখানো হচ্চে। কোনো অনিষ্ট হবে না তোমার। মেয়ে কানা-খোঁড়া নয়, দেখলেই বুঝতে পারবে। তোমার সঙ্গে চমৎকার মানাবে বলেই এ সম্বন্ধ স্থির করেছি।

আমার সামনে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় তত আশ্চর্য হতাম না। বিয়ে করতে হবে, সে কেমন কথা!

বললাম—সেকি! তা কেমন করে হয়?

—কেন হবে না? তোমরা আমাদের পালটি ঘর। মেয়ে ভালো। তোমার অমতের কারণ কি? গহনাপত্র সবই দেওয়া হবে।

—আজ্ঞে তা হয় না।

বৃদ্ধের মুখ-চোখের ভাব বদলে গেল। হঠাৎ অত্যন্ত কর্কশ ও রুক্ষস্বরে বলে উঠলো—তা হয় না? তা হতে হবে। আমি কে জানো? আমার নাম ঈশ্বর রায়। আমার নামে সিজে-ডুমুর দ' থেকে মগরার খাল পর্যন্ত লোক থরহরি কাঁপতো একদিন। বিয়ে না করে এখান থেকে যাবার জো নেই তোমার। দেউড়িতে চাবি দেওয়া, ঘাড়ে ধরে বিয়ে দেওয়াবো, যদি সোজা আঙুলে ঘি না ওঠে। গোঁপদাড়ি ওঠেনি, ছোকরা কার সঙ্গে কি বলচো তোমার খেয়াল নেই!

আমি কাঠের পুতুলের মতো রইলাম। বৃদ্ধ সেই স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বললে—যাও, জগদ্ধাত্রীকে নিয়ে এসো।

স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং একটু পরে যখন মেয়েকে নিয়ে এলেন হাত ধরে, তখন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মতই তার রূপ ফুটে উঠলো আমার মূঢ় চোখের সামনে। যেমনি গড়ন, তেমনি লম্বা, তেমনি রং। নামেও জগদ্ধাত্রী, রূপেও জগদ্ধাত্রী, ব্যবহারেও তাই।

এর পরে গল্প খুব সংক্ষিপ্ত। এই মেয়েই তোমাদের ঠাকুরমা ঁজগদ্ধাত্রী দেবী। পুণ্যবতী, সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে চলে গিয়েচে আজ কত কাল, তোমাদের বাপ তখন ছ-বছরের।

আর সেই ডাকাতের সর্দার ঈশ্বর রায় ছিলেন আমার দাদাশ্বশুর।

গল্পটি শেষ করে ঠাকুরদা একবার শ্রোতাদের মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু কারুর মুখ দেখে বোঝা গেল না যে, তারা কেউ এটা বিশ্বাস করেচে।

তখন তামাকের নলটায় একটা জোরে টান দিয়ে বললেন, আগেই তো বলেচি এটা সত্যি বলে তোমরা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু জেনো, এটা সত্যি—বুড়ো বয়সে মিথ্যা কথা বলে নাতিদের ঠকিয়ে আমার লাভ কি বলো!

ভিড়

স্টেশনে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে, টিকিট-ঘরের দিকে চেয়ে হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হল। তিনবার কুণ্ডলী খেয়ে এক বিরাট কিউ, টিকিটের জানালা থেকে এন্‌কোয়ারি অফিস পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। ঘড়ির দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে সর্বাগ্রে চট করে সেই কুণ্ডলী-পাকানো অজগর সাপের লেজের আগায় গিয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলাম। নইলে আরও পিছিয়ে পড়তে হবে এক্ষুনি।

তিন মিনিটের মধ্যে লেজটা আরও ছ-হাত বেড়ে গেল।

বহু লোক ব্যাপার দেখে টিকিটের জানালার কাছাকাছি যে সব লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘর্মাক্ত কলেবরে, তাদের কাছে টাকা নিয়ে গিয়ে খোশামোদ করছে—মশাই, আপনি তো টিকিট করছেনই, এই উলুবেড়ের দু-খানা অমনই ওই সঙ্গে—

—আমার, মশাই, একখানা অমনই কোলাঘাটের—

যাকে অনুনয় করা হচ্ছে, সে বলছে—ওসব হবে না। নিজের নিয়েই ব্যস্ত—না, না, কেন আপনি বকছেন মশাই? যান, তার চেয়ে কিউতে দাঁড়ানো ভালো। লোককে খোশামোদ করা ধাতে সয় না।

কিন্তু এদিকে ঘড়িতে এগারোটা বাজে। এগারোটা কুড়িতে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ছাড়বে—কুড়ি মিনিটের মধ্যে। সম্মুখে এই বিরাট কিউ। বিশ্বাস তো হয় না।

আরও দশ মিনিট কেটে গেল। কিউ যেমন তেমনই, বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অন্তত চর্মচক্ষে তো দৃষ্টিগোচর হয় না, এক-একখানা টিকিট দিতে ছ-মাস লাগছে। এই রেটে আমার পালা আসতে বেলা আড়াইটে বাজবে, এগারোটা কুড়িতে এর সিকির সিকিও ফুরোবে না।

সঙ্গে লটবহর, মেয়েছেলে। নইলে না হয় ফিরেই যেতাম। সারাদিনে আর ট্রেনও নেই।

এই সব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ হুড়মুড় করে গেল কিউ ভেঙে। দেখি, জনতা ঊর্ধ্বশ্বাসে পাশের জানালার দিকে ছুটছে। কি ব্যাপার, কেউ বলে না। চেয়ে দেখি, এ জানালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ছুটলাম পাশের জানালার দিকে। সেখানে তখন ঠেসাঠেসি, ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতি চলেছে। পূর্বতন কিউয়ের লেজের দিকে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারাই এখন নতুন কিউয়ের পুরোভাগে আসবার প্রয়াসী।

একজন বলছে—তুমার জায়গা এখানে ছিল? খবরদার—

—খবরদার!

—মু সামালকে বাত বোলো—

—এই ব্যাটা, দেখবি?

মুহূর্তমধ্যে বিশৃঙ্খলা, কিলোকিলি। অকথ্য ভাষণের বন্যা বয়ে গেল উভয় পক্ষে।

আমি অতিকষ্টে প্রাণপণে জন-আষ্টেক লোকের পেছনে জায়গা দখল করেছিলাম। মিনিট দশেক পরে টিকিটের জানালার কাছে আসবার পালা এল, তখন আমার গন্তব্য স্থানের কথা শুনেই মেমসাহেব বললে, নট হিয়ার, নম্বর টোয়েন্টি।

সে আবার কোথায়? নাঃ, ট্রেন পাওয়া যাবে না দেখছি। আর সময় নেই। যদি বা অতিকষ্টে একটু জায়গা করলাম, তাও কোনও কাজে এল না। খুঁজে খুঁজে কুড়ি নম্বরের জানালা বার করলাম, সেখানেও কিউ, তবে তত লম্বা নয়। একজন

বললে—মশাই, কোথায় যাবেন? আমায় দয়া করে একখানা খড়গপুরের—

মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। রূঢ়স্বরে বললাম—কেন বিরক্ত কর বাপু?

মেমসাহেবকে নোট বার করে দিতেই ছুঁড়ে ফেলে দিলে—নো চেঞ্জ, ভাগো।

তটস্থ ও কাঁচুমাচু হয়ে বলি—ইয়েস ম্যাডাম, সরি ম্যাড্যাম, হিয়ার মাই চেঞ্জ ম্যাডাম।

পকেট হাতড়ে দশ আনা পয়সা বার করবার পথ খুঁজে পাই না।

কনুইয়ের কাছে একটি সানুনয় অনুরোধ—আমায় বাবু, একখানা মেচেদার টিকিট যদি করে দেন, ছোট ছেলে সঙ্গে রয়েছে, ভিড়ে ঢুকতে পারছি না, দু-বার গেনু—

মাথা তখন সম্পূর্ণ বেঠিক। বলি—ভাগো।

—বাবু, দেন একখানা। দু-বার গেনু—

—নেই হোগা, ভাগো। রাগের মাথায় হিন্দি বেরিয়ে পড়ে।

টিকিট-কাটা পর্ব সাঙ্গ করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটি গাড়ি ধরতে। মেয়েদের গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে দিলাম, কারণ, চেয়ে দেখে মনে হল অতিকষ্টে নিজে উঠতে পারব কি না সন্দেহ।

অসম্ভব ভিড় প্রত্যেক গাড়িতে। তার ওপর মানুষ কেমন যেন হৃদয়হীন, রূঢ়, পশুবৎ হয়ে উঠেছে, এরা নিজের নিজের জিনিস, নিজের নিজের বসবার জায়গা সামলাতে ভীষণ ব্যস্ত ও অত্যধিক সতর্ক। এই রেলেই আগে কতবার ভ্রমণ করেছি, মানুষের মধ্যে কত সহানুভূতি কত মমত্ব দেখেছি। এখন এই বিপদের চাপে মানুষ রূঢ় কঠোর হয়ে উঠেছে। একবার মনে আছে—সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলা আমাকে তাঁদের খাবার ঝুড়ি থেকে খাবার বের করে ডিশে সাজিয়ে তাঁর স্বামীর হাতে দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ভদ্রলোক আমার সামনে ডিশ রেখে বিনীত ভাবে বললেন, একটু জলযোগ করুন।

আমি চমকে উঠলাম। হাওড়া থেকে একসঙ্গে ইন্টার ক্লাসে যাচ্ছি পাশাপাশি বেঞ্চিতে, অথচ একটা কথা বিনিময় হয়নি তাঁদের সঙ্গে আমার। জলখাবার দেওয়ার ব্যাপার ঘটল পরদিন সকালে কিউল স্টেশনে।

সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম—না না, এ কেন, আমি—আপনারা খান।

—না, সে শুনব না, খেতেই হবে। এ সব স্টেশনে খাবার পাওয়া যায় না, অনেক খাবার আছে আমাদের সঙ্গে, দয়া করে একটু মুখে দিন।

কোথায় গেল সেসব দিন! এখন একখানা কচুরির মতো তিন ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পুরির দাম এক আনা। মানুষের ভ্রাতৃভাব কোথায় উবে গিয়েছে।

ট্রেনের জানালার বাইরে ভিখারির ভিড়। একজন শীর্ণকায় স্ত্রীলোক কোলে তার একটি ছেলে, ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছে—বাবু, তোমরা থাকতে আমরা ডুবে যাব! সমস্ত দিন খাইনি, দুটো পয়সা দেন।

একজন উত্তর দিলে—কোথা থেকে দোব বাপু! চল্লিশ টাকা চালের মণ, এবার সবাই ডুববে, যাও, হবে না।

একটি রোগা হ্যাংলা লোক ময়লা পৈতে বার করে ভিক্ষে করছে। কামরার ও-প্রান্ত থেকে সে শুরু করে প্রার্থনাবাণী উচ্চরণ করতে করতে আসছে শুনছি। তার নাকি অনেক কষ্ট, বাড়িতে বৃদ্ধা মাতা শয্যাগত, স্ত্রীপুত্র অনাহারে মরছে। যত কাছে আসে ততই দেখলাম, নিজের মনে রাগ ও বিরক্তি জমে উঠছে। কাছে এলে মুখ খিঁচিয়ে বলি, ইদিকে আর কোথায় আসছ? দেখছ ভিড়ের ঠ্যালা! না পাব কোথাও খুচরো যে তোমায় দোব! খুচরোর অভাবে বলে চা খেতে পাইনি—

গাড়ির ভিড় ক্রমশই বাড়ছে বলে সবাই গাড়ির দোর ঠেলে বন্ধ করে রেখেছে, কাউকে উঠতে দেবে না। জানালা গলিয়ে জোরজবরদস্তি করে লোক উঠে পড়ে দফায় দফায় মারামারির সৃষ্টি করছে।

—মশাই, একটু সরে বসুন না।

—কোথায় সরে বসব, দেখুন। বাঃ, ঘাড়ে এসে বসলেন যে!

—আপনি কি এতটা জায়গা জুড়ে বসে থাকবেন! দেখছেন না ভিড়!

—তাই বলে আপনি ঘাড়ের ওপর এসে বসবেন? খুব ভদ্দরলোক তো?

—ভদ্দরলোক তুলে কথা বলবেন না, সাবধান করে দিচ্ছি।

—ওঃ, কেন? নবাব খান্‌জা খাঁ নাকি? কিসের ভয়? তোমার এক চালায় বাস করি?

—খবরদার! মুখ সামালে! 'তুমি' 'তুমি' করবে না বলছি। একটি চড়ে—

অতঃপর বিরাট কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি। এক পক্ষে ভাঙা ছাতা, অপর পক্ষে মুষ্টিবদ্ধ হস্ত। গাড়ির লোক 'হাঁ' 'হাঁ' করে উভয়ের মধ্যে এসে পড়ে তাদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। চলল নানাবিধ সদুপদেশ।— এই সামান্যক্ষণ গাড়িতে থাকা, তার জন্যে কেন ঝগড়া করা? বলি, এই আঁদুল থেকেই তো লোক নামতে শুরু হবে।

গাড়ি চলেছে। কলকারখানা, লোকের ঘরঝুড়ি, ধানের ক্ষেত। প্রত্যেক স্টেশনে লোকে কামরার বাইরের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলছে, প্রায়ই নাকি দু-একটা পড়ে গিয়ে মারাও যাচ্ছে। নতুন নতুন স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে কী ভীষণ ভিড়, এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লোকজন, মেয়েছেলে, ট্রাঙ্ক, বোঁচকা, পুঁটুলি, গুড়ের ভাঁড়, চোরাই চালের বস্তা, ছাতি, লাঠি নিয়ে অধীর ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটোছুটি করছে, যে করে হোক

গাড়িতে উঠতেই হবে তাদের।

আমাদের কামরায় যত লোক বসে আছে, তার দু-গুণ দাঁড়িয়ে রয়েছে যারা ঢুকতে আসছে, তাদের সকলকেই বলা হচ্ছে—আগে যাও, আগের গাড়ি খালি।

সে স্তোকবাক্যে কেউ ভুলে আগে দেখতে যাচ্ছ, কেউ না ভুল বলছে, কোথায় খালি বাবু, দেখে আসুন পিঁপড়ে ঢোকানোর জায়গা নেই কোনও গাড়িতে, দেন একটু খুলে, দিনেরাতে এই একখানা গাড়ি

এক দাড়িওয়ালা শিখ আমাদের দ্বারপাল। সে হুঙ্কার দিয়ে বলছে—আগাড়িওয়ালা ডাব্বামে চলা যাও।

ইতিমধ্যে ওপরের তাক থেকে এক লুঙি-পরা গোঁফছাঁটা মুসলমান পা দুলিয়ে নীচের বেঞ্চিতে নামবার চেষ্টা করলে দু-একবার, ভিড়ের জন্যে কৃতকার্য হল না, শেষ পর্যন্ত একজনের প্রায় ঘাড়ে পা দিয়েই নামল। লম্বা, রোগামত লোকটা, মুখখানাতে যেন বদমাইশি মাখানো। ওকে দেখে আজকের এই সমস্ত কলহ-কোলাহল-নির্মমতার প্রতীক বলে যেন মনে হল। বিড়ির ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার করে দিয়ে দিব্যি সে চেপে'বসল সামনের বেঞ্চিতে।

কামরার মধ্যে অন্য কোনো কথাই নেই, কেবল—

—মশাই, আপনাদের ইদিকে চাল কি দর?

—চল্লিশ টাকা। আপনাদের?

—আমাদের সাড়ে বত্রিশ দেখে এসেছি।

—সে কোন্ জায়গা?

—ওই দক্ষিণে—ডায়মন্ডহারবার।

—মানুষ এবার না খেয়ে মরে যাবে মশাই।

ডায়মন্ডহারবারবাসী লোকটি বললে—মরে যাবে কি মশাই, মরে যাচ্ছে। আমাদের ওদিকে একদিন কতকগুলো গরিব লোকের মেয়েছেলে এসে বললে, তোমাদের বনের কচু সব তুলে নিয়ে যাব, আর কচি জামরুলপাতা।

কে একজন জিজ্ঞেস করলে—জামরুলপাতা আবার খায় নাকি?

—খায় না? গিয়ে দেখুন, আমাদের দেশে জামরুলগাছের আর পাতা নেই, সব সবাড় করেছে।

আর একজন বললে—এই তো আরও দুটো ভিখিরি শেয়ালদার কাছে ফুটপাতে মরে পড়ে ছিল সকালবেলা।

—আজ নতুন দেখলেন আপনি? ও দুটো-পাঁচটা রোজ মরছে। কাল বৈঠকখানার বাজারে কন্ট্রোলের চালের কিউতে এক বুড়ী ধুঁকতে ধুঁকতে মারা গেল,

আমাদের দোকানের সামনে।

—কিসের দোকান আপনাদের?

—কাপড়কাচা সাবান। আমি এই ইষ্টিশানে নামব, পুঁটুলিটা ছেড়ে দেন।—চিঁড়ে, তাই দু-টাকা সের।

মনে পড়ল, আমাদের দেশের হাটে সদ্‌গোপ মেয়েরা চিঁড়ে বিক্রি করত, দু-আনা সের, চিরকাল দেখে এসেছি। চার আন সেরের মুড়কি, খুব ভালো মুড়কি ছিল। আর সে সব দিন ফিরবে কখনও?

কি একটা স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। শিখ দাঁড়িয়ে উঠল, দরজা ঠেলে বন্ধ করে যাত্রীদের রুখতে হবে। আবার একদফা হৈ-হৈ চিৎকার, গালাগালি, অনুনয়-বিনয় ও হুঙ্কারের পালা শুরু হল। একটি কচি ছেলের চিৎকার প্ল্যাটফর্মের বাইরে। একজন লোক জানালা দিয়ে গলে আসবার প্রাণপণ চেষ্টা করাতে গাড়ির লোক তাকে ধাক্কা মেরে নামিয়ে দিয়ে জানালা বন্ধ করে দিলে। মনে হল, বেশ হয়েছে, ওঠ জানালা দিয়ে!

মন নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে উঠেছে বিপদের মুখে পড়ে। অন্য কারও সুবিধা-অসুবিধা সে এখন বুঝতে রাজী নয়।

একটা স্টেশনে দেখা গেল, চারিদিকে থৈ-থৈ করছে জল। বললাম—এটা কি বন্যে নাকি?

একজন বললে—কাঁসাই নদীর বন্যে। কত ধান যে ডুবে গিয়েছে, দু-খানা গাঁ একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মশাই।

শিখ দ্বারপাল বললে—নেই হোগা, আগাড়িওয়ালা ডাব্বা একদম খালি, যাও আগাড়ি।

আর একজন বললে—ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না মশাই? চেতাবুনিতে যে লিখেছিল—

কোণ থেকে কে বলে উঠল—বাদ দিন চেতাবুনি! জোচ্চোর কোথাকার—

অর্থাৎ লোকটা চেতাবুনিতে কথিত প্রলয় দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়েছে।

এইবার সেই লুঙি-পরা লোকটি নড়েচড়ে বসে বললে—বাবু, আমাদের নন্দিগ্রাম থানায় এমন এক জ্বর দেখা দিয়েছে, যার হচ্ছে, তিন দিন-চার দিন পরে মারা পড়ছে। আর বছর হল আশ্বিনে ঝড়, এ বছর বন্যে আর তার সঙ্গে এই জ্বর। আমার মশাই, বাইশ বছরের ছেলে—

বলেই, কোথাও কিছু নেই—লোকটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

—কি হয়েছে ছেলের?

—আর কি হবে বাবু, নেই। সেই খবর পেয়েই তো দেশে যাচ্ছি। কলকাতায় কলে চাকরি করি, আর-বছর ঘরদোর ঝড়ে সব পড়ে গেল, আবার এই বছর বাইশ বছরের ছেলেটা—

আবার সে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। গাড়িসুদ্ধ লোকের গোলমাল যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে গেল। শিখ দ্বারপাল তার হুঙ্কার থামিয়েছে। কাছাকাছি দু-একজন লোক সান্ত্বনা দেবার কথা বলতে লাগল। কী অসহায় ওর কান্না!

—কেঁদো না ভাই, কি করবে কেঁদে, আহা, বাইশ বছরের ছেলে! বাঁচা-মরা কারও হাতে নয় দাদা। নাও, বিড়িটা ধরাও।

ওই একটি পুত্রবিয়োগাতুর পিতার ক্রন্দনে গাড়ির আবহাওয়া যেন বদলে গেল এক মুহূর্তে।

সূচ্যগ্রপরিমাণ স্থানের জন্যে যে নির্লজ্জ চেষ্টা ও আঁকড়ে থাকবার আগ্রহ, তা বন্ধ হয়ে গেল।

—সরে আসুন না, এদিকে জায়গা আছে।

একটা ছোট ছেলে অনেকক্ষণ থেকে একটা নারকেল তেলের বোতল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এতক্ষণ পরে একজন কে তাকে হাত ধরে বললে—বাবা, এখানে বস কোনও রকমে, হয়ে যাবে এখন।

যে লুঙি-পরা লোকটিকে এতক্ষণ আমি গুণ্ডার সর্দার বলে ভাবছিলাম, তার মুখের দিকে চেয়ে কেমন একটা করুণা ও সহানুভূতির উদ্রেক হলো। হতভাগ্য পিতা, হয়তো ওর বৃদ্ধ বয়সের সম্বল হয়ে দাঁড়াত এই পুত্রটি, হয়তো ওর একমাত্র পুত্র। গাড়ির আবহাওয়া ওর কান্নার সুরে কি আশ্চর্যভাবেই বদলে গিয়েছে। এই নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, উগ্র স্বার্থবোধ, যা হাওড়া থেকে উঠে পর্যন্ত সমানে দেখে আসছি, যাতে শুধু মানুষের পশুত্বের ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে, ওই লুঙি-পরা লোকটির চোখের জলে সব যেন ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মানুষের লজ্জা হল মানবতার অপমানে যেন। যেন সবাই সতর্ক হয়ে উঠল।

এইবার যে স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়াল, সেখানে লোকটি নেমে যাবে। গাড়ির এক কোণে একটি দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ বসে ছিল, সে আবেগভরে বললে,—এখানে নামবে? আচ্ছা বাবা, ভগবান তোমার মনে শান্তি দিন, আমি বুড়ো বামুন, আশীর্বাদ করছি, ভালো হবে তোমার, ভালো হবে।

আরক

লাহোর মিউজিয়মে যখন চাকরি করতাম সে-সময় লাহোরের বিখ্যাত 'দেশবন্ধু' কাগজের সম্পাদক বিনায়ক দত্ত সিং মহাশয়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ হয়। মিঃ সিং প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, তাঁদের আদি বাসভূমি পাঞ্জাবে নয়, রাজপুতানার কোটা রাজ্যে তিন পুরুষ পূর্বে তাঁর পিতামহ রাজকার্য উপলক্ষে এসে পাঞ্জাবে বাস করেন, সেই থেকেই তাঁরা দেশছাড়া। সন্ধ্যার পরে তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে বসতাম এবং দেওয়ালে টাঙানো পুরানো আমলের বর্ম, কুঠার, পতাকা, বল্লম প্রভৃতি রাজপুতের যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে নানা ইতিহাস ও আলোচনা শুনতে বড় ভালো লাগতো। রাজপুতানার, বিশেষ করে কোটা রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে মিঃ সিংয়ের জ্ঞান খুবই গভীর।

কিন্তু এ-সকল কথা নয়। আমি একটা আশ্চর্য ঘটনা বলবো। মিঃ বিনায়ক দত্ত সিংয়ের মতো সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের মুখে না শুনলে আমিও এ কাহিনী হেসে উড়িয়ে দিতাম।

একদিন শীতকালে সন্ধ্যার পরে আমি মিঃ সিংয়ের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেচি। ভীষণ শীত সেদিন। দু-পেয়ালা গরম চা পানের পর তাওয়ার তামাক টানচি (মিঃ সিং ধূমপানে অভ্যস্ত নন)। হঠাৎ কি মনে করে জানিনে, আমি তাঁকে বললাম—মিঃ সিং, আপনি অপদেবতায় বিশ্বাস করেন?

মিঃ সিং একটু চিন্তা করে বললেন—হ্যাঁ, করি।

—দেখেচেন ভূতটুত?

মিঃ সিং গম্ভীর সুরে বললেন—না, এ আমার কথা নয়। আমার ছোট ঠাকুরদাদার জীবনের ঘটনা। যদি এ ঘটনা না ঘটতো আমাদের বংশে, তবে আজও আমরা কোটা রাজ্যে মস্ত বড় খানদানী তালুকদার হয়ে থাকতে পারতাম। লাহোরে এসে চাকরি করতে হতো না। সে বড় আশ্চর্য ঘটনা।

আমি বললাম—কি রকম?

—শুনুন তবে। আমার ছোট ঠাকুরদা আমার পিতামহের আপন ভাই নন, বৈমাত্র ভাই। তিনি মস্ত বড় শৌখিন মানুষ ছিলেন—আর ছিলেন খুব সুপুরুষ।

আমি বিনায়ক দত্ত সিংয়ের দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে সেকথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

তারপর তিনি বলে যেতে লাগলেন—আমি যখন তাঁকে দেখেচি, তখন আমার বয়স খুব কম। কিন্তু তিনি তখন বদ্ধ উন্মাদ।—একদম। কেন তিনি উন্মাদ হলেন,

সেই ইতিহাসের মূলেই এই গল্প। তিনি উন্মাদ হওয়াতে কোটা রাজদরবারের আইন অনুসারে তাঁর ভাগের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের হাতছাড়া—সেকথা যাক্ গে। আসল গল্পটা বলি—

বিনায়ক দত্ত সিং তাঁর অনবদ্য উর্দুতে সমস্ত গল্পটা বলে গেলেন। মধ্যে মধ্যে আমি তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলুম, সে সব বাদ দিয়ে শুধু গল্পটাই আমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করলাম।

আমাদের গ্রাম থেকে কিছুদূরে কোটা দরবারের একটা সৈন্যদের আড্ডা ছিল। আমার ঠাকুরদাদা সেই সৈন্যদের আড্ডায় মাঝে মাঝে যেতেন—মদ খেয়ে স্ফূর্তি করতে। তাঁর দু-একজন বন্ধু সেখানে ছিল, তাদের সঙ্গে নেশা করতেই সেখানে যাওয়া। একবার জ্যোৎস্নারাত্রে তিনি আর তাঁর দুই বন্ধু খেয়ালের মাথায় বরী নদীতে স্নান করতে যাবেন বলে ঘোড়ায় করে বেরুলেন।

বরী নদী মরুভূমির মধ্য দিয়ে তিন শাখায় ভাগ হয়ে সাবলীল গতিতে বয়ে গিয়েচে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন এই ত্রিস্রোতা নদীর প্রথম ধারাটিতে আদৌ জল ছিল না, মাঝের শাখাটিতে হাঁটুখানেক—জল—তারপর মাইলটাক বিস্তৃত চড়া—তার ওপারে আসল ধারা, অনেক খানি জল তাতে।

যাবার পথে একজন বন্ধুর কি খেয়াল হল তিনি প্রথম ধারার বালির ওপর ঘোড়া থেকে নেমে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন—আর কিছুতেই উঠতে চাইলেন না। বাকি বন্ধুটি আর আমার ঠাকুরদাদা অগত্যা তাঁকে সেখানেই বালুশয্যায় শায়িত অবস্থায় ফেলে চললেন এগিয়ে। বলা বাহুল্য, তিন জনের মধ্যে কেউই ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন না।

আমার ঠাকুরদাদা বড় ধারা অর্থাৎ আসল বরী নদীর কাছে এসে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলেন তাঁর বন্ধুটি ঘোড়া থামিয়ে বালির চড়ার পশ্চিম দিকে ভীত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ঠাকুরদাদা বললেন—ওদিকে কি দেখচ চেয়ে?

বন্ধু মুখে কিছু না বলে সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে আর ইঙ্গিতে ঠাকুরদাদাকে চুপ করে থাকতে বললে। ঠাকুরদাদা চেয়ে দেখলেন, বালুর চড়ার ঠিক মাঝখানে অস্পষ্ট ধরনের কতকগুলি মনুষ্যমূর্তি—চক্রাকারে ঘুরচে। কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে মনে হল, ওরা যেই হোক, হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করচে। সেই নির্জন স্থানে রাত্রিকালে কাদের এমন আমোদ লেগেচে যে লোকচলাচলের অন্তরালে নৃত্য করতে যাবে, বুঝতে না পেরে তাঁরা দু-জনেই অবাক হয়ে রইলেন। কাছে কেউ কেন গেলেন না, সেকথা আমি বলতে পারব না, কারণ, শুনিনি। হয়তো এঁদের মত্ত

অবস্থাই সব দৃশ্যটার জন্য দায়ী, এই ভেবে তাঁরাও কাউকে কথাটা বলেনওনি সেই সময়।

এর পরে আরও বছর তিনেক কেটে গেল।

তিস্রোতা বরী নদীর প্রধান স্রোতোধারার তিন মাইল উত্তরে মরুভূমির মধ্যে একটা বড় লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে, এর নাম 'নাহারা নিপট' অর্থাৎ ব্যাঘ্র হ্রদ। এই হ্রদের দূরে দূরে একে প্রায় চারিদিক থেকে বেষ্টন করে পাহাড়শ্রেণী—এই পাহাড়শ্রেণী কোথাও হাজার ফুট উঁচু, কোথাও তার চেয়ে কিছু বেশি উঁচু। হ্রদ ও পাহাড় থেকে খনিজ লবণ পাওয়া যায় বলে কোটা দরবার থেকে মাঝে মাঝে এর ইজারা দেওয়া হত ব্যবসাদারদের।

আমার ঠাকুরদাদা পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় তিন বছর পরে একদিন এই হ্রদের জলে বালি-হাঁস শিকার করতে যাবেন ঠিক করলেন। গভীর রাত্রে বালি-হাঁসের দল হ্রদের জলে দলে দলে চরে বেড়ায়, একথা তিনি শুনেছিলেন। একটা ঘাসের লতাপাতার ছোট্ট ঝুপড়ি বেঁধে তিনি তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন দিনমান থেকে—কারণ মানুষ দেখলে হাঁসের দল আর নামবে না।

সব ঠিকঠাক হল, কিন্তু দু-একজন বৃদ্ধ লোক নিষেধ করলে, রাত্রিকালে নাহারা হ্রদের ত্রিসীমানাতেও যাওয়া উচিত নয়। কেন, তারা স্পষ্ট করে কিছু বললে না—শুধু বললে জায়গাটা ভালো নয়। ভৈজি নামে একজন বৃদ্ধ ভীল আমাদের প্রজা ছিল, সে বললে—কোটা দরবারের নিমক মহালের ইজারাদার এক বেনিয়ার সে চাকর ছিল তার যৌবন বয়সে। উক্ত বেনিয়ার লবণের গুদাম আর আড়ৎ ছিল নাহারা হ্রদের পাড় থেকে মাইল খানেক দূরে পাহাড়ের কোলে। সে সময় সে দেখেচে হ্রদের ওপর আকাশ হঠাৎ গভীর রাত্রে যেন দিনের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলো—কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে হ্রদের জলে। মোটের উপর, রাত্রে হ্রদের ধারে কেউ যায় না—অনেক দিন থেকেই স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এ ভয় রয়েচে। একবার এক মেষপালক রাত্রিকালে হ্রদের ধারে কাটিয়েছিল, সকালবেলা তাকে সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় নিমকের গুদামের কাছে পায়চারি করতে দেখা যায়।

আমার ঠাকুরদাদা এসব গালগল্প শুনবার লোক ছিলেন না। তিনি বুঝতেন স্ফূর্তি, শিকার, হল্লা, হৈ চৈ। লোকটাও ছিলেন দুঃসাহসী ও একগুঁয়ে ধরনের। তিনি যাবেনই ঠিক করলেন।

বৃদ্ধ ভীল তাঁকে বললে—হুজুর, হাঁসের দল যদি জলে নামে, তবে সে রাত্রে কোনো ভয় নেই জানবেন। ঠাকুরদাদা জিজ্ঞেস করলেন—কিসের ভয়? বাঘের?

—তার চেয়েও ভয়ানক কোনো জানোয়ার হতে পারে—কি জানি হুজুর, আমার

শোনা কথা মাত্র। ঠিক বলতে পারিনে—

—তুই সঙ্গে থাক না। বকশিস দেবো—

—মাপ করবেন হুজুর। একশো রূপেয়া দিলেও না, রাত কাটাবে কে নাহারা নিপটের ধারে? প্রাণের ভয় নেই? আমরা ভীল, বাঘের ভয় রাখিনে—এই হাতে তীর দিয়ে কত বাঘ মেরেচি, কিন্তু হুজুর, বাঘের চেয়েও ভয়ানক কোনো জীব কি দুনিয়ায় নেই?

আমার ঠাকুরদাদা নাহারা হ্রদ ভালো জানতেন না। ঠিক আমাদের অঞ্চলে হ্রদটা নয়, আমাদের গ্রাম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। তখনই তিনি ভীলদের গ্রাম থেকে রওনা হয়ে সাত-আট মাইল হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে সমতলভূমিতে নামলেন, দূরে মস্ত বড় হ্রদটার লবণাক্ত জলরাশি প্রখর সূর্য তাপে চক্ চক করচে। জনপ্রাণী নাই কোনোদিকে।

বেলা তখনও অনেকখানি আছে, এমন সময়ে ঠাকুরদাদা হ্রদের ধারে পৌঁছে গেলেন এবং নলখাগড়া ও শুকনো ঘাস দিয়ে সামান্য একটু আবরণ মতো তৈরি করে নিলেন জলের ধারেই, যার আড়ালে তিনি বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন, হাঁসের দল তাঁকে না টের পায়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল—রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের গা থেকে মিলিয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ। সুন্দর চাঁদ উঠলো পুবের পাহাড় ডিঙিয়ে, কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাত্রি। একদল সবুজ বনটিয়া জলের ধারে নেমে আবার উড়ে গেল।

নির্জন নিস্তব্ধ মরুভূমি আর হ্রদ।

দুই দণ্ড পরে জ্যোৎস্না ফুটে উঠলো হ্রদের বুকে। ধবধবে জ্যোৎস্না—কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার। দু-দিন মাত্র আগে হেমন্তপূর্ণিমা চলে গিয়েচে—যত রাত বাড়ে, তত শীত নামে।

শীতের মুখে বালি-হাঁস আসবার সময়—কিন্তু কই, একটা হাঁসও আজ নামচে না কেন?

বৃদ্ধ ভীলের কথা মনে পড়লো ঠাকুরদাদার। হাঁসের দল যদি নামে তবে সে রাত্রি বিপদহীন বলে জানবেন।—যদি না নামে তবে কিসের বিপদ? বাঘ জল খেতে আসে পাহাড় থেকে?

রাত্রি ক্রমে গভীর হল। অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে হ্রদের জল, মরুভূমির নোনা বালি রহস্যময় হয়েচে—কেনো শব্দ নেই কোনোদিকে। ঠাকুরদাদা যথেষ্ট দুঃসাহসী হলেও তাঁর গা ছম্‌ছম করে উঠলো—জ্যোৎস্নার সে ছন্নছাড়া অপার্থিব রূপে। তিনি চামড়ার বোতল বের করে কিছু আরক সেবন করলেন।

হঠাৎ হ্রদের তীরের পশ্চিমাংশে চেয়ে দেখে তাঁর মন আনন্দে দুলে উঠলো। জ্যোৎস্নালোকেও আকাশের নীচে একদল বালি-হাঁস নামচে। জ্যোৎস্না পড়ে তাদের সাদা দুধের মতো পাখাগুলো কী অদ্ভুত দেখাচ্চে! দেখতে দেখতে তারা নেমে এসে হ্রদের ধারে বালির চরে বসলো।

জায়গাটা ঠাকুরদাদার ঝুপড়ি থেকে দুশো গজের মধ্যে কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি।

এতদূর থেকে বন্দুকের পাল্লা পাবে না, বিশেষ এই জ্যোৎস্নারাত্রে। ঠাকুরদাদা ভাবলেন, দেখি ওরা কাছে আসে কি না, বা আরও হাঁসের দল নামে কি না। শিকারির পক্ষে ধৈর্যের মতো গুণ আর কিছু নেই। একদৃষ্টে হাঁসগুলোকে লক্ষ্য করাই ভালো। কিন্তু পরক্ষণেই ঠাকুরদাদা বিস্ময়ে নিজের চোখ বার বার মুছলেন। আরক খেয়েছেন বটে, কিন্তু তাতে জ্ঞানহারা হবার বা চোখে অত ভুল দেখবার কি কারণ আছে এখনই?

অতঃপর যা ঘটল তা বিশ্বাস করা না-করা আপনার ইচ্ছা মিস্টার ব্যানার্জি, কিন্তু এ গল্প আমি বাবার মুখে অনেকবার শুনেচি—আমাদের বংশের ঘটনা—কাজেই আমি আপনাকে মিথ্যে বলচি বানিয়ে, অন্তত এটুকু ভাববেন না। ঠাকুরদাদা দেখলেন, সেই হাঁসগুলো সাধারণ হাঁসের মতো নয়—অনেক বড়। অনেক—অনেক বড়। হাঁসেরর মতো তাদের চালচলন নয়। তার পরেই মনে হল, সেগুলো হাঁসই নয় আদপে। সেগুলো মানুষের মতো চেহারাবিশিষ্ট। বেচারী ঠাকুরদাদা আবার চোখ মুছলেন। আরক ঐটুকু খেয়েই আজ আবার এ কি দশা! পরক্ষণেই সেই জীবগুলি জলে নামলো এবং হাঁসের মতো সাঁতার দিয়ে যেখানে লুকিয়ে আছেন, তার কাছাকাছি জলে এসে গেল। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতে বিস্মিত, ভীত-চকিত, দুঃসাহসী, আরক-সেবনকারী ঠাকুরদাদা দেখলেন, তারা সত্যিই হাঁস নয়—একদল অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে! শুভ্র তাদের বেশ—জ্যোৎস্না পড়ে চিক্‌চিক করচে; তাদের হাসি, মুখশ্রী সবই অতি অদ্ভুত ধরনের সুন্দর। কতক্ষণ ধরে তারা নিজেদের মধ্যে খেলা করলে জলে, রাজহংসের মতো সুঠাম ধরনে, নিঃশব্দে, সুন্দর ভঙ্গিতে হ্রদের বুকে সাঁতার দিতে লাগলো। তারপর কতক্ষণ পরে—তা ঠাকুরদাদার আন্দাজ ছিল না—কারণ, তখন ঠাকুরদাদা সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেচেন—ওরা সবাই জল থেকে উঠলো এবং অল্পপরেই জ্যোৎস্নাভরা আকাশ দিয়ে ভেসে হাঁসের মতোই শুভ্র পাখা নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।—হ্রদের তীরর বাতাস তখনও তাদের অপূর্ব দেহগন্ধে ভরপুর!

আমার ঠাকুরদাদা নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখলেন তিনি জেগে আছেন কি

না। তখন তাঁর আরকের নেশা ছুটে গিয়েচে। একটু পরে রাত ফর্সা হয়ে জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে হ্রদের পার থেকে হেঁটে চলে এলেন পাহাড়ের কোলে। সেখান থেকে পৌঁছলেন ভীলদের গ্রামে।

বৃদ্ধ ভীল ভৈজি তাঁকে বললে—হুজুর, হাঁস নেমেছিল কাল?

ঠাকুরদাদা মিথ্যা কথা বললেন। হাঁস নেমেছিল, কিন্তু একটাও মারতে পারেননি।

কেন মিথ্যা বললেন, শুনুন।

কী এক দুর্বার মোহ তাঁকে টানতে লাগলো দুপুরের পর থেকেই—আবার তাঁকে যেতে হবে, নাহারা হ্রদের তীরে রাত্রিকালে। ভৈজিকে সত্য বললে পাছে সে বাধা দেয়।

কিন্তু সে রাত্রে বুনো বালি-হাঁসের দল নামলো হ্রদের জলে। আসল হাঁসের দল।

পর পর কয়েক রাত্রি শুধু বন্য-হংসের দল নামে, খেলা করে। আমার ঠাকুরদাদা ঝুপড়ির মধ্যে শুয়ে চেয়ে থাকেন, বন্দুকের গুলি করতে তাঁর মন সরে না।

তারপর আর একদিন শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বন্য-হংসের বদলে নামলো সেই অদ্ভুত জীবের দল।

একদল তারা আরও কাছে এল, বন্য রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়ে বেড়ালো জলজ ঘাসের বনের পাশে পাশে—তাদের অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী জ্যোৎস্নালোকে ঠাকুরদাদার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে কতবার পড়লো। রাত ভোর হবার বেশি দেরি নেই, তখনও কিন্তু জ্যোৎস্না আছে; আবার ঠাকুরদাদা কি ভেবে, আরকের নেশায় কিংবা ভালো অবস্থায় জানিনে, ঝুপড়ি থেকে উঠে ছুটে জলের ধারে চললেন। বোধ হয় ওদের কাউকে ধরতে গেলেন। অমনি ত্রস্ত বন্য-হংসের মতো সেই অলৌকিক জীবের দল তাড়াতাড়ি সাঁতরে কে কোথায় দূরে চলে গেল এবং পরক্ষণেই শেষরাত্রের বিলীয়মান চন্দ্রালোকে তাদের লঘু দেহ ভাসিয়ে আকাশপথে অদৃশ্য হল।

পরদিন দুপুরবেলায় আমার ঠাকুরদাদাকে উন্মাদ অবস্থায় হ্রদের ধারের বালির চড়ায় লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে জনৈক জেলে তাঁকে ভীলদের গ্রামে পৌঁছে দেয়। বৃদ্ধ ভৈজি ঘাড় নেড়ে বললে—আমি বলেছিলাম হাঁসের দল যেদিন না নামে, সেদিন বড় ভয়।

ঠাকুরদাদা মাঝে মাঝে ভালো হতেন, আবার উন্মাদ হয়ে যেতেন। ভালো অবস্থায় বাড়িতে এ গল্প করেছিলেন, একবার নয়, অনেকবার। মৃত্যুর প্রায় দশ বছর

আগে থেকে তাঁর মোটেই ভালো অবস্থা আসেনি। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিনায়ক দত্ত সিং গল্প শেষ করলেন। আমি বললাম—খুব অদ্ভুত ঘটনা, তবে—

মিঃ সিং বললেন—তবে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাস করা শক্ত। সে আমিও জানি। আমাদের দেশেও সকলে বিশ্বাস করে না। এ আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা বলচি। কেউ বলে, ঠাকুরদাদার অতিরিক্ত আরক সেবনের ফলে ওই সব চোখের ভুল দেখা, বন্য-হংসকে ভেবেচেন আকাশপরী ; আবার কেউ বলে, না—আকাশপরী দেখলেই লোকে পাগল হয়। সেই বৃদ্ধ ভীল ভৈজি সেই কথাই বলতো। কি করে বলব কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, তখন আমার জন্মই হয়নি।

থিয়েটারের টিকিট

সকালে উঠেই আভা স্বামীকে বললে—ওগো, শীগ্‌গির করে বাজারটা করে এনে দাও—সকাল-সকাল রান্নাবাড়া করে আবার তৈরি হতে হবে তো। যা বেলা ছোট। অবিনাশ বললে—কি কি আনতে হবে, একটা ফর্দ করে রাখো। আমি কলঘর থেকে চট করে আসি—আর একটু পরে কলঘর খালি পাওয়া যাবে না।

—এখনই যায় কি না দেখ—একটা কল, আর এই সাত ঘর ভাড়াটে, এখন দোতলার বুধুর মা জল নিতে এসেচে, এই তো দেখে এলুম!

—না, বাড়িটা বদলাবো এই সামনের মাসেই, এরকম কষ্ট আর পোষায় না। দেখে এস বুধুর মা আছে না গেল—সকালে উঠে একটু চান করবার জো নেই!

আভা খুকীকে কাল রাত্তিরের বাসী রুটি ও একটু গুড় একখানা কলাইকরা রেকাবিতে বার করে দিয়ে চঞ্চল পদে নৃত্যের লঘু-চটুল ভঙ্গিতে কলঘরের দিকে গেল এবং তখুনি ফিরে এসে বললে—শীগ্‌গির যাও—এখুনি আবার বুড়ো নিবারণবাবু নাইতে আসবে খালি আছে—

তারপর সে বাজারের ফর্দ করতে বসলো

আলু—এক পো

বেগুন—এক পো

রাঙাশাক—আধ পয়সা

কাঁচকলা—এক পয়সা

নুন—এক পয়সা

পান—দু-পয়সা

অবিনাশ কলঘর থেকে ফিরে এসে বললে—পান দু-পয়সা?

আভা ঘাড় দুলিয়ে বললে—তা হবে না? ওবেলা এক কৌটো পান সেজে সঙ্গে করে নিতে হবে না? রাস্তায় যেখানে-সেখানে পান কিনতে আমি তোমায় দেবো না বাপু।

অবিনাশ বাজারে চলে যাওয়ার পরে আভা উনুনে কয়লা দিয়ে কলঘরের দিকে গেল নাইতে।

তবু আজ রবিবার তাই অনেকটা রক্ষে...সময় তাও খুব বেশি কোথায়? খেতে-দেতেই তো আজ বেলা বারোটা বেজে যাবে এখন...তারপর সাজগোজ....তৈরি হওয়া...একটার তোপ পড়লে দুটো বাজতে আর কত দেরি থাকে?

—খুকী, ও খুকী, শোন, তুই আর আমি এক জায়গায় বসবো কেমন তো? ওমা, মুখে সিঁদুর মেখে ভূত হলি যে! তুই ঠিক যেন একটা হি-হি-হি—

খুকীর হাত থেকে সিঁদুরকৌটো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে কড়ি থেকে দোদুল্যমান দড়ির শিকেতে তুলে রেখে আভা হাত উঁচু করে ওপরদিকে হাস্যোচ্ছল মুখখানা তুলে বললে—উড়ে গেল—হুঁস্—যাঃ—

খুকীর আসন্নপ্রায় কান্না অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে পরিবর্তিত হওয়াতে সে অবাক চোখে মায়ের হস্তেঙ্গিতে প্রদর্শিত ঘরের কড়িকাঠের শূন্যতার দিকে চেয়ে রইল।

আভা বললে—আবার আমরা এক জায়গায় যাচ্চি রে খুকু, কত কি দেখচি, তুই খাবার খাচ্চিস। ছবি, বাজনা কত কি হচ্ছে—গাড়ি চড়ব তুই আর আমি—বুঝলি খুকী, বুঝলি?

অবিনাশ বাজার করে এনে ছোট্ট পায়রার খোপের মতো রান্নাঘরটার সামনে নামালো। আভা গামছা খুলে বললে—মাছ আননি?

—তেমন মাছ পেলাম না, আবার ওবেলাকার ধরো রিক্সাভাড়া রয়েচে—কতগুলো পয়সা—

—থাকগে তবে। তুমি তাহলে কবিরাজের বাড়ি থেকে চট্ করে সেরে এস—বেশি দেরি হয় না যেন। খেতে-দেতে ওদিকে আবার—

—যথেষ্ট সময় থাকবে, ভাবনা কি? এই তো এ্যালবার্ট হল্, কতটুকুই বা রাস্তা। যেতে ধরো, কুড়ি মিনিট রিক্সাতে—গোলদীঘি দেখনি? সেই সে-বার কালীঘাট থেকে আসতে দেখলাম, রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর, কত লোক বেড়াচ্চে, মনে নেই? ওরই কাছে।

অবিনাশ চলে গেল।

আভা ছুটোছুটি করে রান্না চড়িয়ে দিলে...মনে আজ তার ভারি আনন্দ! কতদিন সে কোথাও বেড়ায়নি, সেই পৌষ মাসে কালীঘাট গিয়েছিল, আর এটা আশ্বিন মাসের প্রথম।...কোনো-কিছু দেখা, বা কোথাও যাওয়া তো ঘটেই ওঠে না। লোকে বলে কলকাতা শহরে কত দেখবার জিনিস, কি-ই বা দেখলো সে কলকাতায় এসে? এসেচে তো আজ দু-বছরের ওপর হল।

আর কি করেই বা হবে? খুকীর বাবা একটা কাগজের দোকানে কাজ করে, মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। ওর মধ্যে দুধ, ওর মধ্যে ঘরভাড়া, ওর মধ্যে কাপড়চোপড়। মাসের শেষে এক-একদিন বাজার হয় না, তা বেড়ানো আর থিয়েটার বায়স্কোপ দেখা! মুদি ধারে চাল ডাল দেয়, তাই রক্ষে।

ধার চারিদিকে! কয়লাওয়ালা, কেরোসিন তেলওয়ালা, ধোপা, মুদি, বাড়িভাড়া। তবুও তো ঠিকে ঝিটাকে ও-মাস থেকে জবাব দেওয়া হয়েচে, আভা নিজেই সব কাজ করে। খুকী এখন বড় হয়েচে, মাসে দেড়টাকা ঝিয়ের পেছনে দেওয়ার চেয়ে ওই দেড় টাকায় খুকীর আর খুকীর বাপের বিকেলের জলখাবারটা তো হয়ে যায়।

পরশু অবিনাশ এসে একখানা রাঙা কার্ড আভার হাতে দিয়ে বলেছিল, টিকিটখানা ভালো করে রেখে দাও তো আভা।

আভা বললে—এ কিসের টিকিট গো?

—ও, আমাদের এসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসব কিনা রবিবার। এ্যালবার্ট হল ভাড়া নিয়েচে। তাই একখানা টিকিট দিয়েচে।

—কি হবে সেখানে?

—কনসার্ট হবে, গান হবে। তার পরে খাওয়া-দাওয়া আছে।

—আমার জন্য একখানা টিকিট আনলে না কেন? আর দেয় না? বেশ গান শুনতুম, দেখতুম কি হয়। কতকাল তো কোথাও বেরুইনি। দেখো না যদি পাওয়া যায়—

তাই অবিনাশ কাল শনিবারে আর-একখানা রাঙা টিকিট এনেচে।

খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে গেলে আভা আর একটুও বসেনি। এক বালতি জল ওবেলা অতিকষ্টে মারামারি করে কলঘর থেকে সংগ্রহ করেছিল—নইলে বেলা দুটোর সময় গা ধোয়ার জল কোথায় পাওয়া যাবে? সাত ঘর ভাড়াটের সঙ্গে একত্রে বাস ন্যায্য নাইবার জল তাই মেলে না—তা আবার অসময়ে শখের গা ধোওয়া? কী কষ্ট যে জলের এ বাসাতে!

আভা আগে আগে অবাক হয়ে যেতো জলের কষ্ট দেখে। নদীর ধারের

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, মাপজোপ করে জল ব্যবহার করবার কল্পনা সে করতে পারতো না। এখন অবশ্যি সব সয়ে গেছে!

সাবান মেখে গা ধুয়ে, সাজগোজ করতে বেলা আড়াইটা বেজে গেল। রিক্‌সা ডাকতে আর একটু দেরি হল। ওরা যখন বাসা থেকে বেরুলো, তখন পৌনে তিনটে।

আভা অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে কতক্ষণে সেই রেলিং-দেওয়া পুকুরটা দেখা যাবে—যার ধারে—ঐ যে কি নাম জায়গাটার?

এ্যালবার্ট হল? খুব বড় বাড়ি? ক-তালা! তোমাদের ক-তলায় সভা হবে?

কিন্তু সকলের চেয়ে আকর্ষণের বিষয়—কাগজের দোকানের লোকেরা মিলে এখানে আজ থিয়েটার করবে। থিয়েটার কি জিনিস, আভা কখনও দেখেনি।

ওদের রিক্‌সা যখন সংস্কৃত কলেজের কাছাকাছি এসে পৌঁছেচে, তখন দূরাগত সমুদ্র-কল্লোলের মতো একটা শব্দ ওদের কর্ণগোচর হল। অবিনাশ ঘাড় উঁচু করে যা চেয়ে দেখলে, তাতে তার তো চক্ষুস্থির।

প্রথমটা ওর মনে হল, এ্যালবার্ট হলে ঢোকবার দরজার সামনে রাস্তার ওপর একটা বুঝি দাঙ্গা চলচে।

প্রায় শ-দুই আড়াই লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে এক যোগে চিৎকার, ঠেলাঠেলি করচে—এ্যালবার্ট হলের কলেজ স্ট্রীটের দিকের সিঁড়ির মুখ থেকে জনতা শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

অবিনাশ বললে—এঃ, বড্ড ভিড় জমে গেছে দেখচি!

ভিড় ঠেলে রিক্‌সা থেকে নেমে ওরা কোনো রকমে দরজা পর্যন্ত গেল বটে, কিন্তু আর এগোনো অসম্ভব। সিঁড়িটা লোকে লোকারণ্য। একটা দলের সঙ্গে ওরা ওপরে খানিকদূর উঠতে গেল ব্যস্তসমস্ত হয়ে আভা ভাবলে না জানি কী অদ্ভুত ব্যাপার চলচে ওপরে, যা দেখবার জন্যে এত ভিড়—কিন্তু দু-চার সিঁড়ির ধাপ উঠতে না-উঠতে ওপর থেকে আর এক দলের ধাক্কা খেয়ে আভা ছিট্‌কে এসে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। ওদের চারিপাশে ভিড় জমে গেল! আভার কপালে বেশ লেগেচে দেওয়ালে ঠুকে গিয়ে, ফুলে উঠেচে এরই মধ্যে। সবাই বললে—আহা, কোথায় লাগলো? জনতার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে আভা জড়সড় হয়ে গেল। একজন ঘর্মাক্তকলেবর ভলান্টিয়ার এসে অবিনাশকে বললে—আহা-হা, কোথায় লেগেচে?...আপনি এই ভিড়ে মেয়েদের এনেচেন? ভালো করেননি। আচ্ছা, আপনি ওঁকে নিয়ে বাইরে দাঁড়ান। দেখি আমি।

সত্যই দেখা গেল জনতার মধ্যে আর কোনো মেয়ে নেই—মেয়ের মধ্যে একা আভা আর তার আড়াই বছরের খুকী...

অবিনাশ আভাকে ভিড়ের মধ্য থেকে বার করে এনে খানিকক্ষণ ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে রাখলে। ঝাড়া কুড়ি মিনিট গেল, কারো দেখা নেই। ওপর তলায় খোলা জানালা দিয়ে নীচে বাজনার শব্দ যেন কানে আসচে। আভা অধীরভাবে বললে—কই, কেউ তো এল না? ওপরে যাবে না?...এইবার চলো দিকি সিঁড়ির ধারে।

অবিনাশ আর একবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে ভলান্টিয়ারেরা কাউকে ওপরে যেতে দিচ্চে না। একজন বললে—মশাই, ওপরে মেয়েদের নিয়ে যেতে আপনাকে পরামর্শ দিইনে। মারামারি হচ্চে সেখানে। আর একটি মেয়েও নেই—কোথায় মেয়েদের নিয়ে যাবেন সেখানে?

আভা লজ্জায় মরে গেল।

ফিরবার পথে, রিক্‌সায় উঠে তখন উত্তেজনা ও আগ্রহ কমে গিয়ে আভার ওপর অবিনাশের করুণা হল। অতগুলো পুরুষের ভিড়ের মধ্যে সেজে-গুজে সে থিয়েটার দেখতে এসেচে আশা করে, জানেও না আজকের আসাটা কতটা অশোভন দেখালো। কি ভাবলে সবাই...! ও দুঃখিত হয়েচে থিয়েটার দেখতে না পেয়ে! স্ত্রীকে বললে—খুব লেগেচে নাকি কপালে? দেখি। দেখাও হল না, কিছুই না—যাতায়াতে রিক্‌সাভাড়া ছ-আনা পয়সাই দণ্ড মিছামিছি!

আভা কিন্তু ভাবছিল তার আঁচলে-বাঁধা রাঙা টিকিট দু-খানার কথা। কাল খুকীর বাবা তাকেই রাখতে দিয়েছিল, আজ সে হুঁশিয়ার হয়ে আঁচলে বেঁধে এনেছিল টিকিট দু-খানা! কত কষ্টে যোগাড় করা, কোনো কাজেই এল না, মিছামিছি গেল!

পার্থক্য

সকাল হইতে ভিখারির উপদ্রব লাগিয়াই আছে।

এদিকে ঘরে চাউল নাই, ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। গৃহিণী জানাইলেন, চাউল যা আছে তাহাতে আর দিন-চারেক চলিবে। বাজারে চাউল নাই একথা বলিলে ভুল হইবে, আছে চোরাবাজারে, সাঁইত্রিশ টাকা মণ।

গৃহিণীকে শুনাইয়া বলি—ভাতের ফ্যানে যা কিছু সার অংশ থাকে। ফ্যান যে ফেলে দেওয়া হয় ওতে সত্যিই আমাদের বড্ড...মানে, যা কিছু পুষ্টিকর ওর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সাহেবেরা ফ্যান ফেলে না, জাপানীরা ফেলে না।

আমার ইঙ্গিত বাড়ির কেহই বুঝিল না। ঝরঝরে ভাতই খাইতে লাগিলাম।

শুনিলাম, আর দু-দিন চলিবে চাউল। তার উপর ভিখিরি। সকাল হইতেই শোন—মা দু-টি চাল দেন, মা একটু ফ্যান—

মনে সহানুভূতি জাগায় না, রাগ ধরে। ঘরে নাই চাউল, কেবল ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও সকাল হইতে! হিসাব করা চাউল আজকাল। এদিকে বাজারে ও-দ্রব্য প্রায় অমিল। সাঁইত্রিশ টাকা দরে চাউল কিনিয়া কতদিন চালাইব? কায়ক্লেশে যদি বা চলে, ভিখিরির উপদ্রবে আর তো পারি না। অথচ ভিক্ষা মিলিবে না বলিতে পারি না, সংস্কারে বাধে।

বাল্যে পল্লিগ্রামের বাড়িতে থাকিতে দেখিতাম, মুষ্টিভিক্ষা হইতে ফকির-বৈষ্ণবকে কেহ কখনো বঞ্চিত করিত না। সেই হইতে কেমন একটা সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছে—ভিক্ষা না দিয়া পারি না।

কিন্তু আসিলে বিরক্ত হই। না আসিলেই যেন ভালো।

সকালে ছোট ঘরে বসিয়া লিখিতেছি, চাকর বাজার হইতে বাড়ি ঢুকিল, হাতে মাঝারি গোছের একটি পুঁটুলি। বাড়ির ভিতর হইতে মেয়েরা কি চাউল আনিতে পাঠাইয়াছিল? ভাঁড়ার খালি? বলিলাম—ওতে কি রে?

রাজেন চাকরটি জিনিসটা লুকাইয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ভাবে বুঝিলাম। ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—চাল আজ্ঞে।

—ও, কত?

—দু-সের করে চাল আজ্ঞে জহুরীর দোকানে। কন্‌ট্রোল—

—ও, কন্‌ট্রোলের দোকান তাহলে এখানেও হল? কত দিচ্চে?

—দু-টাকার বেশি দেবে না আজ্ঞে।

এটা বাংলা নয়, বিহার। তবুও এখানে কন্‌ট্রোল খুলিল, দু-টাকার বেশি চাউল কাহাকেও দেওয়া হইবে না—এসব কি?

একজন ভিখিরি আসিয়া হাঁকিল—ভিক্ষে দেন মা—চাড্ডি ভিক্ষে—

রাজেন বলিল—ভিক্ষে হবে না, যাও, চাল নেই—

লিখিতে লিখিতে বলিলাম—দে, একমুঠো দে—

সঙ্গে সঙ্গে আসিল আর একজন। তাহাকেও ভিক্ষা দেওয়া হইল।

বেলা ন'টা আন্দাজ সময়ে আরও দুইজন। ভিক্ষা লইয়া তাহারাও চলিয়া গেল। এইবার একজন বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মনে তখন বিরক্তি ধরিয়াছে, রাজেনকে বলিলাম, যেন ভিক্ষা না দেয়। কিন্তু তবুও লোকটা কেন দেরি করিতে লাগিল, কেন তবুও যায় না, বার বার একঘেয়ে চিৎকার করিতে লাগিল। বড়ই রাগ হইল। বাহির

হইয়া বলিলাম—ভিক্ষে হবে না, চলে যাও—আবার কি?

লোকটি বৃদ্ধ। পরনে একটুক্‌রা মলিন নেকড়া, হাতে একটা তোবড়ানো টিনের মগ। জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা বটে, তবে বাংলাদেশের ভিখিরির মতো কঙ্কালসার নয়।

লোকটা মগটা তুলিয়া টানিয়া টানিয়া বলিল—একটু ফ্যান দাও বাবা—বড্ড খিদে পেয়েচে—

রাগিয়া বলিলাম—কী আব্দার রে! আবার ভাতের ফ্যান—

—দেন বাবা একটুখানি—

—ভাগ্ এখান থেকে! যাঃ—আব্দার দ্যাখো—কোন্ সকালে রান্না হয়েচে, এখন ফ্যান রয়েচে ওর জন্যে!

লোকটা হতাশভাবে চলিয়া গেল, আবার লিখিতে বসিলাম। ইহাতে আমার সংস্কারে বাধিল না। প্রতিদিন বরাদ্দমত মুষ্টিভিক্ষা তো দিয়াছি। ক-জনকে দেওয়া যায়? বেলা বাড়িল, স্নান করিতে যাইব। এমন সময় একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি গায়ে অর্ধমলিন পিরান, পায়ে চটি জুতা, হাতে একগাছা বাঁশের লাঠি, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—বাবু, আপনারা ব্রাহ্মণ?

মুখ তুলিয়া তারের বেড়ার ওপারে চাহিয়া বলিলাম কেন, কি চাই?

লোকটা হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ব্রাহ্মণেভ্যো নমো—

প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম—কোত্থেকে আসা হচ্চে?

—বাবু, ঢুকবো বাড়ির ভেতর? আমিও ব্রাহ্মণ।

—হ্যাঁ, আসুন।

লোকটা বাড়িতে ঢুকিল বটে, কিন্তু বারান্দায় না উঠিয়া উঠানেই দাঁড়াইয়া বলিল—একটা কথা আছে। অনেক খুঁজেচি, ব্রাহ্মণবাড়ি পাইনি। আমার বাড়ি নদে-শান্তিপুর মুসাবনীতে আমার এক আত্মীয় কাজ করে, সেখানেই যাচ্চি। সঙ্গে একটি ছোট ছেলে আছে, ওই আতাতলায় বসিয়ে রেখে এসেচি। একটু খাবার জল যদি আমাদের দেন—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—তার আর বেশি কথা কি—বিলক্ষণ। ডেকে আনুন, ডেকে আনুন।

ছেলেটিও আসিল। দেখিয়া বুঝিলাম, ইহারাও দুর্দশাগ্রস্ত ভিক্ষুক। মুখে খাদ্য চাহিতে পারিতেছে না। বলিলাম—আপনাদের খাওয়া হয়নি তো, এত বেলায় কোথায় যাবেন—এখানেই দুটো ডাল ভাত—

—না না, একটু জল খেয়েই যাবো। আপনাকে আর কোনো বিরক্ত... মুসাবনীতে আমার ভাইপো—

—সে কি হয়! বসুন বসুন—মুসাবনী এখান থেকে ছ-মাইল পথ।

না-খাওয়াইয়া ছাড়িলাম না। দু-জনে খাইয়া-দাইয়া বিশ্রাম করিয়া বিকালের দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রে শুইবার সময় হঠাৎ মনে পড়িল—এ কেমন হইল? ভাতের ফ্যান চাহিতে ভিখিরির উপর রাগিয়া উঠিলাম, অথচ নদে-শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ শুনিয়া আদর করিয়া দু-জনকে খাওয়াইলাম, তখন তো চাউল বাঁচাইবার কথা মনে উঠিল না?

কেন এমন হয়?

ভাবিয়া দেখিলাম—ইহার কারণ সে ভিখিরি, আমার শ্রেণীর মানুষ নয়। নিজেকে আমি ভিখিরিরূপে কল্পনা করিতে পারি না, কিন্তু মনে মনে নিজেকে নদীয়াবাসী দরিদ্র-ব্রাহ্মণরূপে অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি।

ননীবালা

ননীবালা মেয়েকে বললে, সুপুরি কুড়িয়ে আন তো কালী রায়ের গাছের তলা থেকে।

মেয়ে বললে—হ্যাঁ, খাণ্ডা পিসি দাঁড়িয়ে আছে, বলেছে, এবার সুপুরি কুড়ুতে হলে পয়সা দিয়ে যেও। সুপুরি এমনি পাওয়া যায় না বাজারে।

ননীবালা এ গাঁয়েরই মেয়ে, তার রাগ হয়ে গেল খুব। কালী রায়ের বুড়ী দিদিকে ঘাটের পথে পেয়ে খুব করে শুনিয়ে দিলে।

বুড়ী বললে—তুমি ভাই, অনর্থক তিলকে তাল কোরো না। সুপুরি কুড়ুতে এসেছিল সেদিন, সর্বদা কুড়ুতে আসে, তাই বললাম, আমাদেরও তো দরকার আছে, কেন আস রোজ রোজ?

—সর্বদা কুড়ুতে যাবার দায় পড়েছে!

—রোজ আসে, আমি বলছি। তুমি ভাই, জানো না।

—কে বললে রোজ যায়?

—আমি জানি। রোজ দেখি যেতে।

—আচ্ছা বেশ। এবার যায় যদি, পয়সা নিয়ে যাবে।

কালী রায়ের দিদি পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াতে লাগলো—বড্ড গোমর হয়েছে ঐ ননীর। পয়সা দেখাতে আসে আমার কাছে! এমনি আদ্ধেক দিন হাঁড়ি চড়ে না, আবার পয়সার গোমর! ঝি-গিরি করে তো চালাচ্ছিস—পয়সা দেখাতে লজ্জা করে না!

ননীর মেয়ের নাম নালু, ভালো নাম সরবালা। নালু এর গাছের লিচু, ওর গাছের

কুমড়োর জালি, শশার জালি চুরি করে আনে। পাড়ার কারো গাছে এঁচড় আর পাকাবার জো নেই নালুর জন্যে।

ননী কিন্তু তা জানে না। খিদের জ্বালায় সরবালা চুরি করে, রাস্তাতেই তা খেয়ে ফেলে। বিকেলে কী ভীষণ খিদে পায়, কে দেয় একগাল চালভাজা? রায়েদের গাছে কী মাদার পেকে আছে! পাকা যেমনি, বড়ও তেমনি। ঠেলে উঠলো গাছে। রায়ঠাকুরমা দেখে বললে—ওমা, এমন গেছো মেয়েছেলে কখনো দেখিনি! তুই এমন গেছো হলি কবে? নাম নাম—

—দুটো মাদার পাড়চি ঠাক্মা—

—খেলেই জ্বর! কেন ওসব ছাই খাবি?

কেন সে খাবে সে-ই জানে। মা ও-পাড়ার দামারি কাকার বাড়ি গোয়াল পরিষ্কার করে ও বিচালী কেটে জল তুলে আটটা গরুকে জাব দেয়। এসব করতে সন্ধে। সন্ধের পর মা বাড়ি এসে ভাত রান্না করবে, তবে খেতে দেবে। পেট যে এখুনি জ্বলছে, তার কি। কি খাবে সে, ভেবে পায় না। শুধু সে নয়, পলটু, হাবু, নন্তু, ননকু, নেপু সবাই আসে।

ওদেরও বাড়িতে ওই অবস্থা। দুপুরে ভাত খাও, তারপর বিকেলে হাজার খিদে পাক না কেন, খাবার নেই। তবে সে একটু আসে ঘন ঘন। তার মা বাড়িতেই থাকে না যে। সে কি করবে? ওরা চাইলে পায়, তার তো চাইবার লোকই নেই। অথচ খিদে—কী ভীষণ খিদে! পেটের মধ্যে কেমন যেন কামড়ায় খিদের জ্বালায়।

রাত্রে নালুর জ্বর হল।

ননী পড়ে গেল মুশকিলে। মেয়ের গা দেখলে পুড়ে যাচ্ছে। কি খেতে দেবে, রুগীর পথ্যি কি আছে ঘরে? ডাক্তারই বা কোথায়? এক আছে সুরেন ডাক্তার। দু-টাকার কম এ রাত্রে আসবে না। মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখে বললে—যেমন তুমি তেমনি হয়েছে আমার অবস্থা। কি যে করি—

রাত্রে জ্বরটা বাড়তে সে চেঁচিয়ে ডাক দিলে প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রীকে—ও জ্যাঠাইমা—জ্যাঠাইমা—ইদিকে একবার আসুন, খুকীর বড্ড জ্বর—

প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলেন ঘুম থেকে। অনেক রাত। দেখে বললেন—তাই তো, বড্ড জ্বরটা বেড়েছে। কুইলেনের বড়ি আছে আমার কাছে। কাল সকালে খাইয়ে দিও—

—দেখুন তো জ্যাঠাইমা, গরিবের ঘরে কি কাণ্ড—

—তাই তো বাপু। সবই অদেষ্ট তোমার। তোমার বাবা ভালো দেখেই বিয়ে দিয়েছিলেন। দোজবরে—তাই কি? দিব্যি চেহারা। কলকাতায় বাসা। ইন্‌জিনিয়ার

লোক। দু-পয়সা আয় ছিল, সইলো না তো কি হবে। অল্প বয়সে কপাল পুড়লো।

—সে তো একশোবার জ্যাঠাইমা। নইলে খুকীকে আজ দুটো পেটভরে ভাত দিতে পারিনে! এ কি কম দুঃখু! পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি, তাতে আমার এ গাঁয়ে অপমান নেই। এ গাঁয়ের মেয়ে যখন আমি। বলুন—ঠিক কি না?

—সেকথা তো বটেই মা। তার আর কি হবে বলো। সবই অদেষ্ট। আমি গিয়ে কুইলেনের বড়ি নিয়ে আসচি—

—এখন দরকার নেই জ্যাঠাইমা, কাল সকালে পাঠাবেন।

—মা, রাতটা আজ এখানেই থাকবো?

—না জ্যাঠাইমা। আমি বেশ থাকবো এখন। আপনি মায়ের মতো, তাই কথাটা বললেন। এ গাঁয়ে ওকথাও কেউ বলবে না।

ননীবালা সত্যিই পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে মাসে পাঁচ টাকা আর একবেলা ভাত পায় এক থালা। ভাত সে বাড়ি নিয়ে আসে। যে বাড়িতে কাজ করে, তা.. ভাত দিতে কৃপণতা করে না, বড় বড় ধানের গোলা তাদের বাড়িতে পাঁচ-সাতটা, বাগান, পুকুর, জমিজমা সব আছে। মা আর মেয়ে সেই এক থালা ভাত খায়।

ননীবালার বিয়ে হয়েছিল কলকাতার এক বড় ইন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে। দোজবরে পাত্র হলে কি হবে, বেশ ছিলেন তিনি দেখতে-শুনতে। বয়েসটা একটু বেশি ছিল, ননীবালা গিয়ে দেখেছিল তাঁর বয়সের দুটি সৎমেয়ে আছে তার। সৎমেয়ে দুটি কোথায় থেকে পড়তো, বাড়িতে আসতো খুব কম। মাত্র দু-বছর স্বামীর সঙ্গে সে তেতলার বাসায় কাটিয়েছিল পরম সুখে, এর মধ্যে বার-কয়েক দেখা হয়েছিল সৎমেয়ে দুটির সঙ্গে।

বড় মেয়েটির বিয়ের ঠিকঠাক। সে সময়েই স্বামীর অসুখ করলো। বিয়েও হল, মাস-খানেকের মধ্যেই স্বামী মারা গেলেন। তারপর বড় মেয়ের স্বামী ছোট মেয়েটিকেও নিয়ে গেল সুদূর পশ্চিমে তার কর্মস্থলে।

সৎশাশুড়ী একা বাসায়। ননীকে কেউ বললেও না সে কি করবে, কোথায় যাবে, কি খাবে। সরবালা তখন এক বছরের শিশু।

দরজায় এসে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছে, বড় সৎমেয়ে সুললিতা তার ছোট বোন সীমাকে নিয়ে উঠছে মোটরে স্বামীর সঙ্গে। ননীবালা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে।

সুললিতা কাছে এসে দাঁড়ালো। ননীর প্রায় সমবয়সী তার এই সৎমেয়েটি বরং কিছু বড়। সীমাই ননীর সমবয়সী। সুললিতার পরনে দামী ভয়েলের শাড়ি, হাতে পুঁতির মালা দিয়ে তৈরি ভ্যানিটি ব্যাগ।

ননীবালা বললে—এসো মা, সাবধানে থেকো। চিঠিপত্তর দিও।

ননীবালা পাড়াগাঁয়ের লাজুক মেয়ে, নিজের কথা কিছু বলতে জানে না। সুললিতা বলেছিল একদিন তার স্বামীকে—ওর অভাব কি, বাবা সর্বস্ব ওর পেটে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।

ননীবালার পেঁটরাতে নগদ বাইশ টাকা আছে। ঐ তার শেষ সম্বল। ভগবান জানেন।

ননীবালার গহনাগুলো সৎমেয়ে দুটি চেয়ে নিয়েছিল বিয়ের সময়। বিশেষ করে সুললিতা। ওগুলো নাকি তার নিজের মায়ের গায়ের আদরের গয়না। ন্যায্যমত নাকি ওরই প্রাপ্য।

সুললিতা বেশি কিছু না বলেই বিদায় নিলে।

জামাই এসে প্রণাম করলে। এই লোকটিই প্রথম তার সঙ্গে কথা বললে যাবার সময়।

মা, তাহলে আসি।

—এসো বাবা। চিঠি দিও।

—আপনি সাবধানে থাকবেন কিন্তু। একা রইলেন এখানে। দিনকাল বড্ড খারাপ পড়েছে।

—তা তো বটেই।

—চিঠি দেবেন—

—তোমরা আগে দিও।

পেছন থেকে সুললিতা বলে উঠলো—'ওগো, দেরি কোরো না। সাড়ে দশটা বাজে।' ননীবালা ফিরে এসে ঘরে ঢুকে মেয়েকে কোলে তুলে নিলে। বললে—খুকী, ওরা চলে গেল। আমাদের ফেলে রেখে চলে গেল। কার কাছে ফেলে রেখে চলে গেল রে? দেওয়ালে স্বামীর ফটোখানার দিকে চেয়ে ওর চোখ দুটি বেয়ে ঝরঝর করে জল পড়লো।

এর মাস দুই পরে মেয়েকে নিয়ে ননী বাপের বাড়ি চলে এসেছিলো এবং সেই থেকেই এখানে আছে।

আজ দশ বছর আগেকার কথা এসব।

সৎমেয়েরা কোনো চিঠিপত্র দেয়নি, কোনো খোঁজখবরও নেয়নি।

সরবালা সেরে উঠলো না। সেই থেকে রোজ সন্ধ্যার সময় একটু একটু জ্বর হয়। না আছে ওষুধ, না আছে পথ্যি।

ননী যখন পরের বাড়ি কাজ করতে যায়, তখন সরবালা একাই বাড়িতে বিছানায় শুয়ে থাকে। কোনোদিন জ্বর আসে, কোনোদিন আসে না। যেদিন ভালো থাকে, সেদিন কামার-বাড়ির হর আর মতি তার সঙ্গে কড়ি খেলতে আসে। যেদিন জ্বর আসে, কাঁথামুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। একাই শুয়ে থাকে।

ননী কিন্তু খুব শক্ত মেয়েমানুষ। কিছুতেই সে দমে না। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে সে বেটে কাটে রোজ। আগে বেটে কাটতে জানতো না, ক্রমে শিখে ফেললে। এক পোয়া থেকে দেড় পোয়া দড়ি কাটতো প্রথম প্রথম, ক্রমে এক সের পর্যন্ত কাটতে লাগলো। রাত দশটার মধ্যে এক সের দড়ি বেশ সরু করে কাটতে পারে। প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী একদিন এসে বললে, বেটে কাটছো মা? বেশ বেশ।

—শিখিচি জ্যাঠাইমা। কিছু আয় করা তো চাই।

—কোথায় শিখলে?

—বাড়িতে। কে আবার শেখাবে। সন্ন্যিসি কাকা বুড়ো বয়সে বেটে কাটতো। তার কাটা দেখেছিলাম অনেক দিন আগে। সেই থেকে শিখেছি।

সরবালার পা ফুললো, মুখ ফুললো, পুরনো ঘুষঘুষে জ্বর। বললে—এর একটা ব্যবস্থা কর, নইলে খারাপের দিকে যাবে।

ননী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে একদিন অন্তর যেতে লাগলো। ডাক্তার সাহেবকে বুঝিয়ে বললে মেয়ের রোগের ইতিহাস।

মাস দুই ধরে একদিন অন্তর কামাই করবার ফলে চাকুরি গেল ননীর। এক থালা ভাত আসে না, টাকা ক-টাও গেল। এমন হল খাওয়া জোটে না। সরবালা সেরে উঠেছে একটু, কিন্তু খাবার অভাবে শুধু কাঁচা পেয়ারা খায় হিমি ঠাকরুণের পেয়ারাতলায় বসে বসে।

এর ওপর এক নতুন বিপর্দ বাধলো।

যাদের বাড়িতে ননী ঝি-গিরি করতো, কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তারা খুব চটে গেল। তাদের হাতে গ্রামের কন্‌ট্রোলের দোকানের কাপড় দেওয়ার ভার। তিন মাসের মধ্যে একখানা গামছাও তারা দিলে না ননীবালাকে। কত অনুনয় করেও তাদের মন গলানো গেল না। বাইরে বেরুনো যায় না আর কাপড়ের অভাবে। তালির ওপর তালি লাগিয়ে যতদিন চালানো যায় চললো, আর চলে না এমন অবস্থায় এসে পৌঁছুলো।

বিকেল বেলা ননী মেয়েকে বললে—হ্যাঁ রে, বেটের দড়ি কাটতে বসবি?

—সন্ধের সময় বসবো মা।—

—তেল নেই, অন্ধকারে হবে না। এখন বোস। তবু আনা-চারেক পয়সা হবে

সকালবেলা।

—মা, একটা কথা শুনবে? আমি ট্যাপের বীচি আনবো মাদ্‌লার বিল থেকে। তুমি ট্যাঁপের খই করতে জানো?

—খুব জানি। তুই আনতে পারবি? কার সঙ্গে যাবি সেখানে? বিলের জলে কেউটে সাপের আড্ডা।

—বাগ্‌দি-বৌ যাবে আর আমি যাবো। বাগ্‌দি-বৌ বলছিল, ট্যাঁপের খই খেলে এক বেলা কেটে যাবে। রাত্রে আমরা ট্যাঁপের খই খাবো।

ননীর মুখে দুঃখের হাসি দেখা দিল। তার আদরের মেয়ে আজ দুলে-বাগ্‌দিদের মেয়ের মতো ট্যাঁপের খই খেয়ে রাত কাটানো খুশির ব্যাপার বলে মনে করছে।

মেয়েকে বললে—নালু, কাউকে বলিসনে যে ট্যাঁপ তুলতে যাবি। এ গাঁয়ে আবার ইদিকে নেই ওদিকে আছে কিনা।

সরবালা চলে বাগ্‌দি-বৌ নীলার সঙ্গে।

ননী বললে—ও নীলি, দেখিস দিদি, নালু যেন বেশি জলে যায় না। পদ্ম গাছে বড্ড সাপ থাকে।

সরবালার মন খুশিতে ভরে উঠলো। মাদ্‌লার মস্ত বড় বিল পদ্ম আর নালফুলের বনে ভরে আছে। নীল আকাশ উপুড় হয়ে আছে বিলের ওপর। যদিও বর্ষাকাল, আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। শরতের আমেজ আছে রোদ্দুরের গায়।

বিলের ধারে নল-খাগড়ার ঝোপে তিতপল্লার ফুল ফুটেছে। বাগ্‌দি-বৌ বললে—নালু, করমচা খাবে মা? আয় এই ঝোপে কত করমচা আছে—

—খাবো খাবো। তবে নীলি, একটা কথা। মাকে কিন্তু বললে খাবো না। করমচা খাওয়ার কথা শুনলে মা বকবে। জ্বর হচ্ছিল কিছুদিন আগে।

—তবে খেও না মা। থাকগে।

—না, খাবো। তুই তবে বললি কেন? আমি ঠিক খাবো—

একমুঠো ডাঁশা করমচা চিবোতে চিবোতে নালু ও নীলি জলের ধারে এসে দাঁড়ালো। নালু তো অবাক। কত বড় বিলটা! কত পদ্ম ফুটে আছে! ওপারে ওরা কি করছে? মাছ ধরছে? কি মাছ? কই, মাগুর?

নালু ডাক দিয়ে বললে—কি দর, ও জেলে কাকা?

—মাছ নেবা খুকী?

—দর বলো না।

—বাছা বাছা বিলির কই, তিন টাকা সের। আর মাগুর মাছ সাড়ে তিন টাকা।

দাম শুনে কিনবার বাসনা উবে গেল সরবালার। বাপ রে, মাসে মা মোটে পাঁচ

টাকা মাইনে পেতো, আমি কিনবো তিন টাকা সেরের মাছ! সে পাঁচ টাকাও আজকাল আর পায় না।

হঠাৎ বাগ্‌দি-বৌ বললে—নালু মা, মাছ ধরবো?

—তুমি?

—তুমি আর আমি। একজনের কাপড় খুলতে হবে! তুই ছেলেমানুষ, কাপড় খুলে ফেল।

—যাঃ!

—কে দেখছে? কোনো লোক নেই এ দিগরে। বিল আর মাঠ।

নালুর কাপড় খুলে দিয়ে বাগ্‌দি-বৌ ওকে জলে নামালে। ছাঁকা দিয়ে দু-জনে মাছ ধরতে লাগলো। পদ্ম গাছের তলায় আর শেওলার দামের মধ্যে। বৃথা পরিশ্রম। আধ ঘন্টা জল-কাদা মাখাই সার হল। সন্ধ্যা হবার দেরি নেই। বকের দল ছায়াভরা নীল আকাশের গা বেয়ে পাল্লার বড় বিলের দিকে চলেছে। বিলের উত্তর পাড়ে বন-জাম গাছের ডালে ডালে কালো বাদুড় ঝুলছে। ঘুংরি পোকা ঘুর্-র্-র্ শব্দ করে ডাক শুরু করে দিয়েছে ঘাসের বনে।

নালু বললে, চল নীলি। মা বকবে—এমন সময় তার পায়ের তলায় পদ্মবনের মধ্যে কি একটা জিনিস পিছলে গেল, সেটাকে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল অন্যমনস্ক হয়ে।

চক্ষের পলকে নালু চেঁচিয়ে উঠল—সাপ! সাপ!—আমাকে খেয়ে ফেললে! ওমা—ওমা—উঁহু—উ—হু—

নীলি লাফিয়ে এল ওর কাছে—ভয় কি? ভয় কি? কোথায় সাপ?

—আমাকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে—ও নীলি—আমি মরে গেলাম—মাকে বলো—পা দিয়ে চেপে ধরেছি—উঁ-হু-হু—

নীলি জলে ডুব দিয়ে তার নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে নালুর পায়ের তলা দেখতে গেল এবং পরক্ষণেই প্রায় আধসের-আড়াইপোয়া ওজনের মস্ত একটা মাগুর হাতে তুলে ভেসে উঠলো, হাঁফাতে হাঁফাতে হাসিমুখে বললে—এই দেখো তোমার সাপ—মাগুর মাছে কাঁটা হেনেছে। আর ও ভাবছে সাপে খেয়ে ফেললে—সাপ অত সোজা নয়—

—দেখি, দেখি। ওঃ, এ যে মস্ত বড় মাগুর—

নালু পা দিয়ে কাদার মধ্যে সেটাকে চেপে ধরাতে মাছটা উপরি উপরি কাঁটা হেনেছে। পা টনটন করছে ওর। মাছটা ডাঙায় তুলে এনে ওর সব যন্ত্রণা সেরে গেল। ওরা অন্ধকার বাঁশবনের আমবনের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরলো।

নীলি বলল—মাছটা তুমিই নেও সবটা নালু। তোমাকে কাঁটা হেনেছে—আর

তুমিই পা দিয়ে চেপে ধরলে—

—না নীলি। তোমার আদ্ধেক আমার আদ্ধেক। এসো আমার সঙ্গে—

অন্ধকার উঠোনে পা দিয়েই নালু চেঁচিয়ে উঠলো—মাগো—কি এনেছি মা, মস্ত এক মাগুর মাছ—তার পরেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কে একজন চমৎকার মেয়েমানুষ সেজেগুজে ওদের ঘরের ছোট্ট বারান্দাতে বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। ওর মা বললে—এদিকে এসো। দিদি এসেছেন, প্রণাম করো। তোমার মেজদিদি—

নীলি পেছন থেকে জিগ্যেস করলে—কে উনি দিদি?

ননীবালা গর্বের সুরে বললে—আমার মেজ মেয়ে সীমা! তিনটে পাস। কলকাতার মেয়ে-ইস্কুলে কাজ করে। সোনার টুকরো মেয়ে। নালুকে নিতে এসেছে। বলছে, মা, আমার কাছে দাও, আমি নিয়ে গিয়ে ওকে লেখাপড়া শেখাবো। ছোট বোনটাকে এভাবে গাঁয়ে ফেলে রাখতে দেবো না। তা আমি বলছি—তোমাদের জিনিস, তোমরা নিয়ে যাবে, আমার বলবার কি আছে! তোমরাই তো ওর অভিভাবক, আমি কি বুঝি, মুখ্যু মা তোমাদের—

সীমা উঠে এসে নালুকে জড়িয়ে ধরলে দু-হাত দিয়ে।

ওর মা বললে—তোমার কাপড়ে কাদা লাগবে, বোসো মা সীমা, আমি আগে ওকে ধুইয়ে মুছিয়ে দিই।—

সীমা বললে—আমি দিচ্ছি। কেন, ও কি আমার বোন নয়? কী চমৎকার দেখতে হয়েছে খুকী! নাম কী বিচ্ছিরি রেখোছো মা! সরবালা! সরবালা আবার কি? আমি নাম রাখবো শকুন্তলা, কী সুন্দর চোখ দুটি! এক বছরের ছোট্ট খুকী দেখেছিলাম—

সত্যি, আজ কী অদ্ভুত সকালটা হয়েছিল! কার মুখ দেখে উঠেছিল ননী তাই ভাবছে। বিকেলে সে পুকুর থেকে কাপড় কেচে এসেছে সবে, এমন সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে ওর দরজার সামনে দাঁড়ালো। বেলা তখন আর নেই। ননী একদম চিনতে পারেনি। দশ বছর পরে সে দেখলো সীমাকে। উনিশ বছরের সীমার বয়েস আজ উনত্রিশ। চোখে আবার সোনা-বাঁধানো চশমা।

সীমা রাতে কত কথা বললে। সুললিতা দিদি মজঃফরপুরে থাকে তার স্বামীর কর্মস্থলে। সীমা কলকাতার বোর্ডিংয়ে থেকে পড়েছে। বাবার বাক্সে টাকা ছিল, ডাকঘরে টাকা ছিল, সব নিয়েছে বড়দি আর স্বামী। সীমা জানতে পেরে বলেছিল, তোমরা গরিব মাকে ফাঁকি দিলে। তাঁর কি আছে? তিনি তাঁর ছোট্ট মেয়েটাকে কি করে মানুষ করবেন? সুললিতা নাকি বলেছিল—যা, যা, বড্ড যুধিষ্ঠির তুমি! সৎমা গেঁয়ো মেয়ে না হলে সে-ই আমাদের সব গপ্‌পায় পুরতো কিনা! সৎমা সৎবোন কখনো আপন হয় না।

সীমাকে খেতে দিয়ে ননী বললে—কিছু খেতে দেবার ছিল না। ভাগ্যিস মাগুর মাছটা এনেছিল নালু বিল থেকে ধরে! বুঝলি নালু, তোর মাছ ধরা সাত্যোক হল।

সীমা পরদিন বিকেলে সরবালাকে নিয়ে নৌকোয় উঠলো। যাবার সময়ে বললে—মা, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। বাসা ঠিক করি আগে। বাসাটা ছোট। শকুন্তলার জন্যে (এর মধ্যেই সে নালুর নতুন নাম দিয়ে ফেলেছে) ভেবো না। ওকে গিয়েই ইস্কুলে ভর্তি করে দেবো। জন্মাষ্টমীর ছুটিতে নিয়ে এসে দেখিয়ে যাবো একবার। ও যে আমার বাবার মেয়ে, তা আমি কি ভুলতে পারি মা? পুজোর পর তোমাকেও যেতে হবে। রান্নার ডিপার্টমেণ্ট তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমরা দুই বোন লেখাপড়া নিয়ে থাকবো।—কি বলিস শকুন্তলা?

বিরজা হোম ও তার বাধা

ভৈরব চক্রবর্তীর মুখে এই গল্পটি শোনা। অনেক দিন আগেকার কথা। রোয়ালে-ক্দরপুর (খুলনা) হাইস্কুলে আমি তখন শিক্ষক। নতুন কলেজ থেকে বার হয়ে সেখানে গিয়েছি।

ভৈরব চক্রবর্তী ঐ গ্রামের একজন নিষ্ঠাবান সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত। সকলেই শ্রদ্ধা করতো, মানতো। এক প্রহর ধরে জপআহ্নিক করতেন, শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের জলস্পর্শ করতেন না, মাসে একবার বিরজা হোম করতেন, টিকিতে ফুল বাঁধা থাকতো দুপুরের পরে। স্ব-পাক ছাড়া কারো বাড়ি কখনো খেতেন না। শিষ্য করতে নারাজ ছিলেন, বলতেন, শিষ্যদের কাছে পয়সা নিয়ে খাওয়া খাঁটি ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাপ। আর একটা কথা, ভৈরব চক্রবর্তী ভালো সংস্কৃত জানতেন কিন্তু কোনো স্কুলের পণ্ডিতি করেননি। টোল করাও পছন্দ করতেন না। ওতে নাকি গভর্ণমেন্টের দেয় বৃত্তির দিকে বড় মন চলে যায়। টোল! ইন্সপেক্টরদের খোশামোদ করতে হয়। তবে দুটি ছাত্রকে নিজের বাড়িতে রেখে খেতে দিয়ে ব্যাকরণ শেখাতেন।

বর্ষা সে-বার নামে-নামে করেও নামছিল না, দিনে-রাতে গুমটের দরুন আমরা কেউ ঘুমুতে পারছিলাম না। হঠাৎ সেদিন একটু মেঘ দেখা দিল পুব-উত্তর কোণে। বেলা তিনটে। স্কুল খুলেছে গ্রীষ্মের ছুটির পরে। কিন্তু এত দুর্দান্ত গরম যে পুনরায় সকালে স্কুল করার জন্য ছেলেরা তদ্‌বির করছে, মাস্টারদেরও উস্কানি তাতে ছিল বারো আনা। হেড্‌মাস্টার আপিসঘরে বসে আছেন। গোপীবাবু ইতিহাসের মাস্টার, গিয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন—স্যার, মেঘ করেছে—

মুরলী মুখুয্যে (এই নামেই তিনি এ অঞ্চলের ছাত্রদের মধ্যে কুখ্যাত) গম্ভীর স্বরে

বললেন—কিসের মেঘ?

—আজ্ঞে, মেঘ যাকে বলে।

—কি হয়েছে তাতে?

—আজ্ঞে, বৃষ্টি হবে। স্কুলের ছুটি দিলে ভালো হত। ছেলেরা অনেক দূর যাবে, ছাতি আনেনি অনেকে।

—বৃষ্টি হবে না ও মেঘে।

খাস ইন্দ্রদেবের আপিসের হেড্ কেরানীও এতটা আত্মপ্রত্যয়ের সুরে একথা বলতে দ্বিধা করতো বোধ হয়। কিন্তু সকলেই জানে মুরলী মুখুজ্যের পাণ্ডিত্যের সীমা-পরিসীমা নেই, আবহাওয়াতত্ত্বটি তাঁর নখদর্পণে। গোপীবাবু দমে গিয়ে বললেন—বৃষ্টি হবে না?

—না।

—কেন স্যার? বেশ মেঘ করে এসেছে তো।

—মেঘের আপনি কি বোঝেন? ওকে বলে তাতমেঘা, ও মেঘে বৃষ্টি হবে না।

আমিও পাশের শিক্ষকদের বিশ্রাম-কক্ষ থেকে জানালা দিয়ে মেঘটা দেখেছিলাম এবং আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনাতে পুলকিত হয়েও উঠেছিলাম। মুরলী মুখুজ্যের নির্ঘাত রায় শুনে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললাম—বৃষ্টি হবে কিন্তু মনে হচ্ছে।

মুরলী মুখুজ্যে বললেন—তাতমেঘা। মেঘ হলেই বৃষ্টি হয় না।

—কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়?

—এখন বৃষ্টি হবে আলট্রা স্ট্রাটোস্ মেঘে। যাকে বলে শিট্ক্লাউড।

—ও!

—তাছাড়া হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। মন্সুনের আগে হাওয়া ঘুরে যাবে পুবে।

—ও!

আর কোনো কথা বলতে আমাদের সাহস হল না। কিন্তু ইন্দ্রদেব সেদিন বড়ই অপদস্থ করলেন আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ মুরলী মুখুজ্যেকে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই মেঘের চেহারা ঘন কালো হয়ে উঠলো, মেঘের চাদর ঢাকা পড়লো আরও ঘন আর-একখানা মেঘের চাদরে। তারপর স্কুলের ছুটি হওয়ার সামান্য কিছু আগেই ঝম্ঝম মুষলধারে বর্ষা নামলো। পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে খাল বিল নালা ডোবা ভাসিয়ে রামবৃষ্টি হওয়ার পরে বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আকাশ ধরে গেল। ছেলেরা তখনো পর্যন্ত স্কুলেই আটকে ছিল। কোথায় আর যাবে! সবাই আমরা আটকে পড়েছিলাম।

গোপীবাবু জয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে মুরলী মুখুজ্যেকে গিয়ে বললেন—দেখলেন স্যার, তখন বললাম বৃষ্টি আসবে, তখন ছুটিটা দিলে আর এমন হত না।

মুরলীবাবু বললেন—অমন হয়ে থাকে। ইতিহাস পড়ান, Higher Mathematics পড়ালে বুঝতেন। জগতে space and time নিয়ে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এডওয়ার্ড গার্নেটের প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন, এ বছরের Mathematical Gazette-এ, বুঝলেন?

—সেটা কি?

—এ্যালিস্ ইন্ ওয়ান্ডারল্যান্ড পড়েছেন তো? অঙ্কশাস্ত্রে এ্যালিস্ থ্রু লুকিংগ্লাসের পরীক্ষা আর কি। পড়ে দেখুন। গোপীবাবু চলে এলেন। অঙ্কশাস্ত্রের কথা উঠলেই স্বভাবত তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন।

বৃষ্টি থেমেছে, স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি আর গোপীবাবু চলেছি। দুজনেই আমরা মনে মনে বড় খুশি। হেড্মাস্টারকে আজ বড় জব্দ করা গিয়েছে। রোজ রোজ কেবল চালাকি!

এমন সময় ভৈরব চক্রবর্তীর বাড়ির দাওয়ায় দেখি ভৈরব চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে। খুব খুশি মন। আমাকে দেখে ডেকে বললেন—কেমন ননীবাবু, বৃষ্টি হল তো?

—এই যে চক্কোত্তি মশায়, নমস্কার। তা হল।

হবে না? আজ তিন দিন থেকে হোম করছি বিষ্টির জন্যে। ওর বাবাকে হতে হবে।

অবিশ্যি বৃষ্টির পিতৃদেব কে, তা ভালো জানা ছিল না। বললাম—বলেন কি! হোম করার ফল তাহলে ফলেছে বলতে হবে!

গোপীবাবু অর্ধস্ফুট স্বরে বলে বসলেন—লাগে তাক, না লাগে তুক।

ভৈরব চক্রবর্তী কথাটা শুনতে পেয়ে বললেন—আসুন দু-জনেই আমার বাড়ি মাস্টারবাবুরা। দেখুন দেখাই।

গোপীবাবু ও আমি দু-জনে দাওয়ায় গিয়ে বসলাম। মনটা বেশ ভালো। দুঃসহ গরমের পর প্রচুর বৃষ্টি হয়ে দিনটি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আজ পনরো দিন দারুণ গুমটে রাত্রে ঘুমুইনি।

গোপীবাবু কেবল বলছিলেন—আজ খুব ঘুম হবে, কি বলেন?

—নিশ্চয়। তার আর ভুল?

ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের নিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে। সেখানে সত্যিই হোমের আগুনের কুণ্ডু—বালি বিছিয়ে তৈরি, বেলকাঠ ও জগ্‌গিডুমুরের ডালের বাড়তি সমিধ (যজ্ঞের কাঠ) এক পাশে গোছানো। পূর্ণপাত্রে সিধে সাজানো, তামার টাটে নারায়ণশীলা। সিঁদুর বেলপাতা তামার বড় থালায়। হোম হয়ে গিয়েছে, উপকরণের অবশেষ এদিক ওদিক ছড়ানো।

ভৈরব চক্কোত্তি বললেন—দেখলেন মাস্টারবাবু? হোম করার ফল আছে কি না দেখলেন?

গোপীবাবু বললেন—আপনি অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করেন?

—নিশ্চয়ই। নিজের চোখে দেখা। অপদেবতার কাণ্ড দেখছি যে কত! পঞ্চমুণ্ডির আসনে জপ করার সময়!

—বলুন না দু-একটা ঘটনা।

—না, সে-সব বলবো না। থাকগে। কিন্তু আজ এক বছরও হয়নি একটা অলৌকিক কাণ্ড দেখেছিলাম আমার এক যজমান-বাড়ি। সেইটাই বলি। একটু চা করতে বলি?

এমন সময় আবার কালো মেঘ করে বৃষ্টি শুরু হল। অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। ঝড় উঠলো খুব ঠাণ্ডা হাওয়ার। ছড়্ ছড় করে পাকা জাম পড়তে লাগল চক্কোত্তি মশায়ের বড়ির সামনের গাছটা থেকে। নতুন জলে ব্যাঙ ডাকতে লাগলো চারিদিকে।

চা এল। আমরা ছাতি নিয়ে বেরুইনি। এই বৃষ্টি মাথায় করে যাবার উপায় নেই। বেশ জমিয়ে গল্প শুনবার জন্যে ভৈরব চক্রবর্তীর মাটির দাওয়ায় মাদুরের ওপর বসে গেলাম।

ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের চা দিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এলেন। তারপর শুরু করলেন গল্প বলতে

আর বছর ভাদ্র মাসের কথা। এখনো বছর পোরেনি। আমার এক যজমান-বাড়ি থেকে খবর পেলাম তার একটি মেয়ের বড় অসুখ; আমাকে তার বাড়িতে গিয়ে বিরজা হোম করতে হবে মেয়েটির জন্যে। বিরজা হোমে পূর্ণ আহুতি দিলে শক্ত রুগী ভালো হয়ে যায়। আমি এমন সারিয়েছি।

আমাকে তারা নৌকো করে নিয়ে গেল গোবরডাঙ্গা স্টেশন থেকে যমুনা নদীর ওপর দিয়ে। অজ পাড়াগাঁ। ঘরকতক ব্রাহ্মণ ও বেশির ভাগ গোয়ালা ও বুনোদের বাস। যমুনার ধারেই গ্রামের মেয়েরা নদীর ঘাটেই স্নান করতে আসে।

—গ্রামের নাম কি?

—সাতবেড়ে। তারপর শুনুন। গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলাম বিকেলে। খুব বন জঙ্গল গ্রামের মধ্যে। একটা ভাঙা শিবমন্দির আছে, সেকেলে ছোট ইটের তৈরি। মন্দিরের মাথায় বট-অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে, প্রকাণ্ড বড় একটা শিবলিঙ্গ বসানো মন্দিরের মধ্যে, চামচিকের নাদিতে আকণ্ঠ ডোবা অবস্থায়। পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগেই।

এই সময় আমাদের জন্যে ভৈরব চক্রবর্তীর বড় মেয়ে শৈল চালভাজা ও

ছোলাভাজা নিয়ে এলো তেন-নুন মেখে। ভৈরব চক্রবর্তী বিপত্নীক, তার মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে সবে ক-দিন হল, চলে গেলে চক্রবর্তী মশাই নিজেই রান্না করে খান।

আমরা সকলেই খাবার খেতে আরম্ভ করে দিলাম। ভৈরব চক্রবর্তীও সেই সঙ্গে। এখনও দিব্যি দাঁতের জোর, ওই বয়সে এমন চাল-ছোলাভাজা যে খেতে পারে, তার বহুদিনেও দাঁত নষ্ট হবে না।

তিনি খেতে খেতেই বলে চললেন—এই শিবমন্দিরটার কথা মনে রাখবেন, এর সঙ্গে আমার গল্পের সম্পর্ক আছে। তারপর আমরা গিয়ে সে বাড়ি উঠে হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হবার পর গৃহস্বামী একটি ঘরে আমায় নিয়ে গেলেন। অসুস্থ মেয়েটি সেই ঘরে শুয়ে আছে। বয়েস তেরো-চোদ্দ হবে, নিতান্ত রোগা নয়, বেশ মোটাসোটা ছিল বোঝা যায়—গলায় একরাশ মাদুলি। মেয়েটি চোখ বুজে একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতেই এবার সে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে আবার পাশ ফিরলে।

মেয়েটির গায়ে জ্বর। বেশ জ্বর, তিনের কাছাকাছি হবে। চোখে ক্লান্ত দৃষ্টি, চোখের কোণ সামান্য লাল। নাড়ি দেখলাম, বেশ নাড়ি, শক্তই আছে। হঠাৎ কোনো ভয়ের কারণ আছে বলে মনে হল না। তাছাড়া, আমার ওপর মেয়ের চিকিৎসার ভার নেই, আমি এসেছি হোম করতে।

গৃহস্বামী বললেন—আপনি আশীর্বাদ করুন, পায়ের ধুলো দিন মাথায় ওর।

পায়ের ধুলো মাথায় দিতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ গৃহস্বামী আছাড় খেয়ে পড়ে গেল খাটের প্যাশে। আমি চমকে উঠলাম। হাত নড়ে গেল। লোকজন দৌড়ে এল কি হয়েছে দেখতে। কিছুই সেখানে নেই, না একটা কলার খোসা, না কিছু। লোকটি পড়লো কি করে? পায়ের ধুলো দেবার কথা চাপা পড়ে গেল। গৃহস্বামীর মাথায় ও মুখে ওর বড় শালা ঠাণ্ডা জল দিতে লাগলো। মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সে এক হৈ-চৈ ব্যাপার।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি তান্ত্রিক হোম করি। কিছু কিছু দৈব ঘটনা বুঝি। লক্ষণ, প্রতিলক্ষণ, চিহ্ন আর ইঙ্গিত এই নিয়ে দৈব। গোড়াতেই এর লক্ষণ খারাপ বলে যেন মনে হচ্ছে। তবে কি হোমে বসবো না? সন্ধ্যার কিছু পরে শিবমন্দিরের সামনের রাস্তায় পায়চারি করছি। বড্ড গরম। বাড়ির মধ্যে হাওয়া নেই। রাস্তায় তবু একটু হাওয়া বইছে। হঠাৎ আমার কানে গেল, কে যেন বলছে—শুনুন, শুনুন। দু-বার কানে গেল কথাটা। এদিক ওদিক চাইতেই চোখে পড়লো শিবমন্দিরের মধ্যে ঠিক দোরের গোড়ায় একটি কে মেয়ে-মানুষ দাঁড়িয়ে।

বললাম—আমায় বলছেন?

—হ্যাঁ। ও খুকীর জন্যে বিরজা হোম করবেন না। ও বাঁচবে না।

—কে আপনি?

—আমি যে-ই হই। যদি ভালো চান, হোম করবেন না।

আমি বস্মিত হলাম। নির্জন, অন্ধকার, ভাঙা মন্দির। সেখানে এখন মেয়ে-মানুষ আসবে কে? এমন আশ্চর্য কথাই বা বলে কেন? আমার খানিকটা রাগও হল। আমার ইচ্ছার ওপর বাধা দেয় এমন লোক কে? মানুষ তো দূরের কথা, অপদেবতাকেও কখনও গ্রাহ্য করিনি। মায়ের আশীর্বাদে সবই সম্ভব হয়। ভৈরব চক্রবর্তীকে ভয় দেখানো সহজ নয়।

আমার এই অদ্ভুত দর্শনের কথা বাড়ি ফিরে কাউকে বললাম না। রাত্রে বসে হোমের জিনিসপত্রের ফর্দও করে দিলাম। তারপর রাত আটটা বাজল, গৃহস্বামী আমাকে রান্নাবান্না করতে বললেন। এইবার আমার গল্পের আসল অংশে আসবো। তার আগে ওদের বাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

বাড়িটা খুব পুরনো কোঠা বাড়ি, কোনো ছিরি-সৌষ্ঠব নেই, কিন্তু দোতলা। পল্লিগ্রামে দোতলা বাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। যমুনা নদীর ধারে ঠিক নয় বাড়িটা, সামান্য দূরে। মধ্যে কেবলমাত্র একখানা বাড়ি। ঐ বাড়ির ছাদ আর এ বাড়ির ছাদের মধ্যে দশ-বারো ফুট চওড়া একফালি জমির ব্যবধান।

ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর। সেই ঘরে আমার বিছানা পাতা হয়েছে। পাশে খোলা ছাদে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোনামুগের ডাল, আতপ চাল, বড়ি, আলু আর ঘি। আমি একাই রাঁধছি, রান্নার সময় কাছে কেউ থাকে আমি পছন্দ করিনে। রান্নার আগে একবার চা করে খেলাম। পরের তৈরি চা খেয়ে তৃপ্তি পাইনে।

রান্না করতে রাত হয়ে গেল। রাত সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটু জিরিয়ে তামাক খেয়ে নিয়ে ভাত বেড়ে নিলাম হাঁড়ি থেকে আঙটকলার পাতে। তারপর খেতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল ছাদে আমি একা নেই। এদিক ওদিক চাইলাম, কেউ কোথাও নেই, রাত বেশি হয়েছে, বাড়ির লোকও নীচের তলায় খেয়েদেয়ে শুয়েছে, গ্রামই নিষুতি হয়ে গিয়েছে। কেবল যমুনা নদীতে জেলেদের আলোয় মাছ ধরার ঠুক্ ঠুক শব্দ হচ্ছিল।

হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে চাইলাম।

আমার সামনে ছাদের ধারে ওটা কি গাছ? কালোমতো, লম্বা তালগাছের মতো? এতক্ষণ ছাদে বসে রান্না-বাড়া করছি, কই, অত বড় একটা গাছ নজরে পড়েনি তো

এর আগে? ছিল নিশ্চয়ই, নয়তো এখন দেখছি কি করে? কি গাছ ওটা? সত্যি, যখন চা খেলাম, তখন দুটো বাড়ির মধ্যেকার ওই রাস্তাটা দিয়ে একখানা গরুরগাড়ির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচশব্দে আমাকে ওদিকে তাকাতে হয়েছিল। তখন, তো কই অত বড় একটা তালগাছ—উঁহু, কই! নাঃ দেখিনি!

কিন্তু তালগাছটা এমনভাবে—ও কি রকম তালগাছ? ওকি? ওকি!

আমি ততক্ষণ বিভীষিকা দেখে ভাত ফেলে লাফিয়ে উঠে পড়েছি।

তালগাছ্ না।

এখনো ভাবলে—এই দেখুন, গায়ে কাঁটা দিয়েছে। যদিও আমার নাম ভৈরব চক্কোত্তি, তান্ত্রিক। পিছনের ছাদের কার্নিসের ওপর দাঁড়িয়ে এক বিরাটকায় অসুর কিংবা দৈত্যের মতো মূর্তি, তার তত বড় বড় হাত পা—সেই মাপে। মাথাটা একটা ঢাকাই জালার মতো, চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতো রাঙা, আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে! আমার দিকেই তাকিয়ে আছে অসুরটা, যেন আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে।

বিরাট মূর্তি। তালগাছের মতোই লম্বা। অনেক উঁচুতে তার মাথাটা। নীচু চোখে সেটা আমার দিকে চেয়ে আছে।

ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। দু-দু-বার চোখ রগড়ালাম। দু-বার চা খেয়ে কি এমন হল? না। ওই তো সেই বিরাট, তাল-শাল-নারকোল গাছের মতো তে-ঢ্যাঙা বেখাপ্পা অপদেবতার মূর্তি বিরাজ করছে সামনে জমাট অন্ধকারের মতো। এবার ভালো করে দেখে মনে হল পিছনের ছাদে সেটা দাঁড়িয়ে নয়, কোথাও দাঁড়িয়ে নেই—দুই বাড়ির মধ্যেকার ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে বলা যায়। কারণ, ওই জীবের নাভিদেশ থেকে ওপর পর্যন্ত আমার সামনে। তার নীচেকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার দৃষ্টিরেখার নীচে।

এ বর্ণনা করতে যত সময় লাগলো, অতটা সময় লাগেনি আমার বারকয়েক দেখতে জীবটাকে। এক থেকে দশ গুণতে যত সময় লাগে, ব্যস্। আমি বলতে পারি, অন্য যে কেউ ওই বিকট অপদেবতার মূর্তি অন্ধকারে নির্জনে ছাদে গভীর রাতে দেখলে আর গোলার ধানের ভাত খেতো না পরদিন।

আমি অপদেবতা দেখেছি, পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসলে জপের শেষের দিকে প্রায়ই ভয় দেখাতো। কিন্তু সে এ ধরনের বিকট ও বিরাট ব্যাপার নয়। ভয় পেয়ে গেলাম। ঠক্ ঠককরে কাঁপতে লাগলাম। চক্ষে অন্ধকার দেখে পড়ে যাই আর কি। পড়লেই হয়ে যেতো। দুর্বল মানুষ মরে ওদের হাতে। মন সবল হলে ওরাই পালায়।

নিজেকে তখুনি সামলে নিলাম। তারামন্ত্র জপ শুরু করলাম জোরে জোরে। সেই

দিকে চেয়ে জপ করতে করতে ক্রমে মূর্তি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মূর্তিটা আমার সামনে সবসুদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল এক থেকে ত্রিশ গুনতে যতটা সময় নেয় ততটা। এর খুব বেশি হবে না কখনো। সেটা মিলিয়ে যেতে আর-একবার চোখ রগড়ালাম, কিছুই নেই। বিশ্বাস করুন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীচের তলা থেকে কান্নাকাটি উঠলো। রুগী মেয়েটি মারা গিয়েছে।

—তখুনি?

—তখুনি। এ ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা দিতে আমি রাজী নই। যা ঘটেছিল অবিকল তাই নিবেদন করলাম আপনার কাছে। বিশ্বাস করুন বা না-করুন।

রূপো-বাঙাল

আমি সকালে উঠেই চণ্ডীমণ্ডপে যেতাম হীরু মাস্টারের কাছে পড়তে।

আজ ঘুম ভাঙতে দেরি হওয়ায় মনে হল কাল অনেক রাত্রে বাবা বাড়ি এলেন মরেলডাঙা কাছারি থেকে। আমরা সব ভাইবোন বিছানা থেকে উঠে দেখতে গেলাম বাবা আমাদের জন্যে কি কি আনলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে পা দিতেই রূপোকাকা আমাদের বকে উঠলো—এ্যাঃ, রাজপুত্তুর সব উঠলেন এখন! মারে গালে এক এক চড় যে চাবালিটা এমনি যায়! বলি, করে খাবা কি ভাবে? বামুনের ছেলে কি লাঙল চষতি যাবা?

বাবা বাড়ি থাকতেও রূপোকাকা আমাদের চোখ রাঙাবে।

দাদা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে—রাতে ঘুম হয়নি রূপোকাকা।

—কেন রে?

—ছারপোকার কামড়ে। বাব্বাঃ, যা ছারপোকা খাটে!

—যা যা, তাড়াতাড়ি পড়তে যা।

রূপোকাকা আমাদের আত্মীয় নয়, বাবার বন্ধু নয়, বাড়ির গোমস্তা কি নায়েব নয়, এমন কি রূপোকাকা হিন্দু পর্যন্ত নয়। রূপোকাকা আমাদের কৃষাণ মাত্র। মাসে সাড়ে তিন টাকা মাইনে পায়।

রূপোকাকার আসল নাম রূপো-বাঙাল, ও জাতে মুসলমান। আমাদের গাঁয়ের চৌকিদারও ও। পিসিমার মুখে শুনেছি রূপোকাকা নাকি সাজিমাটির নৌকাতে চড়ে ওর কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের সময় দক্ষিণ দেশ থেকে আমাদের গ্রামের ঘাটে নিরাশ্রয় অবস্থায় এসে নেমেছিল। কেন এসেছিল দেশ থেকে তা শুনিনি। সেই থেকে

আমাদের গ্রামেই রয়ে গিয়েছে—বিদেশ থেকে এসেছিল বলে উপাধি 'বাঙাল'—এ উপাধিরই বা কারণ কি তা বলতে পারব না।

রূপোকাকা আমাদের বাড়ি কৃষাণগিরি করচে আজ বহুদিন। আমাদের ও জন্মাতে দেখেচে। কিন্তু সেটা আশ্চর্য কথা নয়, আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে, ও আমার বাবাকে নাকি কোলে করে মানুষ করেচে। অথচ রূপোকাকাকে দেখলে তেমন বুড়ো বলে মনে হয় না।

আমারই ঠাকুরদাদা হরিরাম চক্রবর্তী গাড়ু হাতে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সায়েবের ঘাটে কইমাছ কেনবার জন্যে। রূপোকাকা সাজিমাটির নৌকাতে বসেছিল। ওর অবস্থা দেখে হরিরাম চক্রবর্তী ওকে গ্রামে আশ্রয় দেন। সে সব অনেক দিনের কথা। রূপোকাকার বয়স এখন কত তা জানি না, মোটের উপর বুড়ো। ঠাকুরদাদা যখন মারা যান, বাবার তখন পঁচিশ বছর বয়েস। বাবাকে তিনি নায়েব পদে বহাল করে গেলেন জমিদারবাবুকে বলে-কয়ে। সেই থেকে বাবা আছেন মরেলডাঙা কাছারিতে। আর বাড়িতে বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা, প্রজা, খাতাপত্র এ-সব দেখা-শুনো করার ভার ঐ সাড়ে তিন-টাকা মাইনের কৃষাণ রূপোকাকার ওপর।

আমাদের অবস্থা ভালো গ্রামের মধ্যে—একথা সবার মুখেই শুনে এসেচি জ্ঞান হয়ে অবধি। বড় বড় চার-পাঁচটা ধানের গোলা। এক-একটিতে অনেক ধান ধরে। কলাই মুগ অজস্র। প্রজাপত্র সর্বদা আসচে খাজনা দিতে।

এসব দেখাশুনা করে কে?

রূপোকাকা সব দেখা-শুনা করতো। আশ্চর্যের কথা, বাবা বিশ্বাস করে এই সামান্য মাইনের মূর্খ কৃষাণকে এত সব বিষয়-আশয় দেখবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বাবাকে সবাই ভীষণ ভয় করে চলতো ; মুখের ওপর কথা বলতে সাহস করতো না কেউ। কিন্তু রূপোকাকা বাবাকে বলতো—বলি, ও বাবু, তুমি যে এসো বাড়িতি ন-মাস ছ-মাস অন্তর, এতডা বিষয় দেখে কে বল তো? আদায়-পত্তর তো এ বছর কিছু হলোনি। হাতির পাঁচ পা দেখেচো নাকি? এত বড় সংসারটা চলবে কিসি?

বাবা দু-মাস অন্তর দু-তিন দিনের জন্য বাড়ি আসেন।

বাবার অনুপস্থিতিতে গোলার চাবি খুলে রূপোকাকা ধান পাড়তো, কলাই মুগ পাড়তো। খাতকদের কর্জ দিতো। নিজের দরকার হলে নিজেও নিতো।

আমরা সব ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝিনে। ঠাকুরমা প্রবীণা বটে, কিন্তু ভালোমানুষ। বিষয়-আশয়ের কিছুই বুঝতেন না। আমাদের আছে সব, কিন্তু দেখে নেবার লোক

নেই।

সে অবস্থায় সব কিছুর ভার ছিল রূপোকাকার ওপর।

বাবা বাড়ি এসে পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসতেন মহাজনী খাতা খুলে।

বলতেন—কে কি নিয়েচে রূপো?

রূপোকাকা বলতো—লিখে রাখো, সনাতন ঘোষ ছ-কাঠা কলাই, দু-কাঠা বীজ মুগ, কড়ি ছ-কাঠা—

—আচ্ছা।

—হয়েচে? আচ্ছা লেখো—বীরু মণ্ডল দু-বিশ ধান, কড়ি পাঁচ সলি—

—আচ্ছা।

—হয়েচে?

—হয়েচে—

—রূপো-বাঙাল এক বিশ ধান দু-কাঠা কলাই—

—আচ্ছা।

—হয়েচে।

—লেখো, কাটু কলু চার কাঠা কলাই, কড়ি চার কাঠা। ময়জদ্দি সেখ ধান এগারো কাঠা, কড়ি সাত কাঠা।

এইভাবে রূপোকাকা অনর্গল বলে চলেচে গত দু-মাসের মধ্যে কর্জ দিয়েচে যাকে যতটা জিনিস। ওর সব মুখস্থ, কোনো কিছু ভোলে না। ওরই হাতে গোলার চাবির থোলো। যাকে যা দরকার দিয়ে সব মনে করে রেখে দিয়েচে, বাবার খাতায় লেখবার জন্যে।

একদিন একটা ঘটনা ঘটলো।

রূপোকাকার জ্বর হয়েছিল, আমাদের বাড়িতে আসেনি দু-তিন দিন।

এমন সময় বাবা বাড়ি এলেন মরেলডাঙা থেকে। এসেই বিকেলে রূপোকে ডেকে পাঠালেন। রূপো জ্বরে কাঁপতে কাঁপেতে বললে—বলোগে যাও, আমি জ্বরে উঠতি পারচিনে। এখন যেতি পারবো না—জ্বরে মরচি। তা সীতানাথ আর আসতে পারলে না পায়ে পায়ে? তার একটু এলে কি মান যেতো?

বাবা বাবু-মানুষ। নতুন বাবু, রূপো বাঁধানো ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়ান কোঁচা হাতে নিয়ে। ঘড়ির চেন ঝোলে বুকে, হাতে থাকে ঝকমকে আংটি। প্রজাপত্তরের কাছে খুব খাতির। বাবাকে যখন লোকে ফিরে এসে একথা বললে, তখন বাবা একেবারে তেলেবেগুনে উঠলেন জ্বলে। কিন্তু তখন কিছু না বলে গুম্ হয়ে রইলেন!

এর দিন পাঁচ-ছয় পরে রূপোকাকা সেরে উঠে আমাদের বাড়ি এল। বাবা তখন

চণ্ডীমণ্ডপে বসে হিসেবের খাতাপত্র দেখছিলেন। ওকে দেখেই কড়া সুরে বলে উঠলেন—রূপো!

—কি?

—তুমি মনে মনে কি ভেবেচ জিজ্ঞেস করি? তোমার এত বড় আস্পর্ধা, তুমি বলো আমি পায়ে পায়ে তোমার বাড়ি যাবো? তুমি জানো, কার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ? তোমার মুণ্ডুটা যদি কেটে ফেলি তাহলে খোঁজ হয় না, তুমি জানো? এত বড়লোক তুমি হলে কবে?

রূপোকাকাও সমানে গলা চড়িয়ে উত্তর দিলে—তা তুমি মাথা কাটবে না? এখন কাটবে বৈকি! হ্যাঁরে সীতেনাথ, তোকে যে কোলে করে মানুষ করেছিলাম একদিন, মনে পড়ে? এখন তুমি বড় হয়েচ, বাবু হয়েচ, সীতেবাবু—এখন তুমি আমার মুণ্ডু কাটবা না? বড্ড গুণবন্ত হয়েচিস তুই, হ্যাঁ সীতেনাথ—

'তুমি' ছেড়ে রূপোকাকা, সামান্য সাড়ে তিন টাকা মাইনের কর্মচারী হয়ে মনিবকে 'তুই' বলেই সম্বোধন আরম্ভ করলে সকলের সামনে।

বাবা বললেন—যা যা, বকিসনে—

—না, বকবো না—তুই বড্ড তালেবর হয়েচিস আজকাল, বড্ড বাবু হয়েচিস—তুই আমার মুণ্ডু নিবি না তো কে নেবে?

বলেই রূপোকাকা হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে।

আমার ঠাকুরমা ছিলেন বাড়ির মধ্যে। রূপোর কান্না শুনে তিনি বাইরে ছুটে এসে বাবাকে যথেষ্ট বকলেন।

বাবা বললেন—তা বলে আমায় ওরকম বলে কেন?

ঠাকুরমা বললেন—তুই কাকে কি বলিস সীতে, তোর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? তুই কি ক্ষেপলি?

বাবা কলম ছেড়ে বাড়ির মধ্যে উঠে এলেন, তারপর রূপোকাকার হাত ধরে বললেন—রূপোদা, তুই কিছু মনে করিসনে। আমার বলা ভুল হয়ে গিয়েচে, বড্ড ভুল হয়েচে।

রূপোকাকার রাগ কমে না, বললে—না, আমার দরকার নেই কাজে। ঢের হয়েচে। নে, তোর গোলার চাবিছড়া রেখে দে—মুই আর ওসব ঝামেলা পোয়াতে পারব না। নে তোর চাবিছড়া।

কতবার বোঝানো হল, রূপোকাকা কিছুতেই শুনবে না। চাবির থোলো সে খুলে বাবার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

শেষে বাবা বললেন—বেশ, তাহলে আমিই বাড়ি ছেড়ে যাই। রইল গোলা-

পালা, প্রজাপত্তর। আমি কাল সকালের গাড়িতেই বেরুচ্চি—

রূপোকাকা ঝাঁঝের সঙ্গেই বললে—তুই চলে যাবি তো তোর কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করবে কেডা?

—কেন, তুমি?

—মোর দায় পড়েচে। তোরে কোলেপিঠে করে মানুষ করলাম বলে কি তোর ছেলেপিলেও কোলেপিঠে করে মানুষ করবো? আমি কি আর জোয়ান আছি? এখন বুড়ো হইচি না? ওসব ঝামেলা আমার দ্বারা আর হবে না—

—না, আমি আর থাকবো না। কালই যাবো চলে।

—কোথায় যাবি?

—মরেলডাঙা চলে যাবো। ঠিক বলচি যাবো। আমার বড্ড কষ্ট হয়েচে রূপোদা, তুমি আমায় এমন করে বললে শেষকালে। আমি গৃহত্যাগী হবো, হবো, হবো—বলেই বাবা ফেললেন কেঁদে।

রূপোকাকা অমনি উঠে এসে বাবার হাত ধরে বললে কাঁদিসনে সীতেনাথ, কাঁদিসনে, ছিঃ—মুই আর তোরে কি বললাম? তুই-ই তো কত কথা শুনিয়ে দিলি—কাঁদিসনে—

শেষে দু-জনেরই কান্না।

আমরা ছেলেমানুষ, অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম দুই বড় লোকের কান্না। দাদা আমায় কনুইয়ের গুঁতো মেরে মুখে হাত চেপে হি হি করে হেসে উঠলো। আমরা অবিশ্যি দূরে গোলার নিমতলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি মিটমাট হয়ে গেল। বাবাও দেশত্যাগী হলেন না, রূপোকাকাও চাকরি ছাড়লেন না।

রূপোকাকা রাত্রে চৌকিদারি করতো। অনেক রাত্রে আমাদের বাড়ি এসে ঠাকুরমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলতো—ওঠো, বৌমা, জাগন থাকো। রাত খারাপ। চণ্ডীমণ্ডপে সন্নিসি ঘোষ ও হীরু মাস্টার শুয়ে থাকতো, তাদের জাগিয়ে দিয়ে বলতো—একেবারে অত নাক ডাকিয়ে ঘুমোও কেন? ওঠো, মাঝে মাঝে তামুক খাও আর গোলাগুলোর চারিধারে বেড়িয়ে এস না।

একটা অদ্ভুত দৃশ্য কতদিন হীরু মাস্টার দেখেচে।

আমাদের গল্প করেচে সকালবেলা।

সব গ্রাম ঘুরে এসে অনেক রাত্রে চৌকিদারি পোশাক পরে লাঠি হাতে রূপোকাকা অন্ধকারে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠার ওপর বসে থাকতো।

এক-একদিন হীরু মাস্টার বাইরে এসে ওকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস

করতো—কে বসে?

—মুই রূপো।

—বসে কেন? এত রাতে?

—তোমরা তো দিব্যি ঘুমোচ্ছ, তোমাদের আর কি? গোলার ধান যাবে, সীতেনাথের যাবে। চোরের যা উপদ্রব হয়েছে তার খবর কি জানবা? মোর ওপর ঝক্কি কত! মোর তো তোমাদের মতো ঘুমুলি চলবে না। সীতেনাথের এ ঝামেলা আর কদ্দিন পোয়াবো। এবার এলি চাবিছড়া তার হাতে দিয়ে মুই খোলসা হবো। এ আর পারি না বুড়ো বয়সে রাত জাগতি—

হীরু মাস্টার বলে ঘুমোওগে যাও—

—কিন্তু মুই যে তোমাদের মতো নিশ্চিন্দি হতে পারিনে তার কি হবে? ধানগুলোর ঝক্কি যে মোর ঘাড়ে ফেলে সে বাবু দিব্যি চাঙা হয়ে বসে আছেন। এবার আসুক, কিছুতেই আর এ বোঝা ঘাড়ে রাখচিনে মুই।

কিন্তু নিজের ইচ্ছেতে তার ছাড়তে হয়নি। বৃদ্ধ বয়সে তিন দিনের জ্বরে রূপোকাকা আমাদের গোলার দায়িত্ব নামিয়ে চলে গেল। এও সাত-আট বছর পরের কথা। আমরা তখন স্কুলে পড়ি। সবসুদ্ধ ত্রিশ-বত্রিশ বছর ও ছিল আমাদের বাড়ি।

বাবার সঙ্গে আমরাও দেখতে গেলাম রূপোকাকাকে।

রূপোকাকার ছোট চালাঘর। একদিকে ডোবা, একদিকে বাঁশঝাড়। ছেঁড়া মলিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে শীর্ণ, সাদা দাড়ি রূপোকাকা পুরনো মাদুরে শুয়ে। রূপোকাকার ছেলের নাম বেজা, লোকে বলে বেজা-বাঙাল। বেজা আমাদের দেখে বললে—আসুন বাবুরা, দেখুন দিকি বাবারে? জ্ঞান নেই, ভুল বকচে—

বাবা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন—ও রূপোদা! কেমন আছ, ও রূপোদা—

রূপোকাকা চোখ মেলে বললে—কেড়া? সীতেনাথ? কবে এলে?

—এই পরশু এসেচি।

—বেশ করেচ। এই শোনো, খাতার মুড়োয় লিখে রাখো, মুই চিঁড়ে খাবার বেনামুরি ধান নিইচি চার কাঠা, আহাদ মণ্ডল কলাই দু-কাঠা, বাড়ি দু-কাঠা, বিষ্টু ধেরিসি ছ' কাঠা ধান, বাড়ি চার কাঠা—মোর ধান পোষ মাসের ইদিকে দিতে পারবো না বলে দিচ্চি—ভুলে যাবো, লিখে রাখো—

এই রূপোকাকার দায়িত্বের শেষ। আর কোনো কথা বলেনি রূপোকাকা। সেদিন সন্ধেবেলা রূপোকাকা আমাদের গোলা-পালার দায়িত্ব চিরদিনের মতো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বিশ্বস্ত লোকেদের জন্যে কি কোনো স্বর্গ আছে?

যদি থাকে, আমাদের বাল্যের রূপোকাকার আসন অক্ষয় হয়ে আছে সেখানে।

আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা এসব। এই সব চোরাবাজারের দিনে, জুয়োচুরির দিনে, মিথ্যে কথার দিনে বড্ড বেশি করে রূপোকাকার কথা মনে পড়ে।

তেঁতুলতলার ঘাট

হারুর আজ আর জ্বর আসেনি। এখন তার মনটাতে বেশ স্ফূর্তি আছে। জ্বর এলে আর স্ফূর্তি থাকে না। কিছু-না-কিছু নিরানন্দ আসেই। আজ চার মাস ধরে সমানভাবে ম্যালেরিয়া জ্বর, পেট-জোড়া পিলে, আর সর্বদাই ভয় এই বুঝি জ্বর এলো।

অনেকেই ওকে দেখে বলে—ইস্! ছেলেটার মৃত্যুদশা হয়েছে একেবারে। এবার বুঝি বা মরে।

এসব বলতো এমন সব লোকে, যারা ওকে ভালোবাসার চোখে দেখে না। যে ভালোবাসার চোখে দেখে সে কি এমন কথা বলতে পারে! হারুও তা বুঝতো, বুঝে চুপ করে থাকতো। জ্বর আসাটা যেন ওর মস্ত অপরাধ, এজন্যে সে একদিকে যেমন বাড়িতে বাবা ও পিসিমার, অন্যদিকে তেমনি পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছেও অপরাধী।

ওর মা বলে—সকলের হাড় জ্বালালি তুই বাপু, কারু সোয়াস্তি নেই তোর জন্যে।

অথচ কেমন সুন্দর দিনগুলি। সুনীল আকাশ, অদ্ভুত ধরনের সুনীল আকাশ। ঝলমলে রোদ পড়েচে, পথঘাটের দু-ধারে বনঝোপ। রাস্তাঘাট এখনো খট খট করচে। আজ দিন কুড়ি একদম বৃষ্টি বন্ধ। চাষারা রোজ গাজিতলায় রোজ-পালুনি করচে। আল্লা আল্লা বলে মাঠে বুক চাপড়ে চিৎকার করচে, বৃষ্টির চিহ্নও নেই। মেঘই নেই আকাশে, তার বৃষ্টি। ধান এবার হবে না সবাই বলচে।

এইসব দিনে প্রত্যেক ঝোপে, প্রত্যেক লতার তলায় যখন রোদ পড়ে, যখন মউটুস্‌কি পাখি বন-চন্দনা লতার আগায় মুখ উঁচু করে দোল খায়, কটুগন্ধ ঘেঁটকোল ফুলের দল ঝোপেঝাড়ে ফোটে, তখন ঘর আর বার একাকার হয়ে যায়, ঘরে মন বসে না।

হারু তখন পাশের বাড়ির চুনুর আর মণ্টুর বাড়ি যায়।

মণ্টু মায়ের জন্যে ডাঁটা শাক তুলচে ওদের বাড়ির সামনের ক্ষেতে। ওকে দেখে বললে—কি রে, আজ জ্বর আসেনি তোর?

যেন তার জ্বর আসাটা প্রভাতকালে সূর্যোদয়ের মতো একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। কেন যে ওরা জ্বরের কথাটা মনে করিয়ে দেয়! হারু বললে—না, জ্বর কিসের? চল বেড়িয়ে আসি।

—মাকে ডাঁটাগুলো দিয়ে আসবো। তুই একটু দাঁড়া।

—এ ক্ষেত করেচে কে?

—তুই জ্বরে পড়ে ভুগবি, দেখতে তো আসবিনে। এবার এ ক্ষেত আমি করেচি। মা বললে, ডাঁটা করে রাখ জমিটাতে, তাই জমিটা করলাম।

হারুর মনে দুঃখ হল বার বার তার জ্বর আসার উল্লেখ করাতে। একবার এত রাগ হল সে বেড়াতে যাবে না কারুর সঙ্গে। একাই সে পথে পথে আগেও খেলা করতো, এখন জ্বর হওয়ার পর থেকে মনটা কেমন হয়ে পড়েচে, একা বেড়াতে ভয়-ভয় করে, আগে যে সাহস ছিল, এখন আর সেটা নেই। নয়তো মণ্টুর মতো সঙ্গীকে সে গ্রাহ্যও করে না।

দু-জনে অবশেষে বেরিয়ে গেল নদীর ধারে। কাঠ-কাটা নৌকো এসেচে পুব দেশ থেকে, বড় বড় গুঁড়ি পড়ে আছে এদিকে ওদিকে। বর্ষাকালে অনেক গুঁড়ির গায়ে তেলাকুচো লতা উঠেচে, দু-একটা তেলাকুচো ফলও ফলেচে।

কী মায়া যে জায়গাটার!

হারুর বড় ভালো লাগে। খেলা করবার মতো জায়গা।

মণ্টু ও হারু কতক্ষণ সেখানে খেলা করলে, খেলা করবার উৎসাহ কারো কম নয়। তেলাকুচো লতার ফল মণ্টু তুলতে গেলে হারু তুলতে দিলে না। কেন, বেশ তো দুলচে লতার আগায়, একটা আধপাকাও হয়েচে, তুলবার কি দরকার? বেশ দেখাচ্চে গাছে। বেনে-বৌ জোড়ায় জোড়ায় বেড়াচ্চে কালকাসুন্দে গাছের ঝোপে ঝোপে।

কতক্ষণ কেটে গিয়েচে দু-জনের, কারো খেয়াল নেই।

মণ্টু কাছে গিয়ে বললে—অমন করে বসলি কেন রে? জ্বর এল নাকি?

—নাঃ—

—দেখি গা—ওরে বাস্‌রে, গা যে পুড়ে যাচ্চে—বাড়ি যা, বাড়ি যা—

হারু বিমর্ষভাবে বললে—তুই জ্বরের কথা অত করে মনে করিয়ে দিলি কেন? আমি ভুলে ছিলাম বেশ। যেমন তুই মনে করিয়ে দিলি, অমনি আমার জ্বর এল।

মণ্টু বললে—না, না রে, তোর এমনিও জ্বর আসতো, আমি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে কি আর জ্বর এল? ও তোর ভুল কথা। চ, বাড়ি চ—

বাড়িতে আজ চিংড়ি মাছ দিয়ে ডাঁটার চচ্চড়ি হচ্চে সে দেখে এসেচে।

কলাইয়ের ডাল দিয়ে ওই চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেতে যে লাগে?

মাকে না বললেই হল যে জ্বর হয়েচে। মণ্টুকে পথ থেকেই সরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললে—তুই বাড়ি যা—আমি একা যেতে পারবো—

—যেতে পারবি ঠিক?

—খুব। ভারি তো একটুখানি জ্বর। ও এখুনি সেরে যাবে। তুই যা—

হারু বাড়ি ফিরে দেখলে রান্না এখনো হয়নি। কিন্তু দেরি করতে গেলে চলবে না, সে জানে এর পরে এমন ভীষণ কম্প উপস্থিত হবে যে রোদে গিয়ে বসতেই হবে, নয়তো লেপমুড়ি দিয়ে গিয়ে শুতে হবে। গায়ে কাঁটা দেবে, বমি হবে। সুতরাং ভাত যদি খেতে হয় তার আর দেরি করা উচিত হবে না, এখুনি খেতে বসা উচিত।

মা জ্বর এসেচে বুঝতে পারলেই সব মাটি। আর ভাত দেবে না। ও রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে নির্বিকারভাবে বললে—মা, ক্ষিদে পেয়েচে।

—কোথায় গিয়েছিলি রে সকাল বেলা?

—খেলা করছিলাম নদীর ধারে।

ইচ্ছে করেই সে মণ্টুর নাম করলে না। যদি এরা তাকে ডেকে পাঠায় বা এমনি কিছু, তবে সে বলে দেবে জ্বরের কথা। সে বললে—ভাত দাও, ক্ষিদে পেয়েচে—

—আজ এত তাড়া কেন?

—আমার যা ক্ষিদে পেয়েচে।

—এখনো চচ্চড়ি হয়নি। শুধু ডাল আর ভাত নেমেচে—

—তাই দাও, তাই দিয়েই খাবো—

ভাত খেতে বসে হারুর মনে হল, না খেতে বসলেই ভালো হতো। জ্বর চেপে আসচে। শীত এত বেশি করচে যে রোদে না বসলে আর চলে না। উঃ, দাঁতে দাঁত লাগচে এমন শীত! ভাত খেয়েই সে গিয়ে বাড়ির পিছনে নিমগাছটার তলায় রোদে বসলো। একটু পরে ওর ঠক্‌ঠক করে কাঁপুনি ধরলো, এদিকে রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে, কেমন একটা ঘোর-ঘোর ভাব ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে। হারু বুঝলে, ভীষণ জ্বর এসেচে ওর।

ওর মা বললে—বসে আছিস কেন রোদে? শরীর খারাপ হয়নি তো?

—হুঁ।

—হুঁ মানে কি? জ্বর আসচে? সরে আয় ইদিকে দেখি, পোড়ারমুখো ছেলে, তবে ভাত খেলি কি মনে করে? এমন জ্বরে ভুগে মরবি কদ্দিন?

বেশ। যেন তারই দোষ। তার যেন ইচ্চে যে রোজ জ্বর আসে। বাপ-মায়ের অভ্যেস সব দোষ ছেলের ঘাড়ে চাপানো। ....হুঁশ হল যখন ওর আবার, তখন বেলা

গিয়েচে। রাঙা রোদ কাঁঠালগাছটার মাথায়। শালিক পাখির দল ভাঙা পাঁচিলের ওপর কিচ্ কিচ করচে। ওর মুখ তেতো হয়ে গিয়েচে, মাথা ভার, চোখে কেমন ঝাপসা ভাব।

ও বললে—কি খাবো মা?

—কি আবার খাবি? ভাত খেয়ে জ্বর এসেচে, খাবি কি আবার? সাবু করে দেব রাত্তিরে।

হারু নাকী সুরে বললে—না, সাবু আমি খাবো না—হুঁ-উ-উ—

—না, সাবু খাবে না, তোমার জন্যে আমি পিঠে-পুলি করি। চুপ করে শুয়ে থাক।

ভোর রাতে ঘাম দিয়ে হারুর জ্বর ছেড়ে গেল। তারপর ঘুম ভেঙে যায়। শরীর খুব হালকা মনে হয় এবং খুব ক্ষিদে পায়। অত রাতে আর কে কি খেতে দেবে, সে চুপ করে শুয়ে থাকে ভোরের আশায়। ভোরের আলো খড়ের ঘরের দেওয়ালের মাথা দিয়ে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও মাকে ডাক দিতে লাগলো।

ওর ঘুমকাতুরে মা চোখ মেলেই এপাশ ওপাশ ফিরে বলতে লাগলো—বাবাঃ, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরে একটু যে শোবো সে জো নেই। একটু চোখ বুঝিয়েছি অমনি ষাঁড়ের মতো চিৎকার।—হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল!

হারু নাকী সুরে বললে—সঁবে চোঁখ বুঝেচো বুঝি! রোদ উঠে গিয়েচে গাছপালার মাথায়। আমার ক্ষিদে পেয়েচে—উঠে দ্যাখো কত বেলা—

অবশ্য এও অতিশয়োক্তি। রোদ ওঠেনি, সবে ভোরের আলো ফুটেচে মাত্র। ওর মা ওঠবার বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখালে না। ছেলের এ নাকী সুরে চিৎকার সকাল বেলার দিকে—এ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। হারু খানিকটা কান্নার পরে আপনি চুপ করে।

বিছানা ছেড়ে উঠতেই বেশ আনন্দ লাগে। আজ কী সুন্দর দিনটা! কেমন পাখির ডাক বাঁশগাছের মগডালে। কাল মা বলছিল আজ কুমড়োকাটা-সংক্রান্তি। যে যার গাছ থেকে যা পারবে চুরি করবে—শসা, লাউ, কুমড়ো—যার যা ইচ্ছে, কেউ কিছু বলতে পারবে না বা বলবার সাহসও করবে না।

অন্য কিছু নয়, গানি বুড়ীর উঠোনের মাচায় সেই যে শসা গাছ! চমৎকার শসার জালি দুলচে কঞ্চির আড়ালে আড়ালে। কতবার লোভ হয়েচে ওর, কিন্তু বুড়ী বড় সতর্ক। আজ ওবেলা রাতের অন্ধকারে একটা দা হাতে গোটা পাঁচ-ছয় শসার জালি আর গোটাকতক শসাকে যদি সবাড় করা যায়—

উৎসাহে বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়লো।

মণ্টুদের বাড়ি গিয়ে এখুনি পরামর্শ করতে হবে। খাওয়ার কথা সে ভুলেই গেল।

এত কান্না, এত অনুযোগ যে খাওয়ার জন্যে।

এক ছুটে সে পৌঁছুল মণ্টুদের বাড়ি। মণ্টু ওর জ্যাঠামশায়ের পাশে বসে সকালবেলা মুড়ি খেতে খেতে ধারাপাত মুখস্থ করছিল। হারুকে দূর থেকে আসতে দেখে সে বিশেষ কোনো উৎসাহ প্রকাশ করলে না, কারণ এখন জ্যাঠামশায়ের হাত এড়িয়ে খেলতে যাওয়া অসম্ভব।

সৌভাগ্যের কথা, মণ্টুর জ্যাঠামশায় এই সময় তামাক সাজতে গেলেন বাড়ির মধ্যে।

হারু ছুটে এসে বললে—আজ কী দিন মনে আছে?

মণ্টু পেছন দিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করে বললে—কী দিন?

—কুমড়োকাটা অমাবস্যে—

—কে বললে?

—সকলকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ—

—কি করবি?

—তুই আর আমি বেরুবো। গানি বউয়ের বাড়ি শসা গাছ আছে তো? আজ রাত্তিরে সব শসা—কি বলিস?

—তুই এখন যা, জ্যাঠামশায় আসচে, ওবেলা আমি তোদের বাড়ি যাবো।

হারু সতৃষ্ণ নয়নে ওর মুড়ির দিকে চেয়ে বললে—কি খাচ্ছিস?

—মুড়ি।

—দে না একগাল।

এবার হারুর কানেও জ্যাঠামশায়ের খড়মের শব্দ পৌঁছেচে। সে তাড়াতাড়ি কাপড়ে অকারণ ডান হাতখানা মুছে মণ্টুর সামনে পেতে বললে—শীগ্‌গির দে, তোর জ্যাঠামশায় আসচে। পরক্ষণে একমুঠো মুড়ি মুখে পুরে দিয়েই সে ছুটে পালালো। মনে ভাবলো—বুড়ো এসে পড়লেই বকতো, আমায় দেখতে পারে না মোটে। কী কেপ্পন মণ্টুটা! একগাল মুড়ি কত ক'টা দিলে দ্যাখো—দিব্যি মচমচে মুড়ি—

তারপর সে বাড়ি পৌঁছে দেখলে তার মা সামনের উঠোন ঝাঁট দিচ্চে। খাবার দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ও উদ্যোগ কিছুই নেই এ বাড়িতে।

মা ওই এক রকমের লোক, হারু জানে। অন্য লোকের মায়ের মতো নয়। কাল রাতে যে খাইনি, জানে সবই, দাও না বাপু খেতে সকাল-সকাল। কাণ্ডখানা বেশ। একটু বেলা হলে মা যদিও খেতে দিলে, সে মাত্র একবাটি সাবু। সে প্রতিবাদ করতে গেলে ওর মা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—হ্যাঁ, তোমাকে নুচি ভেজে দিই, পিঠেপুলি

গড়ে দিই কাল সারারাত জ্বরে শুষেছো কিনা!

যেন জ্বর না হলেই মা তাকে লুচি ভেজে আর পিঠেপুলি করে খাওয়ায় আর কি! সে এ বাড়িতে নয়। এ বড়িতে বাঁধা আছে চালভাজা, তিনশোত্রিশ দিন। লুচি!

কিন্তু ভাত? মা কি আজ ভাতও খেতে দেবে না নাকি? কথাটা সে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

—ভাত খাওয়ার সময় আমায় সেই গাওয়া ঘি একটু দিতে হবে কিন্তু—

—ভাত খাবে কে?

—কেন, আমি।

—ইস্! বলে, কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় ঘুণ্টি দিতে—সারারাত জ্বরে কোঁ-কোঁ করে, ওনার ভাত না খেলে চলবে কেন!

—কি খাবো তবে?

—শিউলিপাতার রস তো খেলিনে সকালবেলা। একটু বেলা হলে দেবো অখন পাতা বেটে—আর সাবু।

হারু মিনতির সুরে বললে—না, সাবু নয়, দু-খানা রুটি, মাছের ঝোল দিয়ে। তোমার পায়ে পড়ি মা—পুরনো জ্বর তো, ওতে কিছু হবে না।

—আচ্ছা যাক, দেখবো অখন।

সুতরাং মনে আর একবার খুশির ঢেউ উঠলো হারুর। শরীর তার খুব হালকা হয়ে গিয়েচে, জ্বর না এলেও পারে। সকলে বলে শরীর হালকা হয়ে গেলে জ্বর আর নাকি হয় না। সে একা মাঠের ধারে বোষ্টম বাগানের পথে বেড়াতে গেল। ও বাগানের খুব নিবিড় একটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে আছে সেই বুড়ো মাদারগাছটা। একবার রজুন কাকার দলে মিশে সে গিয়েছিল সেখানে। রজুন কাকা অদ্ভুত লোক, বড় বয়সের ছেলে, ওর গোঁপ-দাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল, তবু ও তাদের সঙ্গে খেলতো। কত নতুন নতুন খেলা শিখিয়েছিল। তার দলে খেলতে বেরুলে শুধুই মজা, কত রকমের মজা। কিন্তু রজুন কাকা চলে গেল কোথায়, একদিন হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল এ গাঁ থেকে, দু-বার পুজো এসেছে গিয়েচে তারপর—আর আসেনি।

মাদারগাছটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ভিজে ঝোপ-ঝাপ—কত পটপটি ফল দুলচে গাছে গাছে। বড় বড় পটপটি ফল। আজকাল সব ছেলেই বর্ষাদিনে পটপটি ফল ছোঁড়ে, তাদের শিখিয়েছিল সেই রজুন কাকা। একটা বাঁশের চোঙের মধ্যে পটপটি ফল পুরে একটা কাঠি দিয়ে ঠেলে দিলেই ফট-ফটাস! যেন বন্দুকের শব্দ। তাই ওর নাম পটপটি ফল।

আজকাল সবার হাতে দেখো একটা বাঁশের চোঙ আর কাঠি আর পটপটি ফলের গোছা। রজুন কাকা না থাকলে আজ আর কাউকে পটপটি ছুঁড়তে হ'তো না।

দুটো বড় বড় তিৎপল্লার ফুল ফুটেছিল উঁচুতে। লতার-আগে দুলচে। হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না। এক থোলো পটপটি ফলই নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু চেষ্টা করেও সে কোনোটাই সংগ্রহ করতে পারলে না। বেলা হয়েচে অনেক, ক্ষিদেও বেশ পেয়েচে।

বাড়ি গিয়ে রুটি আর মাছের ঝোল খাবে—কী মজা! এতক্ষণ রুটি হয়েও গিয়েচে। সে রোগা মানুষ, মা নিশ্চয়ই তার জন্যে আগে করে রাখবে। আজ সে বেশ ভালো আছে, আজ আর জ্বর আসবে না। জ্বর বোধহয় সেরে গেল। একটু একটু খুব সামান্য শীত বোধ হচ্চে, কিন্তু সেটা জ্বরের দরুন নয়। বর্ষাকাল, আর এই বনঝোপে তো রোদ পড়ে না তাই, মণ্টুরও শীত করতো, যদি সে আজ এই বনে ঢুকতো।

হারু ঝোপের বার হয়ে ছায়াবহুল সরু বনপথ ছেড়ে চওড়া রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। এই চওড়া রাস্তা ওদিকে নাকি কেষ্টনগর পর্যন্ত চলে গিয়েচে, বাবার মুখে সে শুনেচে। একসারি ধান বোঝাই গরুরগাড়ি মন্থর গতিতে আসচে ওদিক থেকে। হারু একটা পিটুলিগাছের তলায় আধ-রোদ আধ-ছায়ায় বসে বসে গরুরগাড়ি দেখতে লাগলো।

বোধহয় একটু বেশীক্ষণ বসা হয়ে গেল। যে সময় উঠবে ভেবেছিল, সে সময় ওঠা হল না। রোদটা বেশ মিষ্টি লাগচে। না, জ্বর হয়নি তার। বর্ষাকালে রোদ সকলেরই ভালো লাগে।

বাড়িতে যখন সে পৌঁছলো, তখন বেলা বারোটা। হাতে তার গোটা কতক পিটুলিফল। ওর মা বললে—ওমা, ই কি কাণ্ড! এই বলে গেলি ক্ষিদে পেয়েচে, আমি কখন রুটি করে বসে আছি। কোথায় ছিলি? ভালো আছিস তো?

—হুঁ—

—কোথায় ছিলি?

—মাদার পাড়তে গিয়েছিলাম বোষ্টমদের বাগানে।

—জ্বর হয়নি তো?

—না—

কিন্তু ওর কথার ধরন আর চোখ-মুখের ভাব ওর মায়ের কাছে ভালো বলে মনে হল না। কাছে ডেকে বললে—তোর চোখ-মুখ রাঙা দেখাচ্চে কেন রে? ইদিকে

সরে আয়, গা দেখি—বাপ্‌রে, গা পুড়ে যাচ্চে! যা শুয়ে পড় গিয়ে, আর খেতে হবে না।

যখন ওর জ্বরের ঘোর কাটলো, তখন রাত হয়েচে। হারু চোখ মেলে চেয়ে দেখলে তক্তপোশের কোণে দেওয়ালের গা ঘেঁষে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলচে, ঘরে কেউ নেই। জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। তখনকার ক্ষিদে এখনও রয়েচে। সে কিছু খায়নি দুপুর থেকে। মা কোথায় গেল? সে ক্ষীণ স্বরে ডাকলে—ও—মা—আ—আ—

কেউ উত্তর দিলে না। মা রান্নাঘরে কাজ করচে বোধহয়, কিংবা হয়তো পাশের নিতাই কাকার বাড়ি গিয়েচে।

একটু পরে ওর মাকে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে ও একটু অবাক হয়ে গেল। মা অমন করে হাঁটচে কেন? আমসত্ত্ব চুরি করবে নাকি? সে তো আমসত্ত্ব চুরি করবার সময় অমনি...মা এসে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে দেখতে গেল। চোখ তাকিয়ে থাকতে দেখে যেন একটু অবাক হয়ে গিয়ে নরম মোলায়েম সুরে বললে—বাবা হারু! কেমন আছ বাবা?

—ভালো।

—দেখি—

ওর গায়ে হাত দিয়ে ওর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—ওঃ, কী ঘাম ঘেমেছিস! এঃ, সব ভিজে গিয়েচে! হারুও তা লক্ষ্য করলে বটে। কাঁথা ভিজে সপ সপ করচে। ও বললে—মা, আমার ক্ষিদে পেয়েচে।

—ক্ষিদে পেয়েচে বাবা? আচ্ছা দেবো এখন। আহা, বাবা আমার, সোনা, আমার, শোও। আসচি আমি।

মা ঘর থেকে চলে গেলে ও ভাবলে মা এমন নরম হয়ে গেল কেন? অন্য সময় মা তো খেতে চাইলে বলে ওঠে—জ্বর ছাড়তে-না-ছাড়তে ক্ষিদে! ছেলের কেবল ক্ষিদে আর খাই-খাই, জ্বর হয়েচে, চুপ করে শুয়ে থাক।

কিন্তু মা আজ অমন মিষ্টি, অমন মোলায়েম সুরে কথা বলচে কেন? পা টিপে টিপে হাঁটা—হঠাৎ হারুর মনে পড়ে যায় আজ না সেই কুমড়োকাটা অমাবস্যে! ওঃ, ভালো কথা মনে পড়েচে। এখন সবে সন্ধে, তার তো জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। এইবার মণ্টুকে ডেকে নিয়ে গানি বুড়ীর বাড়ি শসা চুরি করতে যেতে হবে। আরও একটু রাত হোক। ততক্ষণ সে খেয়ে নিক।

ওর মা একটু বার্লি নিয়ে ঘরে ঢুকে বললে—এটুকু খেয়ে নাও তো বাবা। উঠো না, শুয়ে থাকো লক্ষ্মী ছেলে—ও লক্ষ্মী ছেলে আমার—

ও বিস্মিত সুরে বললে—কেন. আমার সে ওবেলাকার রুটি? আমি খেয়ে শসা৷ কাটতে যাবো এক জায়গায়। আজ কুমড়োকাটা অমাবস্যে যে! জানো না?

ওর মা বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—খুব জানি বাবা, তুমি শোও। কুমড়োকাটা অমাবস্যে গিয়েচে কাল—তুমি এই দু-দিন ধরে বেহুঁশ। মা মঙ্গলচণ্ডি! সারিয়ে দাও মা, সেরে গেলে পুজো পাঠিয়ে দেবো বটতলায়।

জোড়হাতে বটতলার উদ্দেশে ওর মা প্রণাম করে।